1

আনন্দ বচনামৃতম্

(প্রথম—তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আনন্দ বচনামৃতম্

(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)

কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর, পোঃ–
বাগলতা, জেলা–পুরুলিয়া, পঃ বঃ
যোগাযোগ অফিস: ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর, কোলকাতা–৭০০
১০০
প্রথম প্রকাশ: ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭
দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন: ১লা জানুয়ারী, ২০০৭
ISBN. 81-7252-241-X
প্রকাশক: আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত (প্রকাশন সচিব)
আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭, ভি. আই. পি.
নগর, কোলকাতা–৭০০ ১০০
অক্ষর বিন্যাস: আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত আনন্দ প্রিন্টার্স
৩/১সি, মোহনবাগান লেন কোলকাতা–৭০০ ০০৪
মুদ্রাকর: শ্রীকালী আর্ট প্রেস ২০৯ সি, বিধান সরণী
কোলকাতা–৭০০ ০০৬
পরিবেশক: প্রভাত লাইব্রেরী ৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কোলকাতা–৭০০০০৯

মূল্য: আশি টাকা মাত্র

চরম নির্দেশ

“ যে দু’ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে, মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’ৰেলা সাধনা করতেই হবে – ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম–নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম–নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয়, সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ব ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n
ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ত্	অঁ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	an̂

প্রকাশকের কথা

"আনন্দ–বচনামৃতম্", ইংরেজী ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের একত্র বাংলা অনুবাদ- সঙ্কলন–দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন–আনন্দমার্গ সাহিত্যের সুধী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুশী। এতদিন প্রবচনগুলি শুধু ইংরেজীতেই প্রকাশিত ছিল, ভারতীয় ভাষাগুলিতে অনূদিত হয়নি। তবে এর বাংলা প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

মার্গ–সাহিত্যের পাঠকেরা ইতোপূর্বেই অবগত আছেন যে মার্গগুরু শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজীর আধ্যাত্মিক প্রবচনসমূহ এযাবৎ "সুভাষিত সংগ্রহ" (মোট ২৪ খণ্ড) ও "আনন্দ–বচনামৃতম্" (মোট ৩০ খণ্ড) সিরিজের পুস্তকগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মমহাচক্রের ব্যাসাসনে বসে হাজার হাজার ভক্তের সামনে মার্গগুরু যে সকল জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক প্রবচন দিয়েছিলেন সেগুলি স্থান পেয়েছে "সুভাষিত-সংগ্রহ" সিরিজে।

আর প্রতিদিন সমবেত সাধকবৃন্দের সামনে তিনি যে সব সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক প্রবচন দিতেন সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে "আনন্দ-বচনামৃতম্" সিরিজে।

পটনায় থাকাকালে ১৯৭৮ সালের ৬ই অগাষ্ট থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত মার্গগুরু পটনার জাগৃতি ভবনে সমবেত সাধকবৃন্দের সামনে যে প্রবচনগুলি দিয়েছিলেন, বর্তমান সংকলন-গ্রন্থে সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। বহু ভাষাভাষী ভক্তবৃন্দের সামনে তিনি প্রায় ইংরেজীতেই আলোচনা করতেন, তবে কখনও কখনও হিন্দীতেও প্রবচন দিতেন। বর্তমান সংকলন-গ্রন্থখানি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

বলাই বাহুল্য, এই গ্রন্থের প্রবচনগুলিতে শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাসম্পন্ন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু সাধকের পক্ষে বহু মূল্যবান ও উপযোগী বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন জীবাত্মা ও প্রত্যগাত্মা, প্রত্যাহার যোগ ও পরমাগতি, মানুষের পরম বন্ধু

কে, গুরুবন্দনা, গুরুপ্রণাম, গুরুপূজা, সাধকের নিম্নতম যোগ্যতা, হর–পার্বতী সংবাদ, সবিতৃ ঋক, প্রণবতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, মৃত্যু সম্পর্কে কুসংস্কার, ভুত–প্রেততত্ত্ব, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশনের কাজে অনেকেই নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে বলি, যদি এই আধ্যাত্মিক প্রবচনমালা তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের উপকারে আসে তাহলেই আমরা শ্রম সার্থক মনে করব। অলমতি বিস্তারেণ–

ইতি––প্রকাশক

আনন্দমার্গ আশ্রম
ভি. আই. পি. নগর, কলিকাতা–১০০
১লা জানুয়ারী, ২০০৭

সূচীপত্র

(প্রথম খণ্ড)

প্রবচন বিষয়

১) বর্ণমাহাত্ম্য ২) "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত”

৩) উত্তম শ্রেণীর মানুষ হও ৪) পরম সূর্য...

৫) পরমপুরুষ সর্বাশ্রয় ৬) আধ্যাত্মিক প্রগতির তিনটি সোপান

৭) ভক্তির সর্বোচ্চ ধাপ ৮) “মায়ামেতাং তরন্তি তে".

৯) পরমপুরুষের আরেক নাম হরি।

১০) "ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ”–১

১১) সব কিছুই তিনি. ১২) মন ও ইচ্ছাশক্তি

১৩) ৰন্ধনমুক্ত হও ১৪) কৃষ্ণ ও রাম

১৫) মানুষ নিমিত্তমাত্র ১৬) গোপী কে

১৭) "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি...". ১৮) পরম সত্যকে খোঁজ.

১৯) তুমি কী চাও ২০) স্বধর্ম ও পরধর্ম,

২১) উত্তম, মধ্যম ও অধম ২২) "শুভয়া সংযুনস্ব"..

২৩) পরমপুরুষের আবির্ভাব ২৪) আবির্ভাবের তাৎপর্য,

২৫) মানসিক ভারসাম্য. ২৬) অন্যায়ের পথে ঝকমারি

২৭) সম্যক্ সঙ্কল্প ২৮) 'মাং পাহি নিত্যম্'

২৯) গোপ কে? ৩০) ভক্তি ৩১) সবিতৃ ঋক্.

৩২) চরম লক্ষ্য। ৩৩) “একো হি রুদ্রঃ"

৩৪) দেবাদিদেব মহাদেব ৩৫) প্রণব–মাহাত্ম্য

৩৬)সাধনায় ক্রমোন্নতি ৩৭)পরম তত্ত্ব প্রতীকীকরণের বাইরে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

৩৮) 'গুরুকৃপা হি কেবলম্'.   ৩৯) ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব

৪০) ভূমামানসের সর্বজ্ঞত্ব   ৪১) পরমপুরুষের স্বগতোক্তি

৪২) ঈশ্বরপ্রেম–সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত.

৪৩) ঈশ্বরের মুখ্য গুণরাজি.   ৪৪) মানুষ ও তার মুক্তি

৪৫) পরম জাদুগর   ৪৬) বিশ্বমায়া থেকে মুক্তি

৪৭) চিতিশক্তিই পরম উপাদান   ৪৮) জীব শিব হয়...

৪৯) সত্যের পরম নিধান

৫০) "ভবাম্বোধিপোতংশরণং ব্রজামঃ"–২.

৫১) ক্রিয়াশক্তি ও চিতিশক্তি   ৫২) মন ও চিতিশক্তি

৫৩) প্রত্যাহার যোগ ও পরমাগতি   ৫৪) রাম ও নারায়ণ

৫৫) কৃষ্ণ ও বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র,   ৫৬) সৎসঙ্গে দিন কাটাবে

৫৭) অণু ও ভূমা....   ৫৮) চিতিশক্তির ভূমিকা

৫৯) আগম ও নিগম

৬০) নারী কি মুক্তি-মোক্ষ পেতে পারে?.

(তৃতীয় খণ্ড)

৬১) যোগের তান্ত্রিক সংজ্ঞা, ৬২) সাফল্যের গুপ্ত রহস্য...

৬৩) গুরুপূজা ৬৪) প্রণাম মন্ত্র.

৬৫) অণুজীবের জন্মসিদ্ধ অধিকার. ৬৬) পরমপুরুষের ভয়ে

৬৭) মানসিক উন্নতি ও কর্ম ৬৮) গুরুপ্রণাম

৬৯) "সদ্‌গুরুং তং নমামি" ৭০) 'সংগচ্ছধ্বম্'

৭১) সাধকের ন্যূনতম যোগ্যতা. ৭২) "নিত্যং শুদ্ধং"

৭৩) সবাই তাঁকে মানে ৭৪) মৃত্যু সম্বন্ধে কুসংস্কার

৭৫) শ্রাদ্ধ ৭৬) ভুত-প্রেত ৭৭) জীবাত্মা ও প্রত্যগাত্মা

৭৮) "সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা" ৭৯) সর্বত্রই তাঁর প্রতিচ্ছায়া

প্রবচন-১

বর্ণমাহাত্ম্য

এই মহাবিশ্ব অজস্র স্পন্দনের সমাহার। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ যাকে সাধারণ ভাবে 'প্রপঞ্চ' আখ্যায় অভিহিত করে থাকি তা মূলতঃ মানস জগৎ ও অতিমানস জগতের অধিক্ষেত্রভুক্ত। এই স্পন্দনরাজি সংখ্যায় অসংখ্য.... অগুন্তি কিন্তু অনন্ত নয়। যদি তারা অনন্ত হত তাহলে সৃষ্টিটাও অনন্ত হত। তবে হ্যাঁ, তরঙ্গ-রাজির সংখ্যা অজস্র.... অগণিত। কিন্তু তা কোন মতেই অনন্ত নয়।

মূলতঃ তিনটি রঙ বা বর্ণই প্রধান-শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেত হ'ল সত্ত্বগুণের দ্যোতক, রক্তবর্ণ রজোগুণের দ্যোতক ও কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণের দ্যোতক। এক ও অদ্বিতীয়

পরমপুরুষই এই রকম অসংখ্য বর্ণ সর্জন করে চলেছেন। আর এই রঙ বা বর্ণের সাহায্যেই তিনি সব কিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে চলেছেন। যদি আকর্ষণ না থাকত তাহলে এই সৃষ্ট জীবজগৎ তার আস্তিত্বিক মাধুর্য উপভোগ করতে পারত না।

"য একো হবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ বর্ণাননেকান্
নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো
বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনকু।।"

যে 'এক' সত্তা থেকে অনেকের উদ্ভূতি, সেই এককে বলব আদি কারণ বা মূল কারণ (noumenal cause) আর এই ব্যক্ত জগৎ হ'ল প্রাপঞ্চিক (phenomenal)।

এখন প্রশ্ন হ'ল, এই বর্ণময় বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে কারণটা কী? উত্তরে বলব, এই বর্ণময় বিসৃষ্টি না থাকলে পার্থিব মানুষ কোন কিছুই উপভোগ করতে পাবত না আর তা হলে এই সৃষ্টির বুকে সে বাঁচতেও চাইত না। যেমন ধর, একটা ছোট্ট শিশু কাঁদছে। মা শিশুকে খেলনা দিচ্ছেন যাতে শিশুটি সেই খেলনা নিয়ে মেতে থাকে। এই খেলনা তৈরীর জন্যেই যাবতীয় বর্ণ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী? এই বর্ণ সৃষ্টির

পেছনে আসল মতলবটা কী? এখন এর পেছনে যে উদ্দেশ্য, যে কারণ তা একমাত্র পরমপুরুষই জানেন। যদি সেই উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করে দেওয়া হয়, তাহলে তো ভেতরকার গুপ্ত রহস্যই ফাঁস হয়ে যায়। তবে এর পেছনে অন্তর্নিহিত ভাবটা কী? এখন আসল মতলবটা যদি একবার জানাজানি হয়ে যায় তাহলে জীব তো বর্ণের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবে, তখন সৃষ্টির পেছনের বর্ণরাজি নিয়ে সে অযথা মেতে থাকার চেষ্টা করবে না।

এই যে অজস্র স্পান্দনিক অভিব্যক্তির কথা বলছিলুম তারা সবাই সেই পরমপুরুষেই সমাহিত হয়ে থাকে। সেই এক পরমপুরুষ থেকে উৎসারিত হয়ে আবার তাঁতেই সমাহিত হচ্ছে। আমরা যদি এই তরঙ্গসমুদ্রের আদি ও অন্ত খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে সেই এক পরমপুরুষকেই পাব অর্থাৎ সেই এক পরমপুরুষই সৃষ্টির আদিতে রয়েছেন, আবার অন্তেও রয়েছেন।

তাই আমাদের সবাইকার একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত, ‘স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত্ব”–তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখুন।

(পটনা, ৫ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

প্রবচন–২

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত..."

**"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিৰোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।"**

বলা হয়ে থাকে, পরমা সম্প্রাপ্তির পথ হ'ল ক্ষুরধারবৎ। ধর্মের পথে চলা মানেই হ'ল শাণিত ক্ষুরের ওপর দিয়ে চলা। প্রাকৃত জনগণ বলতে পারে– যেহেতু তারা অতি সাধারণ অজ্ঞ মানুষ.... বুদ্ধি–শুদ্ধি নেই, তাই তারা এই শাণিত ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে চলবে কী করে? কিন্তু তাদেরও তো জানতে ইচ্ছে যাবে–সেই পরমা সম্প্রাপ্তির উপায় কী? উত্তরে বলব– উপায়টা হ'ল ভক্তি।

তাই বলি ভক্তির সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাও.... ভক্তির পথেই এগিয়ে চলো। মনে রেখো, যেখানে ভক্তি সেখানেই পরমাত্মা। যারা জ্ঞানী, যারা তার্কিক, তাদের পক্ষে ধর্মের পথ হ'ল ক্ষুরধার তুল্য কিন্তু যারা সাধক, যারা ভক্ত তাদের পক্ষে সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ। তাই ভক্তির দ্বারাই যখন পরমপুরুষ লভ্য

তখন ভক্তিমান সাধক পরমপুরুষকে পাবেই। তোমরা সাধক, তোমরা ভক্তির পথে চলছ, জয় তোমাদের হবেই।

(পটনা, ৬ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

প্রবচন–৩

উত্তম শ্রেণীর মানুষ হও

এই জগতে তোমরা মুখ্যতঃ তিন ধরনের মানুষ দেখতে পাবে: উত্তম, মধ্যম ও অধম। প্রথম শ্রেণীর মানুষ বলব তাদের যাদের চিন্তায়, বাচনিকতায় ও কর্মে মিল আছে অর্থাৎ তারা যেমনটি ভাবে তেমনটিই বলে। আবার যেমনটি বলে তেমনটি কাজেও করে। এরা হ'ল উত্তম শ্রেণীর মানুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হ'ল তারা যাদের চিন্তায় ও বাক্যে মিল নেই। কিন্তু তারা মুখে যা বলে কাজে তা–ই করে, অর্থাৎ তারা মনে মনে ভাবে এক রকম কিন্তু মুখে বলে আর এক রকম। তবে তারা মুখে যা বলে কাজেও তা–ই করে। এরা হ'ল মধ্যম শ্রেণীর মানুষ।

আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ বলব তাদের যাদের চিন্তায়, বাচনিকতায় ও কর্মে কোন মিলই নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই। এই ধরনের লোকেরা মনে মনে এক ধরনের ভাবে, মুখে আর এক ধরনের কথা বলে, আবার কাজের বেলায় ঠিক উল্টোটা করে। এরা হ'ল অধম শ্রেণীর মানুষ।

আজকের পৃথিবীতে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় মানুষ এই অধম শ্রেণীভুক্ত। তোমরা কিন্তু উত্তম শ্রেণীর মানুষ হতে চেষ্টা করো। অর্থাৎ তোমরা যেমনটি ভাববে তেমনটিই বলবে, আর যেমনটি মুখে বলবে তেমনটি কাজেও করবে।

(পটনা, ৭ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪

পরম সূর্য

মানুষ মাত্রেই সূর্যালোকের সাহায্যে দেখে থাকে। বলতে পারি, সূর্য হ'ল মানুষের চক্ষুস্বরূপ। কিন্তু চোখের কোন ত্রুটি

থাকলে মানুষ দেখতে পায় না। তার জন্যে সূর্যকে তো আর দায়ী করা যায় না।

পরামাত্মা হলেন বিশ্বের সকল আত্মার আত্মা। পরমাত্মা থেকেই মানুষ তার শক্তি পেয়ে থাকে। এই বিশ্বের কোন কিছুরই মালিক মানুষ নয়, মালিক হলেন পরমাত্মা কারণ সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁতেই মিশে যায়। তুমি চেষ্টা করেও মৌলিক কোন কিছু সৃষ্টি করতে পার না, কারণ সব কিছু তাঁর থেকেই উদ্ভূত। যদি তুমি কোন বস্তুর অপব্যবহার করো তার জন্যে পরমাত্মাকে দায়ী করা যায় না। এর জন্যে দায়ী তুমি, এর জন্যে তোমারই শাস্তি প্রাপ্য। এর জন্যে তোমাকেই ফলভোগ করতে হবে।

সেই পরমপুরুষ তোমার পরম মিত্র। কোন অবস্থাতেই তুমি একাকী নও। তোমার দুর্ভোগ দেখে তিনি কখনও নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকতে পারেন না। কাজেই তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী এগিয়ে চলো, তাতেই তোমার সমস্ত দুঃখ–কষ্টের অবসান হবে।

(পটনা, ৮ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫

পরমপুরুষ সর্বাশ্রয়

**"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোহপি পাপবিনির্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।।"**

'দুরাচারী' তাকেই বলে যার কাজে সমাজ প্রভাবিত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার আচরণ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। আর যে দুরাচারীকে অন্য দুরাচারীরা তাদের সমাজে 'দুরাচারী' বলে থাকে সে হ'ল সুদুরাচারী। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তর্কশাস্ত্রেও বলা হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি প্রতিকর্ম। তবে স্থান–কাল–পাত্রের পরিবর্তন ঘটলে প্রতিকর্মেরও কম–বেশী তারতম্য ঘটে থাকে।

তাহলে কি কোন সুদুরাচারীর ভবিষ্যৎ নেই? না, তেমনটা হতে পারে না। অতি বড় পাপীরও একটা ভবিষ্যৎ আছে বৈ কি। এখন মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সেই ভুলটা বড় রকমেরও হতে পারে, আবার ছোট রকমেরও হতে পারে। যারা ভুল করে তারাও তো আমাদের সমাজভুক্ত মানুষ, তারা যাবে কোথায়! তাই কৃষ্ণ বলেছেন–সব ছেড়ে–ছুড়ে কোন সুদুরাচারী যদি আমার আশ্রয় নেয় ও অনন্যভাক্ হয়ে আমার ভজনা করে

সেক্ষেত্রে তার যাবতীয় সংস্কার-ৰন্ধন একদিন শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত কর্ম-ৰন্ধন থেকে সে মুক্তি পাবে। যে অনন্যমনসা হয়ে আমার ভজনা করে, আমার আশ্রয় নেয়, মুক্তি সে পাবেই পাবে।

মানুষ, মনে রেখো পরমপুরুষ তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কোন অবস্থাতেই তুমি একলা নও। পরমপুরুষ কখনও তোমার দুঃখ-বিপদে উদাসীন থাকতে পারেন না, তিনি সব সময় তোমার ব্যথা-বেদনা অনুভব করেন। তাঁর নির্দেশমত কাজ করে যাও, আর তাতেই তুমি যাবতীয় কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবে।

(পটনা, ৯ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন-৬

আধ্যাত্মিক প্রগতির তিনটি সোপান

"প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" আধ্যাত্মিক প্রগতি তিনটি তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল-প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা। 'প্রণিপাত' মানে এক অদ্বিতীয় শাশ্বত সত্তা পরমপুরুষের প্রতি পূর্ণ

আত্মসমর্পণ। এক্ষেত্রে সাধকের মনোভাব হচ্ছে এই যে বিশ্বের যা কিছু সবই পরমপুরুষের, আমার বলতে কিছু নেই। এটা হ'ল প্রণিপাত। আর যার অহংবোধ রয়েছে, যে ভাবছে তার বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি বা অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তার বৈয়ষ্টিক সম্পত্তি, সে সবচেয়ে বড় মূর্খ।

কোন কোন মানুষ তার শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধি-বৃত্তি, সৌভাগ্য নিয়ে খুব বড়াই করে কিন্তু এই পৃথিবীর কোন কিছুই তো চিরন্তন নয়। কাজেই যে মানুষ কোন পার্থিব জিনিস নিয়ে বড়াই করে সে তো মূর্খ। সব চেয়ে খারাপ মানসিক বন্ধন হচ্ছে মিথ্যা অহংকার, কারণ এই বিশ্বের সব কিছুই পরমপুরুষের, আমার বলতে কিছুই নেই। তাই পরমপুরুষের কাছে মানুষের ষোল আনা আত্মসমর্পণ করা উচিত। মানসিক অগ্রগতির জন্যে এটা হ'ল এক অপরিহার্য সর্ত্ত।

যদি সত্যি সত্যি জগতের সেবা করতে চাও তবে পরমপুরুষের পাদমূলে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। অর্থাৎ সেই শাশ্বত সত্তা পরমপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হ'ল প্রণিপাত। এই সৃষ্ট জগতের সত্যিকারের মালিক হলেন পরমপুরুষ। এখানে যা কিছু কর্মধারা সবই তাঁর। আমরা সেই পরমপুরুষের মাধ্যম মাত্র। আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যদি সেই কাজটা আমি না করি তিনি অন্যকে দিয়ে তা

করিয়ে নেবেন। তাই কোন কাজ করার আগে আমাকে অতি অবশ্যই এই ভাবনা নিতে হবে যে, পরমপুরুষ কৃপা করে আমার মাধ্যমে তা করিয়ে নিচ্ছেন।

জীবিতকালে ষাঁড়কে সচরাচর দেখে থাকবে মাঝে মাঝে সে গর্জন করে বলছে, 'হম্ম' অর্থাৎ আমি.... আমি.... আমি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারই চামড়ার সূক্ষ্ম তন্ত্ব দিয়ে তৈরী ধুনুরী থেকে ধ্বনি বেরিয়ে আসছে কেবল তু..........তু (তুমি....তুমি....তুমি)। তাই সর্বদাই মনে রাখতে হবে, আমি কোন কিছুই করছি না....স্বয়ং পরমপুরুষই সব কিছু করে চলেছেন। আর এসব করার সময় ব্যষ্টি সত্তা হিসেবে মানুষের মায়াজালে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কারো পক্ষে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা, সৌন্দর্য, সম্মান, বিত্ত, অর্জিত জ্ঞান কোন কিছুর জন্যেই অহংকার করা চলবে না। সর্বদাই মনে রাখতে হবে–এই সব কিছুর মালিক হলেন পরমপুরুষ, আমার বলতে কিছুই নেই।

'পরিপ্রশ্ন' বলতে সেই সমস্ত প্রশ্নকে বোঝায় যার উত্তর জেনে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। পাণ্ডিত্য জাহির করলে বা এই ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রশ্ন করলে মানুষের সময় ও শক্তির অযথা অপচয় ঘটে থাকে। ওগুলো একেবারে বাজে জিনিস। পরিপ্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। পরিপ্রশ্ন

ব্যতিরেকে অন্য কিছু প্রশ্ন করলে তাতে মানুষের শুধু সময় ও শক্তির অপচয় হয়।

'সেবা' মানে নিঃস্বার্থ সেবা। যথার্থ সেবা তখনই সম্ভব যেখানে প্রতিদানে কোন কিছু পাওয়ার অভিলাষ থাকে না। যেখানে কোন কিছু দিতে গিয়ে কোন কিছু পাবার বাসনা থাকে তাকে সেবা বলব না–বলব ব্যবসায়। যেখানে দেওয়া–নেওয়ার প্রশ্ন সেটাকে ব্যবসায় বলে। অনেক সময় অনেক সংবাদপত্রের স্তম্ভে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে–“অমুক সাল থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।" না, এটা সেবা নয়, এটা ব্যবসা কারণ এক্ষেত্রে বিক্রেতা কিছু না নিয়ে কিছু দিচ্ছে না। সেবার ক্ষেত্রে দেওয়াটাই বড় কথা, নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যদি কেউ কিছু দান করে আর মনের মধ্যে ভাবনা থাকে যে প্রতিদানে কিছু দিলেও নোব না। সেটাই হ'ল সেবার সার কথা।

একটা শব্দ আছে যা প্রায়শই ভক্তরা বলে থাকেন তা হ'ল প্রপত্তি। 'প্রপত্তি' মানে 'পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ ভাবটা এই যে সেই চরম দৈবী সত্তা পরমাত্মাই সব কিছু করছেন, মানুষ কিছু করছে না। পরমপুরুষের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। পক্ষান্তরে 'অপ্রপত্তি' মানে সেই ধরনের মানসিকতা যেখানে মানুষ

ভাবছে যে ব্যষ্টি মানুষই সব কিছু করছে, পরমপুরুষ করছেন না।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা–এই তিনটি তত্ত্বকে মেনে চললে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতি হবেই। এছাড়া অন্য কোন কিছু তোমার উপকারে আসবে না। মনে রেখো, অতি স্বল্পকালের জন্যেই তুমি এই পৃথিবীতে এসেছ। তাই তোমার সময় ও সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করো, মনের মধ্যে যথার্থ সেবার মনোভাব পোষণ করে জগতের সেবা করে যাও; জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল স্তরে সর্বাত্মক সেবার কাজ চালিয়ে যাও।

(পটনা, ১০ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭

ভক্তির সর্বোচ্চ ধাপ

"আমি পরমপুরুষের দাসানুদাস, তাঁর কাজ তিনিই করছেন, আমি তাঁর যন্ত্রমাত্র"–এই যে মানসিকতা একেই বলে 'প্রপত্তি'।

'প্রপত্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হ'ল: প্র–পত্ + ক্তিন্ = প্রপত্তি। প্রপত্তিভাবের সাধক দুঃখকে দুঃখ, সুখকে সুখ বলে আদৌ মনে করেন না; বস্তুতঃ সুখ–দুঃখকে তিনি সমভাবে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন।

এই প্রপত্তি–মানসিকতার বিপরীত মেরুতে রয়েছে 'বিপ্রপত্তি'। বিপ্রপত্তিতে মানুষ ভুল করে ভাবে যে সে–ই সব কিছু করছে– অন্যে নয়, সে–ই সব কিছু করছে। এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতার দরুণ ক্রমশঃ সে স্থূল ভাবাপন্ন হয়। প্রপত্তির বেলায় মনের ভাবটা হ'ল এই যে পরমপুরুষের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে চলেছে। তিনি অনুকম্পা করে আমাকে তাঁর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। চাইলে তিনি আমাকে তাঁর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার নাও করতে পারেন। তিনি আমাকে দিয়ে কাজ করান বা না করান, তিনি যেমনটি চাইবেন তেমনটিই হবে– প্রপত্তি ভাবের সাধকের মনে মুখ্যতঃ এই ধরনের ভাবনাই থাকে। প্রপত্তির পুরো আনন্দ পেতে গেলে মানুষকে পরমপুরুষের চরণে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

বৈষ্ণব মতবাদ ও সুফী মতবাদ সম্পূর্ণতই এই প্রপত্তিভাবের ওপর আধারিত। এই প্রপত্তিভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে নীচের গানটিতে–

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে ৰদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী,
আমি রথ, তুমি রথী মা, যেমন চালাও তেমনি চলি।"

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রপত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রপত্তিবাদে বিশ্বাসী সাধক কখনও কোন অসৎ বা অশুভ কর্মে রত হতে পারে না।

জড়বাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপ্রপত্তির ওপর। তাই জড়বাদে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। তাই যে মানুষ জড়বাদে বিশ্বাসী তাকে বিশ্বাস করা দায়। প্রপত্তিবাদীর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল–

"মন–গরীবের কী দোষ আছে,
তুমি জাদুগরের মেয়ে শ্যামা,
যেমন নাচাও তেমনি নাচে।"

যারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পেরেছে কেবল তারাই প্রপত্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে। চিন্তায় আচরণে–কর্মে–মানুষকে হতে হবে পরিচ্ছন্ন–স্বভাবের; যা সে বলবে বা করবে,

তা সে পষ্টাপষ্টিই বলবে বা করবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রে তার কোন ভেতর-বার থাকবে না। জীবনের ধারা যদিও সংকোচ-বিকাশী কিন্তু মানুষকে জীবনে হতে হবে সহজ সরল। সত্তাবিশেষের গতি যদিও সংকোচ- বিকাশী কিন্তু সেই গতিশীল সত্তাকে সহজ-সরল হতে হবে।

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।"

আমি বলছি না, আমি সেই পরম সত্তাকে জানি। আবার এও বলছি না যে আমি পরম সত্তাকে জানি না, কারণ সেই পরম সত্তা হলেন জানা-অজানার বাইরেকার তত্ত্ব। প্রপত্তিবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে-"আমি আছি, তুমিও আছ আর তুমি আমারই”, আর প্রপত্তিবাদের শেষ কথা হচ্ছে, "তুমি আছ প্রভু, কেবল তুমিই আছ"।

'আমি আছি' না থাকলে প্রপত্তিবাদের শুরুই হয় না। তাই গোড়ার দিকে প্রপত্তিবাদকে থাকতে হলে 'অহং অস্মি' অর্থাৎ 'আমি আছি'-কে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকছে 'ত্বম্ অসি', 'ত্বং হি' অর্থাৎ 'তুমি আছ', হ্যাঁ কেবল 'তুমিই আছ'।

(পটনা, ১১ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৮

“মায়ামেতাং তরন্তি তে”

"দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে”।।

এই দৈবী মায়া বা পরামায়া বা পরাশক্তি হচ্ছে ত্রিগুণাত্মিকা। এই মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। এটা একটা বাস্তব সত্য।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই মায়া কে বা কী? শ্লোকটিতে বলা হয়েছে: এই মায়া আমার। অর্থাৎ এই মায়া হ'ল পরমপুরুষের মায়া, সম্পূর্ণতই পরমপুরুষের আশ্রিতা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এই মায়াশক্তি কোন কাজই করতে পারে না।

'আনন্দসূত্রমে' বলা হয়েছে–'শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ'। শক্তি কোন স্বাধীন সত্তা নয়–সে পরমপুরুষের আশ্রিতা শক্তি। পরমপুরুষের সৃষ্ট মায়াই হ'ল 'ভবসাগর'। আর যেহেতু মায়া পরমপুরুষের অধীনা তাই যারা তার আশ্রয় নেয় কেবল তারাই

সেই দুস্তর মায়াসমুদ্রকে অতিক্রম করতে পারে। প্রাকৃত জীব এই মায়াকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু যে প্রকৃত সাধক সে ভয় পাবে কেন! বস্তুতঃ সাধক কখনও মায়াকে ভয় পায় না, কারণ সে যে পরমপুরুষকে ভালবাসে। তাই পরমপুরুষ যদি মায়াধীশ হন আর সাধকের যদি সেই মায়াধীশ পরমপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকে, তাহলে সে মায়াকে ভয় পাবে কেন? এই কারণে কোন জ্ঞানী মায়াকে ভয় পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি কখনও মায়ার ভয়ে ভীত হন না।

গল্পে আছে, একজন জ্ঞানী আর একজন ভক্ত একবার একটি আম বাগানে গেছে। যে জ্ঞানী সে করবে কী? না, আম বাগানে কতগুলো আম গাছ আছে তাই গুনতে শুরু করে দেবে। কিন্তু যে ভক্ত সে বাগানের আম গাছ থেকে পাকা আম পেড়ে খেতে শুরু করে দেবে। জ্ঞানী হয়তো তক্র বা ঘোল নিয়ে লম্বা-চওড়া আলোচনা শুরু করে দেবে। কিন্তু যে ভক্ত সে ক্রীম বা সারাংশ খেতে শুরু করে দেবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জ্ঞানী তার বাস্তব বুদ্ধিহীনতার জন্যে অনুতাপ করছে। কিন্তু যে ভক্ত সে সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করছে।

ভক্ত সব সময় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে। জ্ঞানী করে কী? -না, ধর্মশাস্ত্রের বা তর্ক শাস্ত্রের হাজার সমস্যা নিয়ে অযথা মাথা ঘামায়। কিন্তু ভক্ত ধর্মশাস্ত্রের সারাংশ আত্মসাৎ

করে। ভক্ত জেনে বুঝে পরমপুরুষের শরণ নেয়। যদি পরমপুরুষকে ধরি একটা জাহাজ....একটা প্রকাণ্ড বড় জাহাজ, ভক্ত করে কী? না, সে সেই প্রকাণ্ড জাহাজরূপী পরমপুরুষে চেপে বসে ও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যায়।

(পটনা, ১২ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

[সূচীপত্র]

প্রবচন–৯

পরমপুরুষের আর এক নাম হরি

পরমপুরুষের অনেক নামের মধ্যে একটি নাম 'হরি'। 'হরি' মানে যে হরণ করে। হরণ করা মানে চুরি করা। পরমপুরুষ চুরি করেন–এ আবার কেমন ধারা কথা! হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি, চুরি তিনি সত্যিই করেন.... ভক্তের পাপ হরণ করেন তিনি। তোমরা নিশ্চয় জান যে প্রতিটি কর্মের প্রতিকর্ম আছে। স্থান–কাল–পাত্রে যদি কোন হের–ফের না হয় তাহলে কর্ম ও প্রতিকর্ম সমান সমান হয়। ধর, একজন মানুষ অনেক পাপ কাজ করেছে। তাকে যদি সমস্ত পাপের ফল ভোগ করতে হয় তাতে তার হয়তো বিশ–পঁচিশ জন্ম লেগে যাবে। তাহলে যে

পাপী তার কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? সে কি কেবল তার কর্মের প্রতিকর্ম ভুগবার জন্যে এই পৃথিবীতে বার বার আসতে থাকবে? তথাকথিত সভ্যতার যত বিকাশ হচ্ছে মানুষের ততই মানসিক অবনতি ঘটছে.... মানুষের মানসিক অধঃপতন হচ্ছে আর দুষ্কৃতের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।

তাহলে দুষ্কৃতিকারীর কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? যদি সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করতে হয় তাহলে মানুষ মুক্তি-মোক্ষ তো কোন কালেই পাবে না। আবার একথাও সত্যি যে মানুষ যত বড় অপরাধীই হোক না কেন তার একটা ভবিষ্যৎ অবশ্যই আছে। যারা তাঁর শরণ নেবে পরমপুরুষ অবশ্যই তাঁদের জন্যে কিছু একটা করবেন।

পরমপুরুষ সম্বন্ধে বলা হয় তিনি স্বর্গ ও নরক দু'য়েরই অধীশ্বর। যারা নরকে আছে তারাও পরমপুরুষের সঙ্গে আছে। তারাও পরমপুরুষের প্রিয় সন্তান-সন্ততি। তাদের স্নেহ-ভালবাসা জানাবার জন্যে পরমপুরুষকে তাদের সঙ্গে নরকেই থেকে যেতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে পরমপুরুষ কী করবেন! তাদের পরিত্রাণের জন্যে পরমপুরুষ নিজ স্কন্ধে তাদের সমস্ত পাপের বোঝা তুলে নেবেন।

যাঁরা সত্যিকারের ভক্ত তাঁরা কখনই পরমপুরুষকে তাঁদের পাপের বোঝা দিতে চান না, বরং তাঁরা পরমপুরুষকে দিতে চান ফুল–ফল ইত্যাদি। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পাপের বোঝা বইতে চান।

এখন যেহেতু এই ভক্তেরা পরমপুরুষের অত্যন্ত প্রিয় তাই তাদের অনুমতি না নিয়েই পরমপুরুষ তাদের পাপের বোঝা নিয়ে নেন। লৌকিক ভাষায় বিনা অনুমতিতে অন্যের জিনিস নিয়ে নেওয়াকে বলে চুরি করা....হরণ করা। সে বিচারে পরমপুরুষকে বলা হয় 'হরি'। তোমরা যেহেতু সেই হরির শরণাগত তাই অযথা ভাবনা–চিন্তার কোন কারণ নেই। যদি নরকেও যাও দেখবে পরমপুরুষ সেখানেও তোমার সঙ্গে আছেন।

(পটনা, ১৩ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১০

ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ

মানুষের মন নির্বিষয় হয়ে থাকতে পারে না। আর যেহেতু মনকে একটা বিষয় নিয়ে থাকতেই হয়, যেহেতু বিষয়–রহিত অবস্থায় মন কাজ করা বন্ধ করে দেয় তাই সেক্ষেত্রে মনের একটা বিষয়ই থাকুক, শুধুমাত্র পরমপুরুষকেই মনের বিষয় করে নেওয়া হোক। মনকে তাই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বসাতেই হবে। আর এই স্থিরীকৃত মনকে বিন্দুস্থ হতে হবে কারণ সেই বিন্দুস্থ মনই শুধু পরম সত্তায় বিলীন হতে পারে।

'তদেকং জপামঃ তদেকং স্মরামঃ'। 'জপ' মানে কোন জিনিসের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। যদি কোন শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতেই হয় তাহলে সেই পরমপুরুষেরই নামই (অর্থাৎ সাধকের ইষ্ট মন্ত্র) জপ করা উচিত, অন্য কোন কিছু জপ করা চলবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে জপ তিন রকমের একটির নাম মানসিক জপ অর্থাৎ যখন তুমি মনে মনে জপ করছ তখন তোমার সেই মানসিক জপক্রিয়ার একমাত্র শ্রোতা হচ্ছ তুমিই। দ্বিতীয় রকমের জপ হচ্ছে উপাংশু জপ–যে জপ করতে গিয়ে ঠোঁট দু'টো অল্প একটু ফাঁক করছ আর তারও শ্রোতা হচ্ছ তুমিই। আর তৃতীয় ধরনের জপ হচ্ছে বাচনিক জপ অর্থাৎ তুমি তোমার বাক্–যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি তৈরী করছ। এই যে বাচনিক জপ এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জপ, আর সর্বোৎকৃষ্ট জপ হচ্ছে মানসিক জপ।

"তদেকং জপামঃ তদেকং স্মরামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।"

'নমঃ' মানে অন্য কোন সত্তার প্রাধান্য বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া। এই প্রাধান্য মেনে নেওয়াকে বলা হয় 'নমঃ'। মানুষকে পরমপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, জীবকে তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে। প্রশ্ন হ'ল কার প্রভুত্ব? না, পরমপুরুষের প্রভুত্ব? কে এই পরম সত্তা? 'জগৎসাক্ষীরূপম্'। এই আধিপত্য হ'ল সেই সত্তার যিনি সমগ্র বিশ্বের চরম সাক্ষী সত্তা, যিনি বিশ্বের সব কিছু দেখে চলেছেন। এই পরম সাক্ষী সত্তার কাছেই মানুষকে আত্মনিবেদন করতে হবে, কেবল তাঁকেই নমস্কার করতে হবে।

'জগৎসাক্ষীরূপম্'। এই বিশ্বকে সংস্কৃতে বলা হয় 'জগৎ'। 'গম' ধাতুর মানে হ'ল চলা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেউ স্থির নয়, কেউ গতিহীন নয়। সবাই চলে চলেছে। তাই বিশ্বকে বলা হয় ‘জগৎ’। চলমানতাই হ’ল এর ধর্ম, এগিয়ে চলাই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

“তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশম্।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ।।"

এই বিশ্বের সব কিছুর একটা অন্তবিন্দু..... একটা গন্তব্য স্থল অবশ্যই আছে। তেমনি সমস্ত ক্রিয়াকলাপের চরম তথা পরম শেষ বিন্দু হচ্ছে পরমপুরুষ। পরমপুরুষই একমাত্র সত্তা যিনি অন্য কোন সত্তার ওপর নির্ভরশীল নন। তাই ভক্ত বলছেন–"হে পরমপুরুষ, তুমি হলে সকল সত্তার আশ্রয়স্বরূপ। তুমিই একমাত্র সত্তা যার নিজের সত্তাগত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই।"

আমি একবার তোমাদের বলেছিলুম যে এই পটনা শহরটার আশ্রয় হচ্ছে পটনা জেলা। আর পটনা জেলার আশ্রয় বিহার প্রদেশ। বিহার প্রদেশটা হ'ল ভারতবর্ষের ভেতরে। ভারতবর্ষ রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। আর এশিয়া মহাদেশটা রয়েছে এই পৃথিবী গ্রহে। আর পৃথিবী গ্রহটা রয়েছে সৌরমণ্ডলের মধ্যে। আর সৌরমণ্ডলটা রয়েছে পরমপুরুষের মধ্যে। তাই পরমপুরুষ হলেন সর্বাশ্রয়, তাঁর কেউ আশ্রয় নেই। তিনি অন্য কোন আশ্রয়ের ওপর নির্ভরশীল নন। কোন দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্বের ওপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

মানুষকে বার বার এই পৃথিবীতে আসতে হয়–হয় মানব দেহে, নয় তো জীবজন্তুর শরীর ধারণ করে। প্রতিকর্ম বা

অভুক্ত সংস্কারের অপর নাম ‘ভব’। মানুষ বা অন্য যে কোন সত্তার নানান ধরনের সংবেগ নিহিত থাকে যার ক্ষয়ের জন্যে মানুষকে বার বার জন্ম নিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হ’ল এই ভবসমুদ্র অতিক্রম করার উপায় কী? বলা হয়ে থাকে ভবসমুদ্র অনতিক্রম্য। তোমার হাতে পায়ে এতখানি শক্তি বা সামর্থ্য নেই যা দিয়ে তুমি এই দুস্তর ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পার। তাই ভাল হয় যদি একটা ভাল রকমের নৌকা বা স্টীমারের সাহায্য পেয়ে থাক, যাতে চড়ে সেই মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে পার।

“হে পরমপুরুষ, তুমিই হলে সেই জাহাজ। আমি সেই জাহাজের আশ্রয় নিলুম, সেই জাহাজে চড়ে আমি ভবসমুদ্র পাড়ি দোব, ভবসমুদ্রের পরপারে পৌঁছে যাব। তোমার কৃপা বলে আমি তা করতে অবশ্য সক্ষম হব। তাই আমি তোমার শরণ নিলুম, “ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ।”

(পটনা, ১৪ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১১

সব কিছুই তিনি

“সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।”

এই শ্লোকটিতে পরমপুরুষ বা ভূমাচৈতন্যের গুণরাজির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সৃষ্টিধারায় ভূমা মনের উদ্ধৃতি ঘটেছে। আর এই ভূমা মনের রয়েছে অজস্র তরঙ্গ রয়েছে অফুরন্ত মানস–সামর্থ্য। তেমনি সৃষ্টিধারায় পরবর্তী ধাপগুলিতে যখন অণুমনের সৃষ্টি হ’ল তখন তাতেও এল মানস–প্রবাহ।

ভূমা মন অবশ্যই অসীম, অনন্ত। সমস্ত সৃষ্ট জগৎ তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি হলেন একচ্ছত্র অধিপতি। অণুমনের পক্ষে ভূমামনের সর্বাধিপত্যের প্রতি স্পর্দ্ধা জানানো সত্যিই অসম্ভব কারণ সব অণুমনই তো পরমপুরুষের বিরাট মনের. মধ্যেই রয়েছে। ভূমা মনের বিশাল অধিক্ষেত্রের মধ্যে সকলেরই অবস্থিতি। বস্তুতঃ এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হ’ল ভূমামনের কল্পনাসঞ্জাত। অণুমন যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, পরমপুরুষ তখনই তা জেনে ফেলেন কারণ সব কর্মগত অভিব্যক্তিই তো সেই ভূমা মনের অভ্যন্তরেই হয়ে চলেছে।

মানুষের একটা ছোট্ট ক্রেণিয়ামের মধ্যে রয়েছে একটা ছোট্ট মস্তিষ্ক। তাই তোমার মানসিক সামর্থ্য খুবই সীমিত। পরমপুরুষের মস্তিষ্কের দরকার পড়ে না কারণ তাঁর পক্ষে সব কিছুই অভ্যন্তরীণ। তুমি তোমার ছোট্ট মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। আর পরমপুরুষ তাঁর বিরাট মন দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। তুমি দু'টো চোখ দিয়ে দেখে থাক-তোমার চাক্ষুষী নাড়ীর ও স্নায়ুতন্ত্রীর সীমিত সামর্থ্য দিয়ে দেখে থাক। কিন্তু পরমপুরুষ-তিনি তাঁর অনন্ত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে সব কিছু দেখে থাকেন। একই সঙ্গে যাবতীয় কার্যকলাপকে অবলোকন করে থাকেন। এই ভূমা দৃষ্টির জন্যে সব দিকেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত। তাই তুমি যা দেখ বা দেখতে পাও তিনি তা অবশ্যই দেখে থাকেন। আবার তুমি যা দেখতে পাও না তিনি তাও দেখে থাকেন। সকল মনের প্রতিচ্ছবি তাঁর মানস মুকুরে অবিরত প্রতিফলিত হয়ে চলেছে।

তোমার রয়েছে দু'টো ছোট ছোট পা! তাই তোমাকে পটনা থেকে কলকাতায় পৌঁছুতে কিছুটা সময় অবশ্যই লাগে। তুমি একই সময়ে কলকাতা বা পটনায় থাকতে পার না। কিন্তু পরমপুরুষের বিরাটত্ব নিৰন্ধন সব জায়গাতেই তাঁর পা রয়েছে। পটনা থেকে কলকাতা যেতে গেলে তাঁকে পটনা ছেড়ে যাওয়ার দরকার পড়ে না। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী, সব কিছু দেখেছেন,

সব কিছুই জানছেন, বুঝছেন। বস্তুতঃ তিনিই সব কিছু। এই পাঞ্চভৌতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর মানস বিষয়। তিনি পরম বিষয়ী আর বাকী সব কিছু তাঁর বিষয়। মানুষ তার উচ্চতর কোষগুলির সাহায্যে নিম্নতর কোষের পাঞ্চভৌতিক অভিপ্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর সব কোষের নিয়ন্ত্রক বিন্দু হ'ল সহস্রার চক্র। অর্থাৎ এই পাঞ্চভৌতিক বিশ্বে সহস্রার চক্র হ'ল সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এই সহস্রার চক্র হ'ল পরমপুরুষের অধিষ্ঠানস্থল। আর তাই সহস্রার চক্র হ'ল চরম নিয়ন্তা বিন্দু। ভূমা পুরুষ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়কে জানেন। এখানে বলা হয়েছে যে পরমপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যৎ এই দুইকেই জানেন। কিন্তু বর্তমান সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি।

এখন প্রশ্ন হ'ল বর্তমান বলতে ঠিক কী বোঝায়? অতীতের খানিকটা অংশ আর ভবিষ্যতের খানিকটা অংশ যাকে মানুষ স্মৃতিপটে ধরে রাখতে পারে, তাই বর্তমান পদবাচ্য। ধর, দু'জন লোকের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। ওদের একজন যখন কিছু বলছে অপর জন তা শুণছে কয়েক সেকেণ্ড পরে কারণ বায়ু শব্দতরঙ্গকে স্থান থেকে স্থানান্তরে বয়ে নিয়ে যেতে কিছুটা সময় নিচ্ছে। যিনি বলছেন তাঁর পক্ষে বক্তব্যটা হয়ে গেছে অতীত আর যিনি শুণছেন তাঁর পক্ষে সেটা তখনও ভবিষ্যতের

জিনিস। তাই বর্তমান কাল বলতে কিছু নেই। বিভু সত্তা সর্বসত্তার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত আছেন।

‘সর্ব’ শব্দের অর্থ কী? ‘স’ হ’ল সত্ত্বগুণের ৰীজমন্ত্র, ‘র’ শক্তির (energy) ৰীজমন্ত্র আর ‘ব’ হ’ল বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের বীজমন্ত্র। এই বিশ্বের সব কিছুই সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূত আর সব কিছু শক্তি বা এনার্জি দ্বারা বিধৃত। আর প্রতিটি সত্তারই একটা মৌলিক ধর্ম থাকে। তাই প্রত্যেক সত্তাই এই সর্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ‘সর্ব’ মানে সব কিছু, সেই পরমপুরুষ এই সব কিছুকে জানেন।

আনন্দমার্গ দর্শন অনুযায়ী স্বর্গ–নরক বলে কোন কিছু নেই। সুতরাং তোমরা কখনও কাউকে অসহায় বলে ভাবতে দেবে না। পরমপুরুষ স্বর্গ ও নরক (যদি কোথাও থাকে) সর্বত্র আছেন। কাজেই তুমি কখনও একলা নও। তোমরা কখনও অসহায় মানসিকতাকে প্রোৎসাহিত করবে না। পরমপুরুষ সদাসর্বদা তোমার সঙ্গে আছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বদাই তোমাকে ভালবাসেন। তাই তুমি কোন প্রকার হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দিও না। সেই পরমপুরুষকেই নিজের জীবনের একমাত্র ধ্যেয় করে নাও, আর তাঁকে জেনে মুক্তি লাভ করো।

(পটনা, ১৫ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১২

মন ও ইচ্ছাশক্তি

মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল এই যে, পশু যা করে তা সে পরমপুরুষের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী করে থাকে, সে তার সহজাত প্রকৃতির বশে করে থাকে। কিন্তু মানুষ যা করে তা নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও মানস–শক্তি অনুযায়ী করে থাকে। পশুর উন্নত মন নেই, কিন্তু মানুষের তা আছে। তাই মানুষ যদি তার উন্নত মনকে ঠিক ভাবে কাজে না লাগায় তাহলে সে তো পশুর চেয়েও অধমের মত কাজ করল। বৈয়ষ্টিক শারীরিক কারণবশতঃ মানুষে মানুষে মানসিক পার্থক্য অবশ্যই থাকে। আর এই মানসিক পার্থক্যের পেছনে নানাবিধ সংস্কারজ সংবেগ থাকে। মানুষ ভাল কাজও করতে পারে, আবার খারাপ কাজও করতে পারে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সে ঋণাত্মক প্রতিসঞ্চরের পথেও চলতে পারে।

পাপ বলতে ঠিক কী বোঝায়? যা করা উচিত নয় তবুও যদি তা করা হয় তাকে বলি পাপ। আর যা করা উচিত কিন্তু

তা করা হ'ল না সেটা হ'ল প্রত্যবায়। পাপ আর প্রত্যবায় এ দু'য়ের মিলিত নাম পাতক।

সাধারণ পাতকী যে পাপ কাজ করে থাকে তা বড় ধরনের অপরাধ হলেও অক্ষম্য নয়। পাতকীর উদ্ধার বা পাপস্খালন হতে পারে যদি সে অতীতের পাপকে ভুলে গিয়ে আধ্যাত্মিক পথ ধরে চলতে থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের পাতকীকে বলা হয় অতিপাতকী। অতিপাতকী বলা হয় তাকে যে কোন নির্দিষ্ট মানুষের স্থায়ী রকমের শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করে। অতিপাতকীর পক্ষে মুক্তির সর্বোত্তম উপায় হ'ল নিজের বৈয়ষ্টিক সুখ–সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে মানব কল্যাণের ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করা।

তৃতীয় ধরনের পাতকীকে বলি মহাপাতকী। মহাপাতকীর অপরাধ পৌনঃপুনিক ধরনেরই হয়। মুক্তির জন্যে মহাপাতকীকে মানব কল্যাণের জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ তো করতেই হবে, তদতিরিক্ত তাকে এমন কিছু করতে হবে যার ফল মানুষ জাতির পক্ষে চিরকল্যাণকর হবে।

(পটনা, ১৬ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১৩

ৰন্ধন মুক্ত হও

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ–মোক্ষয়োঃ”। মানুষের মনই তার বন্ধন তথা মুক্তির কারণ। কেন এমনটা বলা হয়ে থাকে? কারণ মনুষ্যেতর যত জীবজন্তু আছে তাদের কারো স্বাধীন মন বলে কিছু নেই। কতকগুলো স্বভাবজ প্রবৃত্তির দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের স্বাধীন মন বলে একটা জিনিস আছে। মানুষ তার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম করতে পারে, তা দিয়ে তারা বন্ধনের পথকে অথবা মুক্তির পথকে বেছে নিতে পারে। আর এখানেই হ'ল মানুষ ও পশুর মধ্যে মূলগত পার্থক্য।

মনকে একটা বিষয় নিয়ে থাকতে হবে। তাই শাস্ত্রে বিষয়কে বলা হয় 'আভোগ'। আভোগ তাকেই বলে যা মনের খোরাক, যাকে ইংরেজীতে বলি মেন্টাল পেবুলাম (mental pabulum)। এই মানুস আভোগ যদি সীমিত ধরনের হয় তো মানুষের আভোগও সীমিত হয়ে পড়ে। আর মানস আভোগ যদি অনন্ত হয় তা'হলে সেই অনন্ত প্রাপ্তির এষণায় মানুষের আভোগও অনন্ত হয়ে যায়। মানুষ এই সীমিত আভোগ বা অনন্ত আভোগ কোনটাকে বেছে

নেবে, তা তার মানস ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। মানুষ বড় হবে না ছোট হবে তা সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট মানুষটির আশা–আকাঙ্ক্ষার ওপর।

'ৰন্ধস্ত বিষয়াসঙ্গী মুক্তো নির্বিষয়ংস্তথা'। মানুষের মানস বিষয় যদি ছোটখাট হয় আর তাতে সে যদি ৰদ্ধ হয়ে পড়ে তা হলে সে ৰন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়ে। আর মনের বিষয় যদি অনন্ত হয় তবে সেই অনন্ত বিষয় প্রাপ্তির এষণায় সে তল্লীন হয়ে যায় কারণ এই অনন্ত সত্তাকে ধারণ করা তো সম্ভব নয়। আমরা একে বলি 'মুক্তি' (liberation)।

"পাশৰদ্ধঃ ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ ভবেচ্ছিবঃ”। যে মানুষের বিষয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা সীমিত সে তো ৰদ্ধ জীব। আর যে মানুষের মানস আভোগ অনন্ত মনকে তখন তো আর সীমার ৰন্ধনে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। তাই সেটা ৰন্ধনের অতীত অবস্থা অর্থাৎ মুক্তির অবস্থা। মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনা করে কেন? না. তার আধ্যাত্মিক সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল জৈব ক্ষুদ্রত্বের ভাবকে ত্যাগ করে বন্ধনমুক্ত হওয়া বা শিবত্বপ্রাপ্ত হওয়া। এটাই জীবনের চরম লক্ষ্য। (পটনা, ১৭ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১৪

কৃষ্ণ ও রাম

'কৃষ্ণ' শব্দের তিন ধরনের ব্যাখ্যা আছে–দার্শনিক (philosophical), জীববৈজ্ঞানিক (biological), ঐতিহাসিক (historical)।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'কৃষ্ণ' মানে সেই সত্তা যিনি সবাইকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন। জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারেই হোক, সবাই তাঁর দিকে আকর্ষিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য জীবের ধর্মই হচ্ছে পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে চলা। তিনি সবাইকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। জীব তাঁর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দিকেই ছুটে চলেছে।

দ্বিতীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা হচ্ছে: প্রতিটি অণুমনের মধ্যেই 'আমি আছি', 'আমি রয়েছি' এই ধরনের একটা অস্তিত্ব–ৰোধ রয়েছে। তাই অহংবাচক 'আমি' ৰোধও রয়েছে। যদি কৃষ্ণ না থাকতেন তাহলে 'আমি ৰোধ'–ও থাকত না। তাই বলা হয় 'কৃষির্ভূ'।

জীব–বৈজ্ঞানিক বা বায়োলজিক্যাল 'কৃষ্ণ' জিনিসটা কেমন? –না, জীব– বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণ হলেন এমন এক সত্তা যিনি সহস্রার চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত থেকে সমস্ত জৈবী বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন.... পরিচালিত করছেন।

এবার আসছে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের কথা। সকলেই জানে যে মহাভারতের যুগে কৃষ্ণ নামে এক বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যিনি ধর্ম ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বয়ং সংগ্রাম করেছিলেন ও অপরকেও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

পরমপুরুষের আর এক নাম 'রাম'। এই 'রাম' শব্দেরও তিন ধরনের ব্যাখ্যা আছে। যোগীরা বা আধ্যাত্মিক সাধকেরা সীমিত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁরা চান অনন্ত অসীমিত কিছু–"নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"–সীমিত খণ্ডসত্তা থেকে আনন্দ–সম্প্রাপ্তি সম্ভব নয়। আর যে অসীম সত্তা অনন্ত আনন্দের সন্ধান দিতে পারে সেই সত্তাই হলেন রাম–"রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন্"।

'রাম' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হ'ল 'রাতি মহীধরঃ রামঃ'। এই বিশ্বের সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল সত্তা হলেন রাম। 'রাতি' শব্দেব আদ্যক্ষর 'রা' আর 'মহীধর' শব্দের আদ্যক্ষর 'ম'–দুয়ে মিলে 'রাম'। এই সৌরজগতে আমরা সূর্যের কাছ থেকে শক্তি পেয়ে

থাকি। কিন্তু সূর্য শক্তি পেয়ে থাকে কার কাছ থেকে? না, পরমপুরুষের কাছ থেকে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে অজস্র অগণিত সৌরজগৎ। আর এই সমস্ত সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পরমপুরুষ.... পুরুষোত্তম। তিনিই হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তির মধ্যমণি, আর কেবল তাঁরই কাছ থেকে সূর্য পেয়ে থাকে শক্তি। তাই বলা হয় 'রাতি মহীধরঃ রামঃ”।

'রাম' শব্দের তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে 'রাবণস্য মরণম্'। 'রাবণস্য' শব্দের আদ্যক্ষর 'রা' আর 'মরণম্' শব্দের আদ্যক্ষর 'ম'–দু'য়ে মিলে 'রাম'। এখন 'রাবণ' শব্দের অর্থ কী? রাবণ হচ্ছে পুরাণ–বর্ণিত দশ মস্তকবিশিষ্ট এক কাল্পনিক চরিত্র। এখানে দশটি মাথা হ'ল মানবমনের বহির্মুখী বৃত্তির দ্যোতক–যে বৃত্তিগুলি মানুষের মনকে বাইরের জড়জগতে দশ দিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখন মনকে এই জড়তার হাত থেকে কী ভাবে বাঁচানো যায়? এর উত্তরে বলব, কেবল পরমপুরুষের শরণ নিলেই মনকে জড়তার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। পরমপুরুষের শরণ নেওয়া মানেই রাবণের মৃত্যু। তাই যার হাতে রাবণের মৃত্যু সুনিশ্চিত তিনিই 'রাম'।

(পটনা, ১৮ই অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১৫

মানুষ নিমিত্তমাত্র

রৌ + অণ্ করে 'রাবণ' শব্দ নিষ্পন্ন। যা জীবের অধোগতি ঘটায়, যা জীবকে রৌরব নরকের পথে ঠেলে দেয় তা–ই রাবণ। বস্তুতঃ অধঃপতিত স্থূলত্বপ্রাপ্ত মন যা দশ দিকে কাজ করে চলে তা–ই রাবণ। এখানে রাবণ হ'ল এক পৌরাণিক কল্পনা–ঐতিহাসিক সত্তা নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের চারটি বিভাজন রয়েছে– (১) কাব্য (ঘটনার এক চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা), (২) পুরাণ (কাল্পনিক, কিন্তু শিক্ষাপ্রদ গল্প), (৩) ইতিকথা (ঘটনার তত্ত্ব–তথ্যগত পঞ্জীকরণ) ও (৪) ইতিহাস (শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে এমন বাস্তব ঘটনার পঞ্জীকরণ)। মহর্ষি বেদব্যাস লিখেছিলেন আঠারটি পুরাণ। সবই কাল্পনিক গল্প। তাদের কোন কোনটি হয়তো স্বীকৃত দর্শনের বিরুদ্ধেও গেছে। তাই বেদব্যাস শেষ পর্যন্ত একটি শ্লোকে পরমপুরুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষাও করেছেন।

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো যদ্ধ্যানেন কল্পিতম্।
স্তুত্যাহনির্বচনীয়তা অখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।

ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং যৎ তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশো তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।।”

এই বিশ্বের সবচেয়ে ভাস্বর সত্তা কোনটি? না, সেই ভাস্বর সত্তাটি হচ্ছেন পরমপুরুষ। কারণ, ব্রহ্মচক্রের ভূমাকেন্দ্র থেকেই যাবতীয় সত্তা তাদের শক্তি পেয়ে থাকে! তিনিই সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল সত্তা, আলোকোজ্জ্বল সত্তা। ছোট বড় সব কিছুরই রয়েছে এক একটা বৃত্তাকার সংরচনা। একটা ছোট্ট পরমাণু– তারও একটা নিয়ন্ত্রণ–কেন্দ্র রয়েছে আর সেই নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে চলেছে বহুসংখ্যক বিদ্যুতণু। চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবী গ্রহের চারপাশে, আর অন্যান্য গ্রহেরা ঘুরছে সূর্যের চারপাশে, অন্যান্য আর সমগ্র সৌরসংরচনাটা ঘুরে চলেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যমণি পরমপুরুষের চারপাশে। কাজেই পরমপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে সূর্যেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই যে আমাদের বহু পরিচিত বিদ্যুৎ বা ইলেক্ট্রি, সিটি, এও সূর্যের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তি পেয়ে থাকে। অন্যান্য জ্যোতিষ্কসমূহও সূর্যের কাছ থেকে শক্তি পেয়ে থাকে। একমাত্র পরমপুরুষই হলেন বিশ্বের জ্যোতিষ্মান্ সত্তা আর বাকী সবাইকার আলোক হ'ল তাঁরই প্রতিফলিত জ্যোতিঃ মাত্র। তিনিই হলেন বিশ্বের সবচেয়ে জ্যোতিষ্মান সত্তা।

শক্তিকে খালি চোখে দেখা যায় না। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, পাখা ঘুরছে ইত্যাদি দেখে শক্তির ক্রিয়ান্বিত রূপকে বুঝতে পারি। ঠিক তেমনি কেউ কখনও সূর্যকে প্রত্যক্ষ করে নি, দেখেছে তার ক্রিয়াগত অভিব্যক্তিকে। বহু দূর থেকে দেখলে সূর্যকে গোলাকার দেখায় কিন্তু কাছে থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। তাই বিদ্যুৎ, সূর্য–এরা সবাই অনুভব করবার জিনিস। মন সম্বন্ধেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। কেউ কখনও মনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে না। এমনকি কেউ কখনো নিজের মনকে দেখতেও পায় না। শুধু এইটুকু অনুভব করে যে তার মন বলে একটা জিনিস রয়েছে। ঠিক তেমনি পরমপুরুষ কেমন তা অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়।

মানুষের মন এই শারীর যন্ত্রের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে থাকে। ধর, কেউ তার অর্জিত জ্ঞান বা তার বৌদ্ধিক শক্তির গর্ব করছে। এটা হ'ল এক ধরনের মানসিক অভিব্যক্তি। যখন তুমি তোমার অস্তিত্বকে সামগ্রিক ভাবে অনুভব কর, তখন তুমি হয়ে যাও সম্পূর্ণ এক পরিবর্তিত সত্তা। ধর, তুমি ভূভুত দেখলে। এক্ষেত্রে তুমি করলে কী? না, একটা ঋণাত্মক ভ্রান্তি দর্শন সৃষ্টি করলে। পরবর্তীকালে ভয় পেয়ে যখন তোমার সামগ্রিক সত্তা সঙ্কুচিত হ'ল তখন মনটা হয়ে গেল বিষয়ীভূত।

অনুরূপভাবে জীবমনের সবটাই যখন পরমপুরুষের ভাবনায় ভরপুর হয়ে যায় তখনই মানুষ লাভ করে এক আনন্দঘন অবস্থা যা সে অন্তরে অনুভব করে কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না।

মানুষ ছোট-বড় কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু একটা মাধ্যম মাত্র। পরমপুরুষের কাছ থেকে শক্তি পেয়ে সে যা কিছু করে থাকে। এই প্রসঙ্গে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। একবার দেবরাজ ইন্দ্র কোন ব্যাপারে উপদেশের জন্যে সর্বশক্তির উৎস পরমপুরুষের কাছে উপনীত হন। পরমপুরুষ শুধু একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন-'দ'। দেবতারা এর ব্যাখ্যা করলেন 'দমনং কুরু' অর্থাৎ হীন প্রবৃত্তিকে দমন করো। মানুষ আর অসুরেরাও তাঁর কাছে গেল। পরমপুরুষ তাদের জন্যেও একই শব্দ উচ্চারণ করলেন-'দ'। মানুষেরা এর অর্থ নিল-'দয়াং কুরু' (দয়া করো) আর অসুরেরা এর ব্যাখ্যা করলেন-'দানং কুরু' (দান করো)। তাই দেখা যায় অসুরদের মধ্যে সম্রাট মহাবলীর মত এক দাতাকে।

(পটনা, ১৮ই অগাষ্ট, ১৯৭৭)

সূচীপত্র

প্রবচন–১৬
গোপী কে

পরম তত্ত্বকে লাভ করবার জন্যে তিনটি স্বীকৃত উপায়ের কথা বলা হয়ে থাকে– জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। এটা সবাই মেনে নিয়েছে। এমনকি শঙ্করাচার্য যিনি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে পরিগণিত হন তিনিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন– “মোক্ষকারণসমগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"–মুক্তি–মোক্ষের জন্যে ভক্তিই হ'ল সর্বোত্তম উপায়। জ্ঞান ও কর্মের চেয়ে ভক্তি অবশ্যই মহত্তর।

'ভক্তি' কাকে বলব? সংস্কৃত 'ভজ্' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন' প্রত্যয় করে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ভজ' ধাতুর অর্থ হ'ল সব চিন্তা পরিত্যাগ করে এক ও অদ্বিতীয় পরম সত্তার ভজনা করা। আর সর্বপ্রকার ভাবনা–চিন্তাকে সরিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার দিকে যখন মনের ভাবনা, আশা–আকাঙ্ক্ষা, চিত্তবৃত্তি সব কিছুই ছুটে চলে সেই যে মানস প্রবাহ তাকেই বলব 'ভক্তি'। এই যে ভক্তির অনন্যমুখী ধারা একে 'প্রেম'–ও বলা হয়। যখন এই মানসপ্রবাহ অন্য কোন কিছুর দিকে ধাবিত না হয়ে কেবল বিষ্ণুর দিকে প্রধাবিত হয় সেটাই প্রেম পদবাচ্য। "অনন্যমমতা

বিষ্ণুর্মমতা প্রেমসঙ্গতা"। 'মম' মানে আমার আর 'মমতা' হ'ল 'মম' শব্দের উত্তর 'তা'-প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্য। 'মমতা' মানে আমার আমার ভাব।

'বিষ্ণু' বলতে ঠিক কী বোঝায়? যে সত্তা সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত তিনিই বিষ্ণু। "বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ"। অর্থাৎ যে সত্তা বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন তিনিই বিষ্ণু।

ভক্তির ক্ষেত্রে কোন জোড়াতালি চলবে না, কোন খাদ থাকবে না। যেমন ধর, মানুষ সোণাতে তাঁবা মেশায়, কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে কোন মিশ্রণ চলবে না। ভক্তিকে অবশ্যই হতে হবে শুদ্ধাভক্তি.... অবিমিশ্রা ভক্তি অর্থাৎ বলা হচ্ছে মনের মধ্যে কোন গোপন স্বার্থবুদ্ধি-প্রেষিত কামনা-বাসনা থাকবে না। যদি মনের মধ্যে আর কোন বাসনা থাকে, হয়তো সেই বাসনার পূর্ত্তি ঘটবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে পরমপুরুষ অলভ্যই থেকে যাবেন। সেখানে গোপন ইচ্ছাটাই ছিল মুখ্য চিন্তা আর ভক্তিটা ছিল কেবল একটা লোক দেখানো জিনিস। ভক্তির 'বেলায় এমনটি চলবে না।

এই 'শুদ্ধাভক্তি' জিনিসটা কেমন? আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না, শুধু তোমাকে ভালবাসি, আর ভালবাসি এই

জন্যে যে তোমাকে ভালবেসে আমিও আনন্দ পাই। এটা হ'ল রাগানুগা বা শুদ্ধা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তিও শেষ কথা নয়। রাগানুগা ভক্তির পেছনে ভাবটা হ'ল এই যে, মানুষ পরমপুরুষকে ভালবাসবে এই জন্যে যে পরমপুরুষকে ভালবেসে সে নিজেও আনন্দ পাবে। যাঁরা আরও বড় ভক্ত তাঁরা এই জিনিসটা পছন্দ করেন না। তাঁরা পরমপুরুষকে ভালবাসেন নিজেরা আনন্দ পাবেন ভেবে নয়–পরমপুরুষ আনন্দ পাবেন, এই জন্যে তাঁরা তাকে ভালবাসেন। পরমপুরুষ আনন্দ পান এটাই তাঁদের কাম্য। আমি আমার নিজের জন্যে কোন আনন্দ চাই না, আমি তোমাকে আনন্দ দিতে চাই, তাই তোমাকে ভালবাসি। এটাই হ'ল সর্বোচ্চ ভক্তি। শাস্ত্রে একেই বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। যাঁরা এই রাগাত্মিকা ভক্তির সাধনা করেন তাঁরা হলেন 'গোপ'–"গোপায়তে যঃ সঃ গোপঃ”। লৌকিক সংস্কৃতে 'গোপ' মানে গোপালক, কিন্তু দর্শনের ভাষায় তা নয়। 'গোপায়তে' মানে আনন্দ বিধান করা। তাই পরমপুরুষের আনন্দ বিধান করাই যাদের স্বভাব তারাই হ'ল গোপ। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়েছে পরমাত্মা হলেন এই গোপেদের দাসানুদাস। তাই বলব সাধকের জীবনে রাগাত্মিকা ভক্তিই হ'ল মোক্ষ লাভের সুন্দরতম উপায়, এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

(পটনা, ১৯শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১৭

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি..."

কীর্ত্তন সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের যে শ্লোকটি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে সেটি হ'ল–

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"।।

এখানে নারায়ণ বলছেন, তিনি কোথায় থাকেন আর কোথায় থাকেন না। নারায়ণ হলেন এক সর্বানুস্যূত সত্তা। শাস্ত্রের ভাষায় এই সর্বব্যাপী বা সর্বানুস্যূত সত্তা 'বিষ্ণু' নামে পরিচিত। "বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ"।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুন্ঠে" অর্থাৎ আমি বৈকুন্ঠে থাকি না। এখানে 'বৈকুন্ঠ' শব্দের অর্থ কী? 'কুন্ঠা' মানে সঙ্কোচন। এখন প্রশ্ন হ'ল, মনের এই সঙ্কোচনটা আসে কেন? মানুষ যখন পাপ করে অথবা হীন বৃত্তির দ্বারা প্রেষিত হয় তখনই তার মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। মনের সেই সঙ্কুচিত অবস্থায় আত্মার

বিস্তারের অবকাশ থাকে না। তাই আত্মার বিস্তৃতির জন্যে মনের এই সঙ্কোচন অবস্থাটাকে দূর করতে হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল মনের এই সঙ্কোচন অবস্থাটা দূরীভূত হয় কখন? না, মন যখন পাপ চিন্তা থেকে দূরে সরে যায়। আর যে মুহূর্তে মনের সঙ্কোচন অবস্থাটা দূর হয় তখনই মন পাপের আবিলতা থেকে মুক্ত হয়, আর তখন সেই মানুষটির হৃদয়ে বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব ঘটে। "নাহং, তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে"। নারায়ণ বলছেন, তিনি এই ধরনের বৈকুণ্ঠে বাস করেন না।

"যোগিনাং হৃদয়ে ন চ"। তিনি আরও বলছেন, তিনি যোগীদের হৃদয়েও বাস করেন না। এখন প্রশ্ন হ'ল, যদি তিনি যোগীদের হৃদয়েও বাস না করেন তাহলে বাস করেন কোথায়? কথাটা যখন নারায়ণ বলছেন তখন এটা মানতেই হবে আমাদের।

যোগী কে? "সংযোগ যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্মা–পরমাত্মনঃ" অর্থাৎ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা দু'য়ে মিলে এক হয়ে যান, সেটাই হ'ল যোগ। 'যোগ' শব্দটি সংস্কৃত মূল ধাতু 'যুজ্' ও তার সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। দুই আর দুই মিলে চার। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্তাগুলি মিলিত বা মিশ্রিত অবস্থাতেও তাদের সত্তাগত পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে। যেমন দু'টো

"আম আর দু'টো আম মিলে হয় চারটে আম; আবার এই চারটে আম তো পৃথক পৃথক ঘরানারও হতে পারে, যদিও এখন তারা সংখ্যায় দুয়ে দু'য়ে মিলে চারে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা মিলে মিশে এক হয়ে যায় নি। তাদের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। এই ধরনের মিলন বা মিশ্রণকে সত্যিকারের যোগ বলব না। সত্যিকারের যোগে সমরসতা বা সামরস্য প্রতির্ষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এমন একটা সংযুক্তির অবস্থা যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার আর পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে না, সবাই মিলেমিশে একীভূত হয়ে যায়। এটাই যোগের সত্যিকারের অবস্থা। যিনি এই ধরনের যোগে প্রতির্ষ্ঠিত তিনিই যোগী।

যোগের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হ'ল, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”। যখন মানব মনের বিভিন্ন বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় সেই অবস্থাটাকে বলা হয় 'যোগ'। আর সেই অবস্থাপ্রাপ্ত সাধককে বলা হয় 'যোগী'। নারায়ণ বলেছেন, তিনি এই ধরনের যোগীদের হৃদয়েও বাস করেন না। কী অদ্ভুত কথা! নারায়ণ হলেন সর্বানুস্যূত সত্তা। যদি তাই হয় তাহলে যোগীর হৃদয় কি সেই 'সর্ব'-এর বাইরে? হ্যাঁ, এর একটা উত্তর আছে। তিনি বলছেন, "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তির্ষ্ঠামি নারদ"- যেখানে আমার ভক্তরা কীর্ত্তন করে আমি সেখানেই অবস্থান করি, নারদ, আমি আমার ভাবকেন্দ্রকে, কর্মকেন্দ্রকে সেইখানেই স্থানান্তরিত করি।

এই 'নারদ' শব্দের অর্থ কী? 'নার' শব্দের তিনটি অর্থ: প্রথম অর্থ হ'ল 'নীর' বা জল (water); দ্বিতীয় অর্থ হ'ল 'পরমা প্রকৃতি' (Supreme Creative Principle); তৃতীয় মানে হ'ল 'ভক্তি' (devotion)। নারদ নারদ। মূল ধাতু 'দা' + 'ড' প্রত্যয় করে 'দ' শব্দটি এসেছে। 'দ' মানে যে দেয় বা যিনি দেন (giver)। তাহলে 'নারদ' শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে যিনি নার অর্থাৎ ভক্তি দান করেন বা ভক্তি বিতরণ করেন। নারায়ণ নারদকে বলছেন, "হে নারদ, আমি আমার কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করি সেখানটিতে যেখানে আমার ভক্তরা আমার নাম নিচ্ছে, আমার গুণকীর্ত্তন করছে। কেন তা করি তার উত্তরে বলব যে ভক্তহৃদয়ে থাকে উচ্ছ্বাস ও আবেগ। সেই উচ্ছ্বাস ও আবেগের মাধ্যমে আমি বিশ্বে আধ্যাত্মিক তরঙ্গধারা উৎসারিত করে থাকি"।

এখন যোগীরা তো তাদের চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করবার জন্যে তাদের হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে রাখেন। তাই তাদের হৃদয় থেকে কোন তরঙ্গধারা উৎসারিত হয় না। এই কারণে নারায়ণ যদিও তাঁর কেন্দ্র যোগীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত করতে চান কিন্তু সেখান থেকে তো আর আধ্যাত্মিক তরঙ্গধারার উৎসারণ হবে না। কিন্তু তিনি যদি ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানটিতে তাঁর ভাবকেন্দ্র নিয়ে যান তাহলে সেখান থেকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে

তরঙ্গায়িত করা সম্ভব হবে। তাতে নারায়ণের উদ্দেশ্যও সফল হবে। তাই নারায়ণের পক্ষে ভক্তের হৃদয়ে বসতি স্থাপন করাটাই অধিকতর বুদ্ধিমত্তার কাজ।

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে নারায়ণ সর্বত্রই বিরাজমান কিন্তু তাঁর অধ্যাত্মতরঙ্গের স্ফুরণ, বিস্ফূরণ ও স্পন্দন সর্বত্র সমান নয়। তিনি সব জায়গায় থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর স্পান্দনিক উৎসারণ কেবল সেখান থেকেই শুরু হয় যেখানে তাঁর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রবিন্দু অধিষ্ঠিত। যেখানে ভক্তরা উচ্চৈঃস্বরে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, পরমপুরুষ শুধু সেই স্থানটিতে তাঁর দিব্য রাজধানী স্থাপন করেন।
ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশের চেয়ে আর ভাল স্থান কী হতে পারে! তাই নারায়ণ যে বলেন 'আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না', থাকি সেখানে যেখানে আমার ভক্তেরা আমার গুণকীর্ত্তন করছেন–এ কথাটা খুবই খাঁটি।

(পটনা, ২০শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–১৮

পরম সত্যকে খোঁজ

এই বিরাট বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যমণি হলেন পুরুষোত্তম। প্রতিটি পারমাণবিক সংরচনার রয়েছে একটি করে কেন্দ্রবিন্দু। সেই কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে ঘুরে চলেছে অজস্র বিদ্যুতণু। অনুরূপ ভাবে আমাদের এই পার্থিবচক্রের কেন্দ্র বিন্দু হ'ল এই পৃথিবী আর তার চারদিকে ঘুরে চলেছে চন্দ্র। তেমনি এই সৌরচক্রে সূর্য হ'ল কেন্দ্রবিন্দু আর সেই সূর্যের চারপাশে ঘুরে চলেছে অনেকগুলি গ্রহ। তেমনি বিশ্বসংরচনার মধ্যমণি হলেন পুরুষোত্তম আর তাঁর চারপাশে ঘুরে চলেছে অজস্র সত্তা, অনেক সৌর সংরচনা।

তবে এই বিশ্বসৃষ্টিধারার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্যান্য সংরচনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে যারা ঘোরে তারা ঘোরে পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে কিন্তু সৃষ্টির যে গতিধারা তা কেবলমাত্র ভৌতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা মানস জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যাপারটা হ'ল এই যে বিশ্ব– সৃষ্টিসংরচনার সমস্ত জীবজগৎ পরমপুরুষের চারিদিকে ঘুরে চলেছে মনের দিক থেকেও-–কেউ তা করছে জ্ঞাতসারে,

কেউ বা অজ্ঞাতসারে। যারা এইভাবে জ্ঞাতসারে তাঁর চারদিকে ঘুরে চলেছে, নেচে চলেছে তারা সত্যিই ভাগ্যবান।

আবার অনেকেই তাঁর চারিদিকে ঘুরে চলেছে তাদের অজ্ঞাতসারেই, না জেনে–বুঝেই। এই যে পরমপুরুষের চারপাশে তাদের ঘুরে চলাটা তারা তা বুঝতে পারে না তাদের স্থূল মানস আভোগের প্রভাবে। আর তার ফলে সৃষ্টির মধ্যমণি থেকে তাদের ব্যাসার্ধগত দূরত্ব বেড়েই চলে। তবে কখনো কখনো তারা তাদের মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়েও ফেলে। যখন অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের এই দূরত্ব বেড়ে যায়, তাদের ক্লেশের মাত্রাও বেড়ে যায়। আর যখন তাদের ব্যাসার্ধের দূরত্ব কমে যায়, তখন তাদের সুখানুভূতিও বেড়ে যায় আর এটাই হচ্ছে এই বিশ্বসৃষ্টির ব্যবস্থার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য কেন্দ্রবিন্দুর ক্ষেত্রে যে চলমানতা তা শুধু ভৌতিক জগতেই সীমিত। প্রতিটি সত্তার মনে রাখা উচিত যে মানস সৃষ্ট সব কিছুই, এমনকি মানস সামর্থ্যের অভিব্যক্তিও পরম মধ্যমণির চারপাশে ঘুরে চলেছে। তাই প্রতিটি জীবেরই বৈয়ষ্টিক ছন্দের সঙ্গে পরাগতির সন্তুলন বজায় রেখে চলা উচিত (Subjective approach through objective adjustment)। মানুষ এই যে ধর্মচক্রে যোগদান করে তা হ'ল এই সাবজেক্টিক এ্যাপ্রোচ বা পরা গতির সঙ্গে বৈষয়িক জগতের একটা সন্তুলনের

প্রয়াস, কেননা পরমপুরুষ হলেন জীবের পরম আরাধ্য (Supreme Subject) আর অন্যান্য সত্তা বা বস্তুসমূহ হ'ল তাঁর মানস বিষয় (object)। আবার যদি মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে বিষয় ধরা হয় তা হলে মানুষের মন হ'ল বিষয়ী (subject)। আবার মন যেখানে বিষয় সেখানে বিষয়ী হচ্ছে আত্মা। আবার আত্মা যেখানে বিষয় সেখানে বিষয়ী হচ্ছেন পরমাত্মা। তাই দেখতে গেলে পরমাত্মাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিষয়ী (Supreme Subjectivity) আর ব্রহ্মের অতিমানস কোষ হ'ল সেক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থূলতম বিষয়।

যেখানে জ্ঞান আছে কিন্তু ভক্তি নেই সেক্ষেত্রে এই ধরনের মানুষেরা (যারা নিজেদের অজ্ঞানতার দরুণ ব্যাসার্ধকে বাড়িয়ে ফেলে) তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর মানুষ যদি পরমসত্তাকে অনুসন্ধান না করে নিজের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে রত হয় সেক্ষেত্রে মানুষ পরম সত্যকে জানতে ব্যর্থ হয়।

(পটনা, ২১শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

[সূচীপত্র]

প্রবচন–১৯

তুমি কী চাও

আমাদের সমাজে রয়েছেন অগণিত নৈয়ায়িক। তাঁদের কেউ বলেন এটা ঠিক, আবার কেউ বা বলেন–না, এটা ঠিক নয়। আমরা এই ধরনের নৈয়ায়িকদের ওপরে নির্ভর করে বসে থাকতে পারি না। মূল কথা হচ্ছে, মানুষের উচিত তার আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকা বা নীতিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা। নৈয়ায়িকরা কে কী বললেন তার ওপর নির্ভর করে হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকা আদৌ ঠিক নয়।

"নিন্দগ্ত নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবস্তু।
লক্ষ্মী সমাবিশতু গৃহং গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।।
অদ্যৈব মরণমস্ত্র যুগান্তরে বা।
ন্যায়াৎ পথি প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।।”

শাস্ত্রে বলে, মানুষের উচিত তাদের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা। তাতে তাদের ভাগ্যে নিন্দা বা স্তুতি যাই জুটুক না কেন, তাতে তাদের গৃহে ধনাগম হোক বা ধনক্ষয়ই হোক, তাতে তারা হাজার বছরই বাঁচুক বা পরমুহূর্তেই মৃত্যুমুখে

পতিত হোক তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। এই ধরনের লোকেদের বলে 'ধীর'।

তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ হ'ল–তোমার এই ধরনের ধীর স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। যা–ই ঘটুক না কেন, নিজের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকো। এতেই নিহিত রয়েছে তোমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতি।

যদি পরমপুরুষ তোমায় জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী চাও', উত্তরে তুমি কী বলবে? তুমি অবশ্যই বলবে, "হে পরমপুরুষ, আমি শুধু তোমার আশীর্বাদ চাই যাতে আমার মেধা, আমার বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত হয়"। তোমরা জান যে বুদ্ধিই হ'ল মানুষের প্রগতি বা অধোগতির কারণ। তাই তোমার মন যদি এগিয়ে চলার যথার্থ দিঙনির্দেশনা পায় তবে তোমার আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে।

বেদে বলা হয়েছে যে এই বিশ্বের স্রষ্টা হচ্ছেন সুমহান পরমপুরুষ। বেদে আরও বলা হয়েছে যে পরমপুরুষের কাছে মানুষের চাইবার শুধু একটি জিনিসই আছে আর তা হ'ল–যেন তার মেধা ও বুদ্ধি শুভের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। গায়ত্রী ছন্দে রচিত প্রার্থনায় বলা হয়েছে–"হে বিশ্বস্রষ্টা, আমার বুদ্ধিকে ভূমানন্দের পথে পরিচালিত করুন"।

বেদগুলো লেখা হয়েছিল বিভিন্ন ছন্দে–গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতি, বৃহতি ও পঙক্তি। গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিনটি পঙক্তি আর প্রতি পঙক্তিতে থাকে আটটি করে মাত্রা। 'গায়ত্রী' শব্দের অর্থ হ'ল যা গানের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। মানুষ যতদিন ইষ্টমন্ত্রের সাধনা না পাচ্ছে ততদিন এই ইষ্টগায়ত্রী ব্যবহার করতে পারে কিন্তু একবার ইষ্ট মন্ত্রের সাধনা পেয়ে গেলে আর তার গায়ত্রীর দরকার পড়ে না।

(পটনা, ২২শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২০

স্বধর্ম ও পরধর্ম

এই পরিদৃশ্যমান জগতে জড় ও চেতন দুই ধরনের সত্তাই রয়েছে। সকল জীবেরই একটা করে ধর্ম থাকে। জীবমাত্রেরই এই ধর্মকে বলা হয় জৈব ধর্ম কিন্তু মানুষের ধর্ম হ'ল 'ভাগবত ধর্ম'। আর এই ভাগবত ধর্ম নিহিত রয়েছে বিস্তার, রস ও

সেবা তত্ত্বের মধ্যে। তুমি তোমার স্বধর্মের অনুবর্তন করো, আর তোমার সেই স্বধর্মই হ'ল ভাগবত ধর্ম।

মানুষের ঈশ্বরকে ভালবাসে–কেউ জেনেবুঝে, কেউ বা না–জেনে না–বুঝে।প্রত্যেক মানুষেরই আধ্যাত্মিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম–এইগুলি মানুষের স্বধর্ম নয়। মানুষের স্বধর্ম হ'ল ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্মে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকৃত। কারণ, ভাগবত ধর্ম হ'ল গুণের অপরাধবর্জিত। এই যে তিনটি গুণ, এরা যেন অরণ্যচারী তিন তস্করের মত।

গল্পে আছে, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তিন তস্করের সাক্ষাৎ হয়। ভদ্রলোকটি জঙ্গলে পথ হারিয়ে এদিক–ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। একজন তস্কর এসে ভদ্রলোককে বেঁধে ফেলল। ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন–"কে তুমি"?

তস্করটি জবাব দিল–"আমি তমোগুণ"।

দ্বিতীয় তস্করটি ভদ্রলোকের কাছে এসে লক্ষ্য করল ভদ্রলোক যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তস্করটি তার হাত–পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিল। তখন ভদ্রলোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন–"কে তুমি"?

প্রত্যুত্তরে সে বললে–"আমি রজোগুণ"।

এরপর তৃতীয় তস্করটি ভদ্রলোকটির কাছে এসে তার দুঃখ দেখে বিচলিত হ'ল। সে বললে–"যদি আপনি ওই দিকে যান তাহলে নগরে পৌঁছে যাবেন। ওই নগরটি হচ্ছে আলোর নগরী, ভাগবত ধর্মের নগরী"। আমরা হলুম তস্কর, তাই আলোর নগরীতে, ভাগবত ধর্মের নগরীতে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তাই বলি স্বধর্ম অনুসরণ করো। আর মনে রেখো স্বধর্ম অনুসরণ করা যদি তোমার পক্ষে কষ্টকরও হয়, আর পরধর্ম অনুশীলন করা যদি সহজসাধ্যও হয় তবু তুমি তোমার স্বধর্ম অর্থাৎ ভাগবত ধর্মকে পরিত্যাগ কোরো না। যারা পরধর্ম অনুবর্তন করে, জেনে রেখো তাদের গতি অবশ্যই জড়াভিমুখী হয়। যদি ক্লেশের হাত থেকে পরিত্রাণ চাও তা হলে স্বধর্মের অনুবর্তন করে যাও।

(পটনা, সকালবেলা, ২৩শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২১

উত্তম, মধ্যম ও অধম

মানুষকে মুখ্যতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়–উত্তম, মধ্যম ও অধম। অধম শ্রেণীর মানুষ তাদের বলা হয় যারা কোন কাজে হাত লাগায় না। তারা ভাবে, তারা হচ্ছে অতি সাধারণ মানুষ.... তাই তারা কোন কাজই করতে পারবে না। তারা সব সময়ই কাজের পথে কী কী বাধা আসবে সেই সম্ভাব্য বাধার ভয়ে ভীত হয়, আর তাই তারা কোন কাজেই সহজে হাত লাগাতে চায় না।

মধ্যম শ্রেণীর মানুষ বলব তাদের যারা কোন কাজ শুরু করে কিন্তু যেই কোন সমস্যা দেখা দেয় অমনি তারা সেই কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারা ভাবতে থাকে যে তাদের চলার পথের বাধাটা হচ্ছে যেন উত্তুঙ্গ হিমালয় সদৃশ। আর তাই তারা কাজ ৰন্ধ করে হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকে। তারা ভাবতে থাকে যে, কাজে এগোতে গেলে তাদের যে পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, সেই সমস্যার সমাধান তারা করতে পারবে না। অর্থাৎ নিজেদের শক্তি–সামর্থ্য সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নেই। থাতত জিকা চাই) কলাগাছত

আর উত্তম শ্রেণীর মানুষ তারা যারা জেনেবুঝে কাজে হাত দেয় আর যে কাজে তারা হাত দেয় সেই কাজের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির জন্যে দৃঢ়নিশ্চয় থাকে। লক্ষ্যে না পৌঁছোনো পর্যন্ত তারা সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যায়। এমন কোন সমস্যা থাকতে পারে না যার সমাধান নেই। এমন কোন কঠিন কাজ থাকতে পারে না যা মানুষের সামর্থ্যের অতীত। তারা যে কোন বাধাবিপত্তি বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত, যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে তৈরী। যত বাধাই আসুক না কেন, তারা তাদের মূল উদ্দেশ্য পূর্তির জন্যে সর্বদাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি চাই, তোমারা উত্তম শ্রেণীর মানুষ হও। তোমরা সর্বদাই লক্ষ্যের কথা চিন্তা করো। সব সময় নিজেদের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখো। আর এই ভাবে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের নীতিকে, নিজের আদর্শকে কঠোর ভাবে মেনে চলো।

(পটনা, সন্ধ্যাবেলা, ২৩শে অগাস্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২২

"শুভয়া সংযুনক্ত্ব”

পরমপুরুষ যদি তোমায় জিজ্ঞেস করেন তুমি কী চাও, তাহলে তুমি কী বলবে? না, সেক্ষেত্রে তোমার একটা কথাই বলা উচিত হবে–'হে পরমপুরুষ, আমি শুধু তোমার আশীর্বাদ চাই যেন আমার মন, আমার বুদ্ধি- মেধা ঠিক পথে চলে'। কারণ, মেধা–বুদ্ধি যদি ঠিক পথে চলতে থাকে, তাহলে চাইবার আর রয়েছে কী! যা পাবার তা তো পেয়েই গেলে। মানুষের যে অধঃপতন হয় তা তো কেবল এই বুদ্ধির দোষেই–ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির জন্যেই।

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত্ব”। বেদে বলা হয়েছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা সুমহান। তাঁর কাছে আমার একটিই প্রার্থনা, আর তা হ'ল তিনি যেন আমার বুদ্ধিকে শুভের সঙ্গে সংযুক্ত রাখেন। আমি এতটুকুই চাই–আর কিছু না। সংস্কৃত গায়ত্রী ছন্দে রচিত সবিতৃ ঋকে বলা হয়েছে–

“ওঁ ভূর্ভুবঃ–স্বঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ”।।

'ধীমহি' অর্থাৎ আমরা ধ্যান করি। আমরা কেন তাঁর ধ্যান করি? না, ধ্যান এই জন্যে করি যাতে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভত্বের পথে পরিচালিত করেন।

এই বিশ্বব্রহ্মান্ড সপ্তলোকাত্মক ভূ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। এই সপ্তলোকের সবিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা হলেন পরম ব্রহ্ম। 'সবিতা' মানে পিতা। কেউ কেউ ভুল করে কন্যার নাম রাখেন 'সবিতা'। না, কোন মেয়ের নাম সবিতা রাখা ঠিক নয়, কারণ 'সবিতা' মানে পিতা–এটি পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। আমরা সপ্তলোকের স্রষ্টা সগুণ ব্রহ্মের বরেণ্য জ্যোতির ধ্যান করি। কেন করি? –না, আগেই বলেছি, ধ্যান এই জন্যে করি যাতে তিনি কৃপা করে আমাদের বুদ্ধি বা মেধাকে ঠিক পথে পরিচালিত করেন। 'ধী' মানে বুদ্ধি বা মেধা; 'নঃ' মানে 'আমাদের'; 'প্রচোদয়াৎ' মানে 'শুভ পথে পরিচালিত করুন'।

মানুষের পক্ষ থেকে এই একটি প্রার্থনাই করা যেতে পারে– পরমপুরুষ যেন মানুষের বুদ্ধিকে খাঁটি পথে পরিচালিত করেন। বুদ্ধি যদি ঠিক পথে চলে তাহলে প্রাপ্তব্য সব কিছুই অধিগত হয় আর বুদ্ধি যদি বিপথগামী হয়, মানুষ কিছু পায় না। এমনকি সব কিছু পেয়েও সে কোন কিছুকে রাখতে পারে না।

(পটনা, ২৪শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

প্রবচন–২৩

পরমপুরুষের আবির্ভাব

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।"

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে। মানবতা তখন এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছিল। মহাভারত রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সে যুগের আর্ত মানবতাকে পরিত্রাণ করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দেবে, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটবে, তখনই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে তাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন। কৃষ্ণের এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির যাথার্থ্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করো।

এখানে অর্জুনকে 'ভারত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 'ভারত' শব্দের অর্থ কী? 'ভৃ' ধাতু + 'অল্' প্রত্যয় করে পাই 'ভর' শব্দ। 'ভর' মানে 'যে ভরণ করে'। 'তন্' ধাতু +ড = ত। 'ত' মানে যে বিস্তৃতি ঘটায়। তাই 'ভরত' মানে যিনি জীবকে খাদ্যসামগ্রী যুগিয়ে ভরণ পোষণ করেন, যিনি মানুষের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক প্রগতি ঘটাতে পারেন। সাধারণতঃ ঊনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তারপর তার ক্ষয় শুরু হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতি হতে পারে। যে দেশে এমন ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে তার নাম ভারতবর্ষ। 'বর্ষ' শব্দের অর্থ এই ভুমণ্ডলের একাংশ। সাধারণতঃ 'ভারত' শব্দের সঙ্গে দেশ অর্থে 'বর্ষ' শব্দের সংযুক্তি ঘটে থাকে।

ভারতে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আর্যদের ভৌতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। ভারতে পৌঁছোনোর পর তাদের ভৌতিক অস্তিত্ব তথা মানসিক বিকাশ এই দু'টো সমস্যারই সমাধান হ'ল। তাই তাঁরা দেশটির নাম দিলেন 'ভারতবর্ষ'।

আলোচ্য শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'ভারত' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষের শারীরিক,

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করুন। তাই তিনি অর্জুনকে 'ভারত' শব্দে সম্বোধন করেছেন।

'গ্লানি' শব্দের অর্থ কী? কোন জিনিসের যা স্বীকৃত মান তার চেয়ে নীচু হলে তাকে বলব 'গ্লানি'। ধর্মের যে স্বীকৃত মান তার চেয়ে নীচে নেবে গেলে তাকে বলব ধর্মের গ্লানি। যেমন ধর, রাজমুকুট ধারণের স্বীকৃত স্থান হ'ল মস্তক। এখন যদি কেউ মাথায় মুকুট না পরে পায়ে পরে তাকে বলব রাজমুকুটের গ্লানি। তাই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দেবে, অধর্মের অভ্যুদয় হবে, যখন মানুষের মাথার মুকুট মস্তকের শোভা না বাড়িয়ে পায়ের শোভা বাড়াবে আর পায়ের জুতা মাথার শোভা বাড়াবে, তখন তিনি ধর্মকে সগৌরবে স্বস্থানে পুনঃ–প্রতির্ষ্ঠিত করবার জন্যে তারকব্রহ্মা রূপে মর্ত্যভূমিতে জন্ম নেবেন।

ছোট ছোট লড়াইকে বলে যুদ্ধ (battle), বড় বড় যুদ্ধকে বলে মহাযুদ্ধ (war)। যুদ্ধে অনেক সময় ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নগণ্য। তখন পরমপুরুষ স্বয়ং তারকব্রহ্ম রূপে মর্ত্যলোকে নেবে আসেন ও এসেই মানব সমাজকে ধর্মপক্ষ ও অধর্মপক্ষ দুটি বিবদমান শিবিরে ভাগ করে দেন। তিনি উভয় পক্ষকেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত

করে তোলেন ও শেষ যুদ্ধে ধর্মের বিজয় হয়। তাই হে মানুষ! ভীত হয়ো না, অন্ধকারের পর আলো আসবেই আসবে।

(পটনা, ২৫শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২৪

আবির্ভাবের তাৎপর্য

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

কাল যে প্রসঙ্গের সূচনা করেছিলুম আজ সেই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করব। 'ত্রাণ' মানে অব্যাহতি, 'পরিত্রাণ' মানে স্থায়ী অব্যাহতি বা স্থায়ী নিবৃত্তি। 'সাধু' কাকে বলব? যাঁর কার্যের দ্বারা অন্যে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উপকৃত হয় তিনিই 'সাধু' পদবাচ্য।

'বিনাশায়' বলতেই বা কী বোঝায়? 'নাশ' শব্দের পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করলে ব্যুৎপন্ন শব্দগুলির অর্থও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। 'নাশ' শব্দের অর্থ হ'ল সত্তার মূল কারণে ফিরে যাওয়া। 'নাশ' শব্দের পূর্বে 'বি' উপসর্গ লাগলে তার মানে হবে সেই ধরনের নাশ যা থেকে সেই সত্তার আর পুনরুত্থান ঘটবে না।

'দুষ্কৃতাম্' বলতে ঠিক কী বোঝায়? শব্দটির অর্থ হ'ল 'পাতকী' অর্থাৎ যে 'পাতক' কর্ম করে চলেছে; 'পাতকী' তাকেই বলব যে একই সঙ্গে পাপ ও প্রত্যবায় দুই–ই করে চলেছে। পাপের চেয়ে প্রত্যবায় বেশী মন্দ।

'সংস্থাপন' কথাটার 'নির্গলিতার্থ কী? প্রতিটি বস্তুরই একটা স্বীকৃত মান বা নির্দিষ্ট স্থান থাকে। কোন বস্তুকে পতিত অবস্থা থেকে স্বমহিমায় নিয়ে যাওয়াকে বলে 'স্থাপন'। আর সেই পুনঃ–প্রতিষ্ঠিত বস্তুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করাকে বলে 'সংস্থাপন'।

'সম্ভবামি' মানে সম্যক রূপে জন্ম গ্রহণ করি। তোমরা সম্যক্ দর্শন ও সম্যক জ্ঞানের কথা শুণেছ। এখন এই যে সম্যক জন্ম এর অর্থ কী? এই বিশ্বের মধ্যমণি বা চক্রনাভি যখন একটা পাঞ্চভৌতিক আধার গ্রহণ করে সেটিকেই বলা হয় 'সম্ভবামি'। আনন্দমার্গ দর্শনে একে বলে তারকব্রহ্ম। ভৌতিক আধার গ্রহণ

করায় সেই ভূমা সত্তা ভাবলোকে বিচরণ করে ও একই সঙ্গে অণুমনের অধিক্ষেত্রের বাইরে নির্গুণ (unqualified), নিরাকার ও ভাবাতীত (transcendental) সত্তার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখে।

এরপর আসছে 'যুগে যুগে' শব্দ দুটি। সাধারণতঃ 'যুগ' শব্দের মানে বোঝায় একটা কালের পরিসমাপ্তি। তোমরা জান মানব অস্তিত্ব হ'ল এক আদর্শপ্রবাহ। যখন মানুষের আস্তিত্বিক ও সামাজিক মূল্য স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে পড়ে, মানুষ সেই বদ্ধ পরিবেশে যখন হাঁপিয়ে পড়ে তখন পরমপুরুষ তাঁর বিশাল চিন্তাপ্রবাহে পরিবর্তন ঘটান। মানুষের মান ও মূল্যবোধের যখন আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হয় তাকে বলা হয় একটা যুগ। এই ধরনের পরিবর্তন ঘটানো সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। একমাত্র তারকব্রহ্মই পারেন এই ধরনের বিরাট কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করাই।

যুগ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তোমরা সকলেই সর্বান্তঃকরণে সদ্বিপ্র সমাজ গড়তে ঝাঁপিয়ে পড়ো। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থেমে থেকো না বা কোন অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠার জন্যে ভীত হয়ো না। জয় তোমাদের হবেই হবে।

(পটনা, ২৭শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২৫

মানসিক ভারসাম্য

আসলে মানুষ সুখও চায় না, দুঃখও চায় না.... মানুষ চায় মানসিক শান্তি, মানসিক স্বস্তি। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ কত শত লোকের সংস্পর্শে আসে। মাঝে মাঝে কারো কারো সঙ্গে তার সংঘর্ষও বেধে যায়। তাহলে মানসিক শান্তি বা স্বস্তি সে পাবে কী করে?

যারা অন্যের প্রতি অবিচার করে তাদের অন্যের কাছ থেকে অবিচার সইতেও হয়। যারা অবিচার করে তারা সংগ্রামকালে মানসিক ভারসাম্য খুইয়ে বসে। যারা অন্যের প্রতি অবিচার করে না তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানসিক সন্তুলন বজায় রাখতে সক্ষম হয়। যারা মানসিক শান্তির অধিকারী তাদের এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ঈর্ষা ও ঘৃণা মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। যাকে তুমি ঘৃণা কর তার যদি বিপদও হয় তবু তার জন্যে তুমি

সাধারণতঃ কোন ব্যথা অনুভব কর না। কিন্তু ব্যথা অনুভব করা উচিত। এমনকি চরম পাপীর জন্যেও তোমার হৃদয়ে অনুকম্পা থাকা উচিত। তার জন্যে তোমার হৃদয়ে দুঃখবোধ–সমবেদনা পোষণ করা উচিত।

একটি হিন্দী কবিতায় আছে, একবার একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– তোমার মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ছাপ কেন? তুমি কি কিছু হারিয়ে ফেলেছ? তুমি কি কাউকে কিছু দান দিয়ে ফেলেছ? লোকটি জবাবে বললে না, আমি কিছু হারাইও নি, আর কাউকে কিছু দানও দিই নি। আমি বিষণ্ণবোধ করছি এই জন্যে যে আমি দেখলুম এক জন অন্য জনকে কিছু দান দিচ্ছে। তাই দেখেই আমার মুখ বিষণ্ণ।

"সোমী কহে সোমা সে, কাঁহে মুহ্ মলিন্?
ক্যা কুছ গাঁঠ সে গীর গয়ো, ক্যা কুছ দীও দীন?
সোমা কহে, ন কুছ গীরো, ন কুছ দীয়ো দীন,
দোসরকো দেত দেখো তাঁহে মুহ্ মলিন ।"

এই যে ঈর্ষা–বিদ্বেষ, এই বৃত্তিগুলো মানুষের মনকে অধঃপাতে ঠেলে দেয়। **এমনকি যে মানুষ চরম পতিত বা মহাপাতকী, চরম হতভাগ্য তাকেও কখনও ঘৃণা করো না। যদি কাউকে ঘৃণা কর তাহলে তোমার নিজেরই মানসিক ও**

আধ্যাত্মিক অধোগতি হবে। ভগবান বুদ্ধ বলতেন, "অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে। জিনে কদরীয়ং দানেন, সচ্চেন অলীকবাদিনম্।।”

তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ক্রোধ পরিহার করা। অনৈতিকতা ও মিথ্যাচারিতার মাঝে থেকেও নিজের নীতি থেকে কখনও বিচ্যুত হয়ো না। যদি তোমার এ বিষয়ে নিপুণতা থাকে, তাহলে তুমি প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে জয়যুক্ত হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, দুঃখে উদ্বিগ্ন ও সুখে উল্লসিত হয়ো না, সর্বাবস্থায় মানসিক সন্তুলন বজায় রেখে চলো।

তোমরা লক্ষ্য করেছ যে আনন্দমার্গের নাম-যশঃ বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? -না, আমরা মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলব। নিন্দা-স্তুতি সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলব। একবার এক ধনশালী বৈশ্য ভগবান বুদ্ধকে গালি দিয়েছিলেন। বুদ্ধ তাতে অবিচলিত থেকে যান। বুদ্ধ সেই গালি গ্রহণ না করে সেই নিন্দা-কটূক্তি সেই ধনশালী বৈশ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন জেলে ছিলুম, আমার বিরুদ্ধেও কিছু লোক নিন্দা–অপবাদ রটিয়েছিল। আবার সেই নিন্দুকরাই আজ আমার প্রশংসা করছে কিন্তু আমি তাদের নিন্দা– স্তুতিতে সেদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম আর আজ তাদের প্রশংসারও অভিলাষী নই।

(পটনা, ২৭শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২৬

অন্যায়ের পথে ঝকমারি

মানুষের যা করা উচিত নয় তা করাটা হ'ল পাপ, আর যা করা উচিত তা না করাটা প্রত্যবায়। পাপ ও প্রত্যবায়–দু'য়ে মিলে পাতক। চুরি করা অনুচিত জেনেও যদি কেউ চুরি করে সেটা হবে প্রত্যবায়।

যতদিন পর্যন্ত মানুষ পাপের প্রতিফল না পাচ্ছে ততদিন পাপকে ভাল বলেই মনে হয়। ভারতীয় কোন শহরে ধোপাকে কাপড় কাচতে দেখেছ? দেখবে সে যে কাপড়গুলো কাচছে সেগুলোকে মাথার বেশ কিছুটা ওপরে তোলে। কাপড় ভাবে,

তারা কেমন মাটির ওপরে উঠে হাওয়ায় ভাসছে আর তা ভেবে খানিকটা আনন্দও পায়। কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে তাদের যতটা ওপরে তোলা হবে ততটাই জোরে তাদের কাপড়-কাচা-পাথরটায় আছাড় মারবে। যারা পাপ করে তারা ঠিক মাথার ওপরে তোলা কাপড়গুলোর মত। তারা ভাবে, আহা! মাটি থেকে ওপরে উঠে কী আরাম! পাপে ডুবে থেকে তারা বেশ মজা লোটে। আর যখন পাপের প্রতিফল ভুগতে থাকে তখন দুঃখ সাগরে ডুবে মরে ঠিক ধোপার কাপড়ের মত।

'স্বচ্ছ' ও 'ভদ্র' শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। 'স্বচ্ছ' মানে ভাল বা পরিষ্কার, যেমন স্বচ্ছ জল। 'ভদ্র' মানে যা ভেতরে বাইরে দুই দিক দিয়েই ভাল। যারা ভদ্র তারা কোন কিছু করার আগে বেশ সতর্ক থাকে। তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে নেয় তাদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। তারা ভাল কাজ করে ও করতে থাকে যদিও তারা তাদের সৎ কর্মের সৎ প্রতিফল সেই মুহূর্তে পায় না। যতদিন তারা সৎকর্মের সৎ প্রতিফল না পাচ্ছে ততদিন তারা কষ্ট ভোগ করতেও দ্বিধা করে না। আর যে মুহূর্তে ভাল কাজের ভাল প্রতিফল শুরু হয়ে যায় তখন কেবল আনন্দ আর আনন্দ।

অসৎ কর্ম করতে গিয়ে মানুষের ভালই লাগে। কিন্তু অসৎ কর্মের প্রতিকর্মের ভোগ একবার শুরু হয়ে গেলে কেবল দুঃখ

আর দুঃখ। অসৎ মানুষ প্রথম শ্রেণীর কামরায় বিনা টিকিটে বেশ আরামে ভ্রমণ করে। রেল কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে সে মজা লোটে। আর যে সৎ মানুষ সে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভ্রমণ করে। অসাধু যাত্রীটি মজা লোটে ঠিকই কিন্তু খুবই স্বল্পকালের জন্যে। যখন টিকিট পরীক্ষকের দল এসে তাদের পাকড়াও করে বা তাদের বন্দী করে অথবা জরিমানা করে তখন লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। কিন্তু সৎ মানুষ (যদিও গরীব) সসম্মানে নিজ গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যান। অসাধু যাত্রীটির শেষ পর্যন্ত কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সৎ যাত্রীটি সৎ জীবন যাপন করেন ও তাঁর যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অসাধু মানুষটি ঘুষ নেয় ও নানান অকর্মে লিপ্ত থাকে। সে আয়কর ফাঁকি দিয়ে নিজের জন্যে প্রকাণ্ড বাসভবন নির্মাণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয়কর বিভাগের কর্মীরা এসে একদিন তার বাড়ীতে হানা দেয় ও আয়কর ফাঁকি তথা অসদুপায়ে ধনসম্পদ সংগ্রহের দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। শেষ পর্যন্ত তাকে জেল খাটতে হয়।

তাই পাপ করার আগে মানুষের ভেবে দেখা উচিত তার কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে, সেই মুহূর্তে বা তৎপরবর্তীকালে। ভাল কাজ করতে গেলে হয়তো গোড়ার দিকে কষ্ট হবে কিন্তু ভাল কাজের প্রতিফল ভাল হবেই।

সৎ কর্ম করো কিন্তু ঔদ্ধত্য ও মিথ্যা অহমিকা ত্যাগ করো। মনে রেখো তোমার ঔদ্ধত্য ও মিথ্যা অহংকার আনন্দমার্গের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

(পটনা, ২৮শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২৭

সম্যক্‌ সঙ্কল্প

ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত অষ্ট শীলের অন্যতম শীল হ'ল 'সম্যক সঙ্কল্প'। সম্যক্‌ সঙ্কল্প ব্যতিরেকে মানুষ ঠিক পথে চলতে পারে না, নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। ঠিক ভাবে চলতে গেলে ও যথাযথ উন্নতি করতে গেলে মানুষের পক্ষে সম্যক আদর্শ ও সম্যক সঙ্কল্প অপরিহার্য। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মানুষ যখন নিজেকে তার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, তাকেই বলে সঙ্কল্প।

গৌতম সিদ্ধার্থ যখন বোধিজ্ঞান লাভের জন্যে সাধনায় বসলেন তখন তাঁর সামনে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। তাঁর

মনে ছিল নানান দ্বিধা–সংশয়। এমনকি তিনি ঠিক কী চান সে বিষয়েও সুনিশ্চিত ছিলেন না। আর তাই তিনি যা চাইছেন তা পাবেনই সে বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তিনি গভীর ধ্যানে বসলেন (সুজাতা কর্তৃক প্রদত্ত পায়স ভক্ষণের পর), তিনি নিলেন এক বজ্রকঠোর সংকল্প। তিনি তাঁর লক্ষ্যও স্থির করে ফেললেন ও এক সুদৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইলেন। তিনি সংকল্প নিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাপ্ত না হচ্ছেন, ততদিন ধ্যানাসন থেকে একচুলও এদিক–ওদিক নড়বেন না। তাতে তার শরীর থাক বা না থাক। আর এই জন্যেই তিনি তাঁর নিজ লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্তিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য ৰোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।।"

মানুষের সুদৃঢ় সংকল্পই তাকে মহান করে তোলে। সুদৃঢ় সংকল্প বলেই অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। তাই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যদি তোমার বজ্রকঠোর সংকল্প থাকে তবে তুমিও একদিন মহান হবে। মনে

রেখো এই বজ্রকঠোর সংকল্প ব্যতিরেকে জীবনে মহৎ কোন কিছুই লাভ করা যায় না।

(পটনা, ২৯শে অগাষ্ট ১৯৭৯)

সূচীপত্র

প্রবচন–২৮

‘মাং পাহি নিত্যম্’

“অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবিরাবির্ম এধি।।”

• * * *

“রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।”

ঋষি বলছেন, “আমাকে অসৎ থেকে সৎ–এর দিকে নিয়ে চলো; অন্ধকার থেকে আলোকের দিয়ে নিয়ে চলো; মরণশীলতা থেকে অমৃতত্বের দিকে নিয়ে চলো।”

শ্লোকটির মানে বোঝবার আগে শ্লোকটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করো। প্রথমেই ‘অসৎ’ ও ‘সৎ’ দু’টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘সৎ’ মানে কী? যা পরিণামী, যা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে তা–ই ‘অসৎ’। এই ‘অসৎ’ মানুষকে শাশ্বত সুখ দিতে পারে না। আর তাই আমরা এই পরিবর্তনশীল জগৎকে একান্তভাবে পেতেও চাই না। কারণ, এই নিত্য বিবর্তনশীল জগৎ সুখের বদলে মানুষকে দুঃখই দেয়। আমাদের ক্ষণিক সুখ পর মুহূর্তেই নিদারুণ দুঃখে পরিণত হয়। তাই যা অপরিণামী, যা কখনও পরিবর্তিত হয় না, তা–ই হ’ল ‘সৎ’।

যেখানে তমসা, যেখানে অন্ধকার, বুঝতে হবে সেখানে আধ্যাত্মিকতা নেই। তাই ঋষি প্রার্থনা করছেন, আমাকে অসৎ থেকে সৎ–এর দিকে, তমসা থেকে জ্যোতির দিকে নিয়ে চলো।

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছোট্ট শিশু বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় আর এই বিবর্তনের শেষ ধাপ হ’ল মৃত্যু। যা পরিবর্তনসাপেক্ষ তা–ই মৃত্যু। তাই ঋষি মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে পরিচালনার জন্যে পরমপুরুষের কাছে প্রার্থনা করছেন।

মনে রেখো, অকল্যাণের বার্তা নিয়ে কোন সত্তার আগমন ঘটলে তাকে বলে ‘প্রাদুর্ভাব’। কোন কিছুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে মানেই তা মানুষের অকল্যাণ– অমঙ্গল এনেছে। এই যে ‘প্রাদুর্ভাব’, এরই বিপরীত শব্দ হ’ল ‘আবির্ভাব’। আবির্ভাব জিনিসটা কল্যাণের সঙ্গে, শুভের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ‘আবির্ভাব’ জিনিসটা ঘটে হঠাৎ, তাই মঙ্গলময় কোন কিছুর সঙ্কেত বা

সূচনাকে বলা হয় আবির্ভাব। ঋষি প্রার্থনা করছেন 'আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব ঘটুক।'

যিনি মানুষকে কাঁদান অর্থাৎ রোদন করান তিনি 'রুদ্র'। মানুষ যখন অল্প কাঁদে তাকে বলে 'রোদন' আর যখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সেটা হ'ল 'ক্রন্দন'। তেমনি রয়েছে মৃদু হাসি ও তীব্র হাসি। পরমপুরুষ মানুষকে সুখ দিয়ে বা দুঃখ দিয়ে রোদন করান বলে তাঁকে বলা হয় রুদ্র। সদাশিবের ক্ষেত্রে ঘটে আবির্ভাব কারণ তিনি চিরকল্যাণময় সত্তা।

যেহেতু এই শিবের রয়েছে তিনটি চোখ ও পাঁচটি মুখ তাই তাঁকে বলা হয় 'ত্রিনেত্র' ও 'পঞ্চবক্ত্র’ সবচেয়ে বাঁয়ে তাঁর যে মুখ সেটা বামদেব, আর বাকী চারটি মুখ হ'ল কালাগ্নি, কল্যাণসুন্দরম্, ঈশান ও দক্ষিণেশ্বর। শিবের এই বামদেব রূপটি

বিপথগামী মানুষকে শাস্তি দেয়। দক্ষিণেশ্বর রূপে জীবকে তাড়না করেন বা সতর্ক করে দেন। কালাগ্নি রূপে তিনি জীবের শুভাশুভ কর্মের ফলশ্রুতি তথা তজ্জনিত শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে দেন আর কল্যাণসুন্দরম্ রূপে তিনি জীবের সঙ্গে শুধু স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেন। ঈশান রূপে তিনি মানুষকে মিষ্ট ভাষায় তাঁর দোষ–ত্রুটি দেখিয়ে দেন ও অল্প–স্বল্প দণ্ড বিধানও করেন। ঋষি প্রার্থনা করছেন, "হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণ দিকের যে মুখটি তা–ই দিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর রূপে আমাকে রক্ষা করো।"

পরমপুরুষ মানুষকে সুখ ও দুঃখ দুই দিয়েই কাঁদান। সুখের সময়েও মানুষের চোখের বাইরের প্রান্ত দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে (আনন্দাশ্রু), আবার দুঃখের সময়েও মানুষের চোখের অন্তপ্রান্ত দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে (শোকাশ্রু)। তাই শিব হলেন 'পঞ্চবক্ত্র' ।

(পটনা, ৩০শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–২৯

গোপ কে?

মানুষ সাধারণতঃ বড় স্থূল ভাবেই জপক্রিয়া করে থাকে। বলা যেতে পারে তাদের সেই জপক্রিয়াটা যেন তোতাপাখীর কথা বলার মত। তোতাপাখী মানে না বুঝে কিচির মিচির করে অনেক কিছুই বলে থাকে। তেমনি যাদের অন্তরে ঈশ্বরনিষ্ঠা বা আধ্যাত্মিক ভাব নেই তাদের জপক্রিয়াটা অর্থহীন, ঠিক যেমনটি অর্থহীন তোতাপাখীর কথা বলা। জপক্রিয়ায় যেখানে আধ্যাত্মিক ভাব নেই, যেখানে অভ্যন্তরীণ স্বগত অভিভাবন নেই, সেখানে জপক্রিয়া একান্ত নিরর্থক।

জপক্রিয়ার উদ্দেশ্য হ'ল মনের বহির্মুখী ভাবকে অন্তর্মুখী করা, মনের সমস্ত বৃত্তিকে অবাঞ্ছিত বহির্মুখিনতা থেকে রক্ষা করে তাদের সামূহিক শক্তি ভূমাচৈতন্যের দিকে পরিচালিত করা। যেখানে এই ভূমাচৈতন্যের প্রতি কোন ভালবাসা নেই, যেখানে পরম চিতিশক্তিকে জীবনের চরম ধ্যেয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি সেখানে সমস্ত মানসবৃত্তিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা অর্থহীন কারণ তারা তো পরম চৈতন্যের দিকে পরিচালিত হচ্ছে না।

ধ্যানক্রিয়ার অর্থ হ'ল সমস্ত বাহ্যিক সত্তা থেকে মানস বৃত্তিসমূহকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই প্রত্যাহৃত মানস বৃত্তিগুলিকে এক ও অদ্বিতীয় পরম সত্তার পানে পরিচালিত

করা। যেখানে পরম সত্তার প্রতি কোন আন্তরিক ভাব–ভালবাসা নেই সেখানে পরমপুরুষের প্রতি মন যাবে কী করে? তাই ঈশ্বরপ্রেম না থাকলে ধ্যানক্রিয়াও নিরর্থক হয়ে যায়।

'ধ্যান' শব্দটি আসছে 'ধ্যা' ধাতু থেকে। তাই ধ্যান মানে হ'ল মানস বৃত্তিসমূহকে প্রত্যাহার করে নিয়ে পরমপুরুষের দিকে চালিয়ে দেওয়া। তাই বৃহতের প্রতি অনুরাগ বা আকর্ষণ না থাকলে কারো ধ্যানসিদ্ধি হতে পারে না। পক্ষান্তরে পরমপুরুষের প্রতি যদি কারো অল্প কিছুটাও অনুরক্তি থাকে, খুব বেশী না হোক খুব অল্প পরিমাণও পরানুরক্তি থাকে তাহলেই সে ঈশ্বরকে পেয়ে যায়। তাই সেই সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ–তাঁরা ধর্ম জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোন বা না হোন, তাঁরা ধ্যানক্রিয়া বা জপক্রিয়ায় নিপুণ হোন বা না হোন, তাঁরা যোগ বা অন্যান্য দিব্যগুণে–জ্ঞানে সুদৃঢ় হোন বা না হোন, তাঁদের নাক্ষত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য থাক বা থাক, তাঁদের গুরুভক্তি থাক বা না থাক, তাঁরা জপক্রিয়া বা ধ্যানক্রিয়ার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হোন বা না হোন, কিন্তু তাঁরা যদি পরাভক্তির অধিকারী হোন সেক্ষেত্রে তাঁরা অবশ্যই ধ্যানে ধ্যেয়কে লাভ করবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের সেই ভালবাসাই উন্নীত হয় যে স্তরে তা হচ্ছে: "আমি কোন কিছু পাবার আশায় পরমপুরুষকে ভালবাসি না, আমি পরমপুরুষকে ভালবাসি এই কারণে যে

তাঁকে ভালবেসে আমি আনন্দ পাই"। আর শেষ পর্যন্ত ভক্ত অনুভব করে–'আমি তাঁকে ভালবাসি নিজে আনন্দ পাব এই জন্যে নয়, তাঁকে ভালবাসি কারণ আমার এই ভালবাসায় তিনি আনন্দিত হবেন”। এই যে শেষোক্ত পর্যায়ের ভালবাসা তা সম্পূর্ণভাবে একতরফা (unilateral), তা পারস্পরিক বা রেসিপ্রোক্যাল নয়।

যেখানে পারস্পরিক ভালবাসার ব্যাপার তাকে ভক্তি বলব না, বলব নিছক বৈবসায়িক বিনিময়। অর্থাৎ ফেলো কড়ি মাখো তেল। অর্থাৎ সেই উচ্চতম ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্ত ঈশ্বরকে সব কিছুই দিয়ে দিচ্ছেন, বিনিময়ে কোন কিছু পাবার আশায় নয়। সেক্ষেত্রে ভাবখানা থাকে এই, "আমি তোমায় ভালবাসি আমার স্বার্থের জন্যে নয়, আমি তোমায় ভালবাসি কারণ আমি চাই আমার এই ভালবাসায় তুমি আনন্দ পাও”। কাজেই ভালবাসার শেষ পর্যায়ে এসে ভক্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগে পরমপুরুষের আনন্দ বিধান করা। সংস্কৃত ভাষায় 'গোপ্' ধাতুর অর্থ হ'ল আনন্দ দেওয়া বা আনন্দ পাওয়া আর যে পরমপুরুষকে আনন্দ দেবার জন্যে এই ধরনের ভালবাসার জাগরণ ঘটিয়েছে তাকে বলা হয় 'গোপ'। "গোপায়তে যঃ সঃ গোপঃ” অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন তিনি গোপ।

(পটনা, ৩১শে অগাষ্ট, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩০

ভক্তি

ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়েছে–

**"ভক্তির্ভগবতো সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিঃ ভক্তস্য জীবনম্।।"**

'ভক্তি' বলতে কী বোঝায়? 'ভজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন' প্রত্যয় করে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ভজ' ধাতুর অর্থ হ'ল অন্তরের ভাব–ভালবাসা দিয়ে ঈশ্বরকে আহ্বান করা অর্থাৎ অন্তরের চরম আকুতি বা ঐকান্তিক এষণা দিয়ে তাঁকেই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য মেনে নিয়ে আহ্বান করার নামই ভক্তি। অন্য কথায় বলতে গেলে মানসিক সমস্ত অভিব্যক্তি প্রত্যাহার করে নিয়ে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরক্তি নিয়ে পরমপুরুষের দিকে অনন্য চিত্তে এগিয়ে চলার নামই ভক্তি। 'শাস্ত্র' বলতে ঠিক কী বোঝায়? "শাসনাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ শাস্ত্রঃ পরিকীর্তিতঃ”। যা মানুষের সর্বাত্মক বিমুক্তির জন্যে অনুশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে তাই শাস্ত্র। যদি অভিভাবকেরা সন্তানদের কেবল শাসনের জন্যেই শাসন করেন,

সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যখন তা বুঝে ফেলে তখন তারা পিতা–মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে কিন্তু যদি সেই অভিভাবকের শাসন সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে বলা হয় হিতার্থে শাসন বা অনুশাসন।

'ভগবান' শব্দের তাৎপর্য কী? 'ভগ' শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় করে হয় 'ভগবৎ', প্রথমার একবচনে 'ভগবান'। ভগবান বলব সেই সত্তাকে যে সত্তা নিম্নোক্ত ছয় প্রকার 'ভগ' অর্থাৎ দিব্যশক্তির অধিকারী–ঐশ্বর্য্য, বীর্য বা প্রতাপ, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

ঐশ্বর্য: 'ঐশ্বর্য্য' মানে ঐশী শক্তি বা সিদ্ধি সংস্কৃতে যাকে বিভূতিও বলা হয়। 'বিভূতি' শব্দের দু'টি মানে: ১) ভস্ম, ২) ঐশী শক্তি। এখানে ঐশী শক্তি বলতে আট ধরনের সিদ্ধিকে বোঝায়–যথা অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও অন্তর্যামিত্ব। ইংরেজী ভাষায় ঐশ্বর্য্য বলতে বোঝায় occult power অর্থাৎ যে পাওয়ার বা শক্তি কাল্ট বা আধ্যাত্মিক বিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

বীর্য: যিনি এই বিশেষ 'ভগ' অর্থাৎ বীর্যের অধিকারী হবেন তাঁকে নিজ প্রতাপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যাঁরা ধর্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নন তাঁরা ভগসম্পন্ন সত্তার ভয়ে ভীত–

সন্ত্রস্ত থাকেন আর যাঁরা ধার্মিক তাঁরা এঁর কাছ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়ে থাকেন।

যশ: ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি জিনিস ঘটে থাকে। একদিকে যেমন তাঁর পক্ষে থাকে অজস্র একনিষ্ঠ সমর্থক অন্য দিকে তেমনি থাকে বহুসংখ্যক কট্টর শত্রু। গোটা মানব সমাজটাই স্পষ্টতঃ দু'টি পরস্পর বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে পড়ে–নীতিবান ও দুর্নীতিপরায়ণ। সমাজের সকল মানুষকে কোন–না–কোন শিবিরে যোগদান করতে হয়। অনিবার্যভাবে সমাজে ঘটে মেরুকরণ। এক পক্ষকে যদি বলি উত্তর মেরু, অন্য পক্ষকে বলতে হবে দক্ষিণ মেরু। একদিকে যেমন তিনি অর্জন করেন প্রভূত যশঃ, প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অন্য দিকে তেমনি আসে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা।

ভগবান শিব ও কৃষ্ণের সময়ও এমনটি ঘটেছিল। তৎকালীন সমাজ স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কঠোর নৈতিক বলে বলীয়ান মানুষেরা হয়ে পড়েছিলেন শিবভক্ত, কৃষ্ণভক্ত ও নীতি–ধর্মবিবর্জিত মানুষেরা হয়েছিল শিব ও কৃষ্ণের ঘোর বিরোধী। এ প্রসঙ্গে সর্বদাই মনে রেখো যে সব সময় ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রী: 'শ্রী' শব্দের অর্থ হ'ল আকর্ষণ। 'শ', 'র' ও 'ঈ' এই ত্রয়ীর সমন্বয়েই 'শ্রী'। 'শ' হচ্ছে রজোগুণের দ্যোতক, 'র' কর্মশক্তির দ্যোতক ও 'ঈ' হ'ল স্ত্রীলিঙ্গবাচক। তাই 'শ্রী' মানে যার মধ্যে রজোগুণী শক্তির সঙ্গে কর্মৈষণার সমন্বয় ঘটেছে।

জ্ঞান: 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বা পরাজ্ঞানই সত্যিকারের জ্ঞান পদবাচ্য আর পরাজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বাদ দিয়ে আর যা কিছু জ্ঞান তা আদৌ জ্ঞানপদবাচ্য নয়। তা হ'ল জ্ঞানের অবভাস। বই পড়ে এই আত্মজ্ঞান বা পরাজ্ঞান লাভ হয় না। মানব মনের আশা–আকাঙক্ষা, বৃত্তি–প্রবৃত্তিকে পরমপুরুষে সমাহিত করতে পারলে তবেই আত্মজ্ঞান লব্ধ হয় কারণ পরমপুরুষ হলেন

বৈরাগ্য: 'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থ জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি। সংস্কৃত ভাষায় বিরঞ্জ + ঘঞ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হচ্ছে 'বিরাগ' শব্দটি যার ভাববাচক বিশেষ্য হচ্ছে 'বৈরাগ্য'। 'রজ্‌' ধাতুর অর্থ হ'ল রঙ লাগানো। 'প্রভাতরঞ্জন' মানে যা প্রভাতকে রঞ্জিত করে। এই বিশ্বের প্রতিটি সত্তাই স্পন্দনাত্মক ও তার একটি নিজস্ব রঙও আছে আর প্রতিটি সত্তার এই বিশেষ রঙের জন্যেই অণুমন রঞ্জিত হয়ে পড়ে। তাই মানুষকে কোন বাহ্যিক সত্তার রঙে রঞ্জিত হতে নেই।

বলা হয়ে থাকে "ভক্তির্ভগবতো সেবা”। ভক্তি মানে ভগবানের সেবা করা। এখানে ভগবান মানে যার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত সব কয়টি 'ভগ' বা দৈবী গুণ নিহিত রয়েছে।

"ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী” অর্থাৎ ভক্তি হ'ল বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপ অর্থাৎ পরমপুরুষ ব্যতিরেকে আমি অন্য কোন কিছু চাই না, এমনকি পরমপুরুষ আমাকে অন্য কোন জাগতিক বস্তু দিতে চাইলেও আমি তা নোব না।

"ভক্তিরানন্দরূপা চ"। ভক্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা হ'ল পরমপুরুষের সন্তুষ্টি বিধান করা, তাঁকে আনন্দ দেওয়া। এমনকি নিজের আনন্দলাভের জন্যেও সে পরমপুরুষের সেবা করবে না।

"ভক্তিঃ ভক্তস্য জীবনম্” অর্থাৎ ভক্তি হ'ল ভক্তের জীবন। উক্তিটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না ভক্তও তেমনি ভক্তি ব্যতিরেকে জীবিত থাকতে পারে না। জল থেকে মাছকে তুলে নাও, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে মাছ মারা যাচ্ছে। তেমনি ভক্তের অস্তিত্ব থেকে ভক্তিকে সরিয়ে নাও, দেখবে ভক্তের অস্তিত্ব অচিরে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। তাই বলা হয় ভক্তিই ভক্তের জীবনের সার কথা।

তাহলে মানব জীবনে সব চেয়ে মূল্যবান জিনিস কী? এর উত্তরে বলব– অবশ্যই ভক্তি। এই ভক্তি যে লাভ করেছে সে সব পেয়েছে, তার পাবার আর কিছুই নেই। ভক্তকে কেবল করে যেতে হবে পরমপুরুষের সেবা।

এখন এই সেবার যথার্থ স্বরূপটা কী? পরমপুরুষের সৃষ্ট জগতের সেবা করাই সত্যিকারের সেবা। আমরা বাস্তব জগতে লক্ষ্য করি যখন কোন অভিভাবক দেখেন যে কেউ তাঁদের পুত্র–কন্যার সেবা করছে তখন তাঁরা সেই সেবকের প্রতি সন্তুষ্ট হন। অনুরূপভাবে পরমপুরুষের সৃষ্ট জীবজগতের, বিশেষ করে মানুষের সেবা করাই পরমপুরুষকে সন্তুষ্ট করার সব চেয়ে সহজ উপায়। অতীতে তুমি কী ছিলে, কী করেছিলে সে সব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এই শুভ মূহূর্ত থেকে মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করো। পরমপুরুষ তাতে সন্তুষ্ট হবেন আর পরমপুরুষের সেই সন্তোষেই নিহিত রয়েছে মানব জীবনের পরমা সম্প্রাপ্তির চাবিকাঠি।

(পটনা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩১

সবিতৃ ঋক্

বৈদিক প্রার্থনায় রয়েছে–

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোমামৃতংগময় আবিরাবির্মএধি।”

শ্লোকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হ'ল পরমপুরুষের কাছে প্রার্থনা। তিনি যেন মানুষের মনকে শুভত্বের দিকে, ভূমানন্দের দিকে পরিচলেনা করেন। আসল কথা হ'ল মনকে সৎপথে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হবে। মানুষের চিন্তাভাবনা যদি শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, তাহলে সব কিছুই শুদ্ধ ও পবিত্র হবে। তাই পরমপুরুষের কাছে চাইবার মত একটি জিনিসই আছে আর তা হ'ল–“হে পরমপুরুষ, তুমি আমার মনের সমস্ত কলুষ, সমস্ত কল্মষ দূর করে দাও। আমার মনকে এক শুদ্ধ পবিত্র আধার হিসেবে তৈরী করে দাও।"

তোমাদের এও বলেছি যে মানুষ গায়ত্রী মন্ত্রে এমন জিনিস চাইতে পারত। হ্যাঁ, এই যে বৈদিক মন্ত্র অনেকে ভুল করে গায়ত্রী মন্ত্র বলে থাকে। আসলে এর নাম সবিতৃ ঋক্। ঋগ্বেদ

হ'ল পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র। এই ঋগ্বেদ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর এক একটি ভাগকে বলা হয় 'মণ্ডল', আবার এক একটি মণ্ডল কতকগুলি সূক্তে বিভক্ত, আবার এক একটি সূক্তের মধ্যে রয়েছে কতকগুলি ঋক্। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে ঋগ্বেদের এক একটি শ্লোক হচ্ছে এক একটি ঋক্। আর এই জন্যেই সামগ্রিকভাবে বেদের নাম ঋগ্বেদ।

এই যে বিশেষ বৈদিক মন্ত্রটি যাকে সাধারণ লোকে ভুল করে গায়ত্রী মন্ত্র বলে থাকে এটি হ'ল ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের বাষট্টি সংখ্যক সূক্তের দশম ঋক্। ঋগ্বেদের মোটামুটি রীতি হ'ল পরমপুরুষকে যে শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয় সেই নিয়ন্ত্রক শব্দটিকে ধরে সংশ্লিষ্ট ঋক্’টির নামকরণ করা হয়ে থাকে। এখন আমাদের আলোচ্য বৈদিক ঋক্’টিতে পরমপুরুষকে 'সবিতা' শব্দ সম্বাধন করা হয়েছে। তাই ঋক্’টির নাম 'সবিতৃ ঋক্'।

বেদের রচনাকালে মানুষ লিখতে পড়তে জানত না কারণ তখনো লিপির আবিষ্কার হয়নি। গুরু প্রমুখাৎ মানুষ বৈদিক ঋগুলো শুণে শুণে মুখস্থ করে নিত। সংস্কৃত ভাষায় কাণকে বলা হয় 'শ্রুতি'। তাই বেদের একটি প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়াল 'শ্রুতি'। শিক্ষার্থীরা বা শিষ্যেরা লিপির সঙ্গে পরিচিতি না থাকায় বেদ পাঠ করতে পারতেন না। মজার কথা হচ্ছে এই যে সংস্কৃত ভাষায় নিজস্ব কোন লিপি নেই। বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন স্থানীয় লিপিতে লিখিত হয়ে আসছে। সবিতৃ ঋচিতে বলা হয়েছে–

“ওঁ ভূ-র্ভুবঃ স্বঃ
ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।”

ঋক্’টি একটি বিশেষ ছন্দে রচিত। ছন্দটির নাম গায়ত্রী। বেদের সাতটি স্বীকৃত ছন্দ হচ্ছে গায়ত্রী, উষ্ণিক, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, বৃহতি, জগতি ও পঙক্তি। গায়ত্রী ছন্দে পঙক্তি-সংখ্যা তিনটি। আর প্রতিটি পঙক্তিতে থাকবে আটটি করে মাত্রা। যে ঋষি মন্ত্রটি রচনা করেছিলেন সেই সংশিষ্ট ঋষিকে বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। যে ছন্দে ঋচি রচিত সেই ছন্দটি হ'ল মন্ত্রের মৌলিক মন্ত্র। মন্ত্রের প্রথম পঙক্তিটি পরবর্ত্তীকালে সংযোজনা করা হয়েছে। এটি মূল মন্ত্রের অঙ্গীভূত নয়, অথর্ব বেদ থেকে উদ্ধৃত। ঋক্টির মূখ্য তিনটি পঙক্তি হ'ল–

প্রথম পঙক্তি-তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্।
দ্বিতীয় পঙক্তি-ভর্গোদেবস্য ধীমহি
তৃতীয় পঙক্তি-ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

আগেই বলা হয়েছে প্রতি পঙক্তিতে থাকবে আটটি করে মাত্রা। আলোচ্য শ্লোকটিতে প্রথম পঙক্তিতে রয়েছে সাতটি মাত্রা যা মূল নিয়মের বিরোধী। বৈদিক নিয়মানুযায়ী যেখানে ব্যাকরণ ও ছন্দের মধ্যে অমিল সেখানে ছন্দকে সমর্থন করা হয়–ব্যাকরণকে নয়। তাই ছন্দের খাতিরে উচ্চারণ হবে "তৎ-স- বি–তুর্–ব–রে–ণি–অং”। এই ভাবে শেষের একটি মাত্রা 'ণ্যং'-কে কেটে দু'টি মাত্রায় "ণি–অং” করা হয়।

এখন এই যে সবিতৃ ঋক্, এতে ঋষি কী ধরনের প্রার্থনা করছেন? ঋষি বলছেন–হে পরমপুরুষ, তুমি আমার মনকে আমার চিন্তাকে আনন্দের দিকে পরিচালিত করো। এটিই ভাবার্থ ও প্রার্থনার নির্গলিতার্থ।

মন্ত্রটি শুরু হচ্ছে 'ওঁং' শব্দ দিয়ে। এই 'ওঁং' শব্দের তাৎপর্য কী? যেখানে অভিব্যক্তি রয়েছে, যেখানে কোন কিছু ক্রিয়া রয়েছে, সেখানেই এক পারমার্থিক অভিব্যক্তি। ধর, তুমি হাঁটছ, হাঁটতে গিয়ে খট্ খট্ ধ্বনি হচ্ছে। এই যে খট্ খট্ ধ্বনি এটাও এক ধরনের সেই অতিজাগতিক ধ্বনিরই খণ্ড অভিব্যক্তি। তুমি হাসছ, সেই হাসার সঙ্গে হা....হা ধ্বনি উঠছে। তাই যেখানেই কোন কর্ম বা ক্রিয়ার অভিব্যক্তি রয়েছে সেখানে থাকবে একটা ৰীজাত্মক ধবনি।

পরমপুরুষের যে সৃষ্টিলীলা সেটাও তো একটা ক্রিয়া। আর এই সৃষ্টিটা তিনি করেন মনোজগতে–বহির্জগতে নয়। পরমপুরুষের কাছে বহির্জগৎ বলে কিছু নেই। এই যে পাঞ্চভৌতিক জগৎ এটা জীবের কাছে বাহ্যিক কিন্তু পরমপুরুষের কাছে মানসাভ্যন্তরীণ ব্যাপার (internal phenomenon)। বহুবচনাত্মক Phenomena নয়, একবচনাত্মক Phenomenon কারণ পরমপুরুষের কাছে এটি একটি অখণ্ড ও অবিভাজ্য অভিব্যক্তি।

এই যে সৃষ্টিমূলক ধ্বনি এর ৰীজমন্ত্র হ'ল 'অ'। তাই এই 'অ'–ধ্বনিটিকে তান্ত্রিক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর বলে ধরা হয়েছে। আমরা যাকে ইংরেজীতে 'অ' বলি তার হিব্রু বা গ্রীক পর্যায়বাচক শব্দ হ'ল 'alphá'। এই বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'অ', ৰীজমন্ত্রেরও 'অ' ধ্বনি।

সৃষ্টির পরে আসছে পালন–পোষণের প্রশ্ন। কোন জিনিসের সংরক্ষণের ক্রিয়াগত অভিব্যক্তির ৰীজমন্ত্র 'উ' ধ্বনি। রক্ষণ, পালন ও বর্দ্ধন–এ সবের ৰীজমন্ত্র 'উ' ধ্বনি। মনে মনে কোন কিছু সৃষ্টি করার পর এমন একটা স্তর আসে যখন মানুষ তার সেই মানসিক অভিব্যক্তিকে বা আলেখ্যকে নিজের মনোজগতে প্রত্যাহার করে নেয়। পরমপুরুষ যখন এই বিশ্বের সৃষ্ট

বস্তুসমূহকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নেন সেই সংহার ক্রিয়ার ৰীজমন্ত্র 'ম' ধ্বনিটি।

তাহলে আমরা দেখছি অ, উ, ম এই তিনটি ধ্বনি হচ্ছে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ক্রিয়ার ৰীজমন্ত্র। কাজেই এই যে আমাদের আলোচ্য সবিতৃ ঋক্ সেটা শুরু হচ্ছে 'ওঁং' ধ্বনিটি দিয়ে। স্রষ্টা পরমপুরুষ 'অ'–ধবনির সাহায্যে সৃষ্টি করছেন, 'উ'–ধবনির সাহায্যে সেই সৃষ্ট জগৎকে পালন করছেন, আবার 'ম' ধবনির সাহায্যে স্ব–সৃষ্ট বিশ্বজগৎকে স্বীয় মানস দেহে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ Generator-এর আদ্যক্ষর 'G', পালনকর্তা অর্থাৎ Operator- এর আদ্যক্ষর 'O', সংহারকর্তা অর্থাৎ Destroyer শব্দের আদ্যক্ষর 'D',- তিনে মিলে 'G-O-D' অর্থাৎ God।

এই যে সৃষ্ট্যাত্মক অভিব্যক্তি এটা সপ্তলৌকিক বা সপ্তস্তরীয়। আর বৃহত্তর পরিভূতে বলতে গেলে এই সমস্ত অভিব্যক্তিগুলোকে মূখ্যতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। এক: আধিভৌতিক; দুই: আধিদৈবিক; তিন: আধ্যাত্মিক। সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষ হলেন এই তিনটি জগতেরই সবিতা। এখন তিনি যদি সব কিছুর স্রষ্টা বলে গণ্য হন তাহলে আমাদের এই মানব দেহেরও স্রষ্টা তিনি, সেই সূত্রে মানব মস্তিষ্কেরও স্রষ্টা তিনিই। আর যেহেতু তিনি স্রষ্টা তাই তাঁকে বলব সবিতা। 'সবিতা'

মানে স্রষ্টা (creator), পিতা (father)। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটির পিতা হ'ল সূর্য। আবার আমাদের এই যে গ্রহজগৎ, নক্ষত্র জগৎ ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন উপগ্রহ–এসবেরও স্রষ্টা হলেন সেই এক পরমপুরুষ অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির চক্রনাভি হচ্ছেন পরমপুরুষ।

যে পরম সবিতা বা ভর্গদেব এই সপ্ত লোকাত্মক মহাজগৎ রচনা করেছেন আমরা সেই পরমপুরুষের দিব্যজ্যোতির ধ্যান করি। কেন ধ্যান করি? না, যাতে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে চরম শুভত্বের দিকে, পরম আনন্দের দিকে পরিচালিত করেন। তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে মানুষ সেই পরম সবিতার কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে–'হে পরমপুরুষ, আমার বুদ্ধিকে, আমার মেধাকে চরম আনন্দের পথে পরিচালিত করো যাতে আমি এই বিশ্বে মহৎ কিছু করে যেতে পারি। আর তান্ত্রিক দীক্ষান্তে মানুষ যখন ইষ্ট মন্ত্র পায় তখন সে বিধিমত সাধনা করে যাবে, কোন কিছুর প্রার্থনার দরকার নেই, প্রয়োজন নেই কারণ সে তো তান্ত্রিকী দীক্ষা পেয়েই গেছে।

এই বিশ্বের প্রতিটি সত্তা তাঁরই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। সেই পরম সবিতাই সব কিছুকেই পুনর্বার সৃষ্টি করতে পারেন। স্থাবর–জঙ্গম নির্বিশেষে সবাই তাঁর থেকে এসে আবার তাঁতেই লীন হয়। তাই আমরা কেন পরমসত্তার ধ্যান করব? না,

করব এই জন্যে যাতে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে সৎ পথে, শুভ পথে পরিচালিত করেন।

(পটনা, ২রা সেপ্টেম্বর, '৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩২

চরম লক্ষ্য

এই বিশ্বের যা কিছু অভিব্যক্তি সবই স্পন্দনাত্মক। যা মৌলিক, যা বাস্তব সত্য তাও স্পন্দনধর্মী। কেবল প্রপঞ্চের ক্ষেত্রেই এই কথাটা প্রযোজ্য নয়,চিত্তাণবিক ও অচিত্তাণবিক স্তর সম্বন্ধেও কথাটা সমভাবে প্রযোজ্য। দেহস্থ বিভিন্ন কোষ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই স্পন্দনাত্মক অভিব্যক্তিগুলি প্রাণীন সত্তার সংস্পর্শে আসে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষুর মাধ্যমে চেতন সত্তারা মূল্যবান অভিজ্ঞতা (ocular experience) সঞ্চয় করে অর্থাৎ চাক্ষুষী নাড়ীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

প্রত্যক্ষের জগতে বর্ণ (colour) বা রঙের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণের দ্যোতক, রক্তবর্ণ

রজোগুণের দ্যোতক, কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণের দ্যোতক। সাতটি মুখ্য নিয়ন্ত্রক বর্ণ রয়েছে। আর সাতটি রঙের মিলনে ও মিশ্রণে অসংখ্য মিশ্রবর্ণের উদ্ভূতি ঘটে কিন্তু তা অনন্ত নয়। যদি এই বর্ণসমষ্টি অনন্ত হত তা হলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও স্বাভাবিকভাবে অনন্ত হত। কিন্তু বাস্তবিক এই প্রকাশমান বিশ্ব বিশাল হলেও অনন্ত নয়। আবার বলতে পারি প্রকৃতির কলানৈপুণ্যের সাহায্য নিয়ে সেই ভূমা সত্তা অজস্র স্পন্দন উৎসারণ করে চলেছেন। এই জন্যে বলা হয় পরমপুরুষ নিজে অবর্ণ সত্তা হলেও তাঁর সৃষ্ট জগৎ বহু বর্ণাত্মক। বস্তুতঃ আমাদের এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তার অজস্র বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে প্রাণী জগৎকে আকর্ষণ করে চলেছেন।

শ্বেত কোন বর্ণ নয়, সর্ব বর্ণের সমাহার হ'ল শ্বেত। ঠিক তেমনি কৃষ্ণ কোন বর্ণ নয়। যেখানে বর্ণহীনতা বা বর্ণাভাব সেখানেই কৃষ্ণবর্ণ।

ক্রিয়াশীল প্রকৃতির অজস্র অভিব্যক্তির সাহায্য নিয়ে এক মূলীভূতা সত্তা 'এক'–ই থেকে যান কিন্তু এই জাগতিক বস্তুসমূহ অনেক। পারমার্থিক জগৎ একক সত্তার দ্বারা বিধৃত, বস্তুজগৎ সংখ্যাগত ভাবে অগণিত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, কেন তিনি এই বর্ণময় বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, কেনই বা এত বর্ণবৈচিত্র্য রচনা

করলেন! কেনই বা তিনি এই ধরনের বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন?

"বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি”। এখন এই যে বর্ণময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন, এই সৃষ্টির পেছনে যে মূল উদ্দেশ্য নিহিত তা একমাত্র তিনিই জানেন। অন্য কেউ তা জানতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যাঁরা তাঁর একেবারে কাছের লোক... আপন জন, যাঁরা তাঁর একান্ত ভালবাসার ও স্নেহের পাত্র তাঁরা অবশ্যই সেই গুপ্ত রহস্য জানেন। জ্ঞানীরা তা জানেন না, জানেন কেবল ভক্তেরা। একমাত্র ভক্তেরাই তাঁর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে আসেন আর গোপনে তাঁর সমস্ত গোপন তত্ত্ব জেনে নেন। কোন সাধক যদি বিশ্বের যাবতীয় উৎসারণের মূল বিন্দুতে পৌঁছে যান তাহলে তিনি জানতে পারবেন এই সব কিছুর প্রারম্ভিক বিন্দু হচ্ছেন পরমপুরুষ। আর যারা যে তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছে সেই তরঙ্গ-রাজিও উৎসারিত হয়ে আসছে সেই পরমপুরুষ থেকে। আবার একথাটাও সে জানতে পারে যে বিশ্বের যাবতীয় তরঙ্গের অন্তিম বিন্দু হচ্ছে পরমপুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভিক বিন্দুও তিনিই আর যাত্রপথের অন্তিম বিন্দুও সেই পরমপুরুষই। আর বিশ্বে যে পুরুষ সর্বজীবের গতিপথের প্রারম্ভ বিন্দু তথা পরম ধাম তাঁর প্রতি আমার একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন আমার

বুদ্ধিকে মহৎ কল্যাণের সঙ্গে, শুভত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। জীব মাত্রেরই এটাই প্রার্থনা হওয়া উচিত।

(পটনা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৩

"একো হি রুদ্রঃ..."

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়
তস্থূর্য ইমাঁল্লোকানীশত ইশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্ঠতি সংচুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।।"

এখানে প্রশ্ন ওঠে, এই যে চরম সত্তা বা পরমপুরুষ ইনি কি এক না অনেক? নিয়ন্ত্ সত্তা এক না অনেক, এটা অবশ্যই একটা জটিল প্রশ্ন। ঋষি বললেন, চরম নিয়ন্ত্র সত্তা অবশ্যই এক ও অদ্বিতীয়–তাতে বহুত্বের কোন অবকাশই নেই। অর্থাৎ সেই পরম সত্তা সর্ব কালেই এক ও অদ্বিতীয় রূপেই বিরাজমান। তাই অতীতে তিনি যেমন ছিলেন ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবেন।

এর আগেও তোমাদের বলেছি যে, 'রুদ্র' শব্দের যথার্থ অর্থ হ'ল যে সত্তা জীবকে রোদন করান। এই প্রসঙ্গে এও বলেছি যে রোদন করানো মানেই শোকাশ্রু বিসর্জন করানো নয়। মানুষ যখন দুঃখে ব্যথায় বেদনায় আতুর হয়ে কাঁদে তখন ক্রন্দনকারীর চোখের ভিতরের প্রান্ত দিয়ে (নাসিকার পার্শ্ব দিয়ে) অশ্রু ঝরে পড়ে, আর মানুষ যখন অত্যন্ত আনন্দবিহ্বল হয়ে কাঁদে তখন তার চোখের বাইরের প্রান্ত দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। শোকাহত মানুষের যে অশ্রুবিসর্জন তাকে বলে শোকাশ্রু আর আনন্দাপ্লুত মানুষের যে অশ্রু বিসর্জন তাকে বলে আনন্দাশ্রু। তাই মানুষ যে ব্যথা-বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করে সেটাও যেমন পরমপুরুষের জন্যে, আনন্দের আবেশে আবিষ্ট হয়ে মানুষ যখন চোখের জল ফেলে সেটাও তেমনি পরমপুরুষের জন্যেই। তাই তাঁকে সঙ্গত ভাবেই 'রুদ্র' বলা হয়ে থাকে।

এই ব্যক্ত জগতে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে, নানান দুর্বিপাকে পড়ে মানুষ অশ্রুবিসর্জন করে। এই যে গুণান্বিত জগৎ এ তো পরমপুরুষেরই সৃষ্টি। তাই তিনি 'রুদ্র'। এখন যদি একাধিক রুদ্র থাকতেন তাহলে এই বিশ্বের ধারাবাহিকতা বা সমরূপত্ব (uniformity) থাকতো না। তা রুদ্র এক, একাধিক নন। এই

জন্যে শ্লোকটিতে বলা হয়েছে "ন দ্বিতীয়ায় তস্থূর্য”– তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

এই যে 'রুদ্র' বা পরম সত্তা ইনি বিশ্বের 'ঈশ' বা নিয়ন্তাও। সংস্কৃতে 'ঈশ্' ধাতুর অর্থ হ'ল নিয়ন্ত্রণ করা। আর এই পরম সত্তা তাঁর ভূমা প্রকৃতির সাহায্যে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই জন্যে 'আনন্দসূত্রম্'–য়ে বলা হয়েছে, "শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ”। এই শক্তি হ'ল পরমপুরুষের প্রাকৃত শক্তি। 'চিতিশক্তি' প্রাকৃত শক্তির অধীন নয়, কিন্তু প্রাকৃত শক্তি 'চিতিশক্তি'র অধীনা। চিতিশক্তি ব্যতিরেকে প্রাকৃত শক্তি থাকতে পারে না কিন্তু প্রাকৃতশক্তি ব্যতিরেকে চিতিশক্তির অস্তিত্ব সম্ভব। এই যে পরম চিতিশক্তি ইনি তাঁর অজস্র প্রাকৃত শক্তির সহায়তায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

এই পরম সত্তা থেকে বিশ্বের সব কিছুর উদ্ধৃতি। তাঁরই কৃপায় এই বিশ্বের সব কিছু তাঁতেই স্থিত ও যথাকালে একদিন তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ একাধারে স্রষ্টা–পাতা–প্রহর্ত্তা তিনিই। বস্তুতঃ এই বিশ্ব কস্মিনকালেও পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। অর্থাৎ এই বিশ্বের এককালে তাপগত মৃত্যু কখনও হবে না। তবে হ্যাঁ, এই বিশ্বের কোন একটি ক্ষুদ্রাংশের তাপগত মৃত্যু কয়েক বারই হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু তা হবে বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সীমিত ক্ষেত্রে। সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের তাপগত

মৃত্যু কখনো হবে না। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের বিনাশ হবার আগেই মানুষ জাতির বংশধররা এই পৃথিবী গ্রহ ত্যাগ করে সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে বা অন্য কোন সৌরজগতের অপর কোন গ্রহে পাড়ি দেবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন বিশ্বের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের সামগ্রিক বিনাশ যদি ঘটেও থাকে, তবু পরমপুরুষ তো থাকেন। তার মানে এই বিশ্বের কেউই সেখানে ওই অবস্থাতেও একক অসহায় নয়। পরমপুরুষ সর্বদাই তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে যুক্ত রয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁর এই যে পূর্ণ যোগ একেই দার্শনিক ভাষায় বলা হয় 'প্রোতঃ' যোগ। তেমনি পরমপুরুষ যখন সৃষ্টির এক একটি সত্তার সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে যুক্ত থাকেন, ব্যষ্টি সত্তার সঙ্গে তাঁর এই যে সংযোগ তাকে বলা হয় পরমপুরুষের 'ওতঃ' যোগ। তাহলে দেখছি পরমপুরুষ এই বিশ্বের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে সংযুক্ত থাকেন অর্থাৎ বিশ্বের সঙ্গে রয়েছে তাঁর ওতঃ যোগ ও প্রোতঃ যোগ। তাই আনন্দসুত্রম্-য়ে বলা হয়েছে "ওতপ্রোতযোগাভ্যাম্ সংযুক্তঃ পুরুষোত্তমঃ”।

"প্রত্যজ্ঞনাংস্তিষ্ঠতি সংচুকোপান্তকালে” অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিনাশের অবস্থাতেও পরমপুরুষ সকলের সঙ্গে থাকেন। তাই জীবের কোন অবস্থাতেই ভয়ের কিছু নেই।

"সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপঃ"। এই বিশ্ব সৃষ্টির পর পরমপুরুষ কী করলেন, না, তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই। তাই তাঁকে পেতে গেলে তাঁর সৃষ্টির মাঝেই তাঁকে খোঁজ করতে হবে। এছাড়া অন্য পথ নেই। আর তাঁর খোঁজ করতে গেলে মানুষকে বিশেষ প্রয়াস করতে হবে। আর তাঁকে খোঁজবার যে বিশেষ পন্থা বা প্রয়াস তারই নাম 'সাধনা'। বস্তুজগতের সঙ্গে পরাগতির সঙ্কলনের মাধ্যমে তাঁর খোঁজ করতে হবে। জীবমাত্রেরই এটাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

(পটনা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর '৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৪

দেবাদিদেব মহাদেব

"এষ হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্বা পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্টতি বিশ্বতোমুখঃ।।"

ইনিই হলেন সেই পরমতত্ত্ব, সেই মহাদেব যিনি বিশ্বের সকদিকেই কাজ করে চলেছেন। বেদে বলা হয়েছে–

**"দ্যোততে ক্রীড়তে যস্মাদুদ্যতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্বদেবতৈঃ।।"**

বিশ্বের চরম কেন্দ্রবিন্দু থেকে যে সকল স্পান্দনিক অভিব্যক্তি উৎসারিত হয়ে চলেছে তারা সবাই 'দেবতা'। আবার দেবতারাও বিশ্বের চক্রনাভিকে 'দেব' সম্বোধনে অভিহিত করেন। তিনিই তাঁর নিজ শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত করে তোলেন, বিশ্বকে তাণ্ডব নৃত্যের দোলায় দোলায়িত করে তোলেন তাঁর ঐশী শক্তিবলে ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সব কিছুকেই নিজের মধ্যে সংহরণ করে নেন। এই হ'ল 'দেব' শব্দের ব্যাখ্যা। আর বিশ্বের চক্রনাভি থেকে উৎসারিত এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৈবরশ্মি এদের বলা হয় দেবতা। এই দেব হলেন দেবতাদের দেবতা.... দেবানাম্ অপি দেব ইত্যর্থে মহাদেবঃ।

**"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং
দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।"**

এখানে ঈশ্বর মানে কন্ট্রোলার। কোন দেশে, শুধু দেশেই বা বলি কেন, এমনকি কোন সুদূর গ্রামেও অজস্র মালিক থাকতে পারে–যেমন ভাণ্ডারের মালিক, অস্ত্রশস্ত্রের মালিক, কৃষিজ পণ্যের

মালিক ইত্যাদি ইত্যাদি। মোগল আমলে দিল্লীর সম্রাটদের বলা হত দিল্লীশ্বর অর্থাৎ তারা ছিলেন দিল্লীর ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা অনেক সময় ভুলে যেতেন, হয়তো বুঝতে পারতেন না যে দিল্লীশ্বর ও জগদীশ্বরের মাঝখানে আদৌ কোন পার্থক্যের সীমারেখা আছে কি না। তাঁরা কখনও কখনও ভেবে বসতেন যে তাঁরাই বুঝি জগদীশ্বর বা বিশ্ব- বিধাতা। কিন্তু এই যে ছোট-বড় মালিক বা নিয়ন্তা বা ঈশ্বর এদের সবার ঊর্ধ্বে রয়েছেন মহেশ্বর-ঈশ্বরের ঈশ্বর সকলের ভাগ্যনিয়ন্তা।

এর আগেই বলেছি, পরমপুরুষ হলেন পরম দেবতা- ' পরমঞ্চ দৈবতম্' অর্থাৎ সকল দেবতাদেরও যিনি অধিপতি। "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।" সংস্কৃত 'পতি' প্রাকৃতে হয়ে যায় 'অই'। উদাহরণস্বরূপ, 'দেশপতি' প্রাকৃতে হয়ে যায় 'দেশঅই'; তা থেকে 'দেশাই'। তেমনি 'দলপতি' থেকে 'দলঅই', তা থেকে 'দলই' বা 'দলুই'। 'ভগিনীপতি' থেকে 'বহনি অই', তা থেকে 'বহনই' বা 'বোনাই'। তাই হে পরমপুরুষ, তুমি হলে সকল মালিকের সেরা মালিক- তুমি সকল রাজার রাজা।

যেখানে কোন কাজ সংঘটিত হয় সেখানে তার পেছনে থেকে যায় একটা কর্তৃভাব ও একটা কর্মভাব। যেখানে এই গোটা বিশ্বটা হ'ল কর্মভাব সেখানে ভূমামন হ'ল কর্তৃভাব।

যেখানে ভূমামন কর্মভাব, ভূমাচৈতন্য সেখানে কর্তৃভাব। যখন কোন কিছু দেখছ তখন তোমার চোখগুলো হ'ল কর্তৃভাব আর সেই দৃষ্ট বস্তুটি হ'ল কর্মভাব। যখন তোমার চোখগুলো কর্মভাব তখন তোমার মনটা হ'ল কর্তৃভাব অর্থাৎ পরের ধাপে তোমার মনটা হচ্ছে কর্তৃভাব। তার পরের ধাপে তোমার মন যখন কর্মভাব তখন আত্মা কর্তৃভাব। তারও পরের ধাপে তোমার আত্মা হ'ল কর্মভাব আর পরমাত্মা হলেন কর্তৃভাব। তাই শেষ পর্যন্ত পরমপুরুষই হলেন জীবের চরম তথা পরম কর্তৃভাব। তিনিই হলেন 'পরাৎপর' অর্থাৎ সকল পর সত্তার পর। কর্মভাবকে বলা হয় 'পর'। তাই তিনি হলেন একাধারে 'পরেশ' ও 'অপরেশ'।

"বিদাং দেবং ভুবনেশমীড্যম্”। তিনি হলেন দেব। তাঁর বিশাল ভূমাদেহ থেকে জ্যোতিরেখা.... অজস্র স্পন্দনরেখা উৎসারিত হয়ে চলেছে। মানুষকে সাধনার দ্বারা তাঁকেই জানতে হবে, তাঁকেই উপলব্ধি করতে হবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তিনিই আদরণীয়, একমাত্র তিনিই বরণীয়, স্তবনীয়। তিনিই হলেন সেই পরম দেব। কোন নির্দিষ্ট তারঙ্গিক অভিব্যক্তির এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মানব অনুভূতির গোচরীভূত হয়। তাই সে বলে ওঠে, "তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশো ২সি মহেশ্বর"।

তিনি রাজার রাজা–সম্রাট (ইংরেজীতে Emperor)। তিনি হলেন চরম তথা পরম কর্তৃভাব, সকল খণ্ড কর্তৃভাবের নিয়ন্তা এক অখণ্ড কর্তৃভাব। যদি কাউকে তোমাকে জানতেই হয় তবে কেবল তাঁকেই জানতে হবে। এখন প্রশ্ন করতে পার, মানুষ যদি পরমপুরুষের কর্মভাব হয় তাহলে মানুষ কী করে সেই পরম সত্তার কর্তৃভাব হতে পারে? তুমি যখন তাঁর ধ্যান কর তাঁকে ধ্যানের ধ্যেয় করে নাও। বস্তুতঃ তিনি তো সকল জীবের কর্তৃভাব, তাঁকে আবার জীবের কর্মভাবদেবাদিদেব মহাদেব করা যায় কী করে! হ্যাঁ, এটা একটা জটিল প্রশ্ন বৈ কি! তবে এর উত্তরটা খুবই সহজ সরল। কেউ যখন তাঁর ধ্যান করছে, তার মনে তিনি কারো কর্মভাব হয়ে যাচ্ছেন না। কেবল সেই ধ্যানের সময়টুকুর জন্যে মানুষটা ভাববে যে চৈতন্য সত্তা তাকে দেখছেন, তিনি তাকে তাঁর কর্মভাব রূপে দেখছেন।

এইমাত্র বললুম যে সেই পরম দেব দশ দিকে কাজ করে চলেছেন। দিকের সংখ্যা মোট দশটি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই হ'ল চারটি মুখ্য দিক। আমরা ইংরেজীতে খবরকে বলি NEWS. N-E-W-S অর্থাৎ যা আমরা উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এই চার দিক থেকে আহরণ করে থাকি। এই চারটি মুখ্য দিক ছাড়াও রয়েছে আরো ছ'টি দিক–ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ্বঃ ও অধঃ। প্রথম চারটি মুখ্য দিক অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম,

উত্তর, দক্ষিণ–এরা হ'ল প্রদিশ আর ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ্বঃ ও অধঃ–এই ছ'টি দিককে বলব অনুদিশ। প্রদিশ ও অনুদিশ মিলে হ'ল দশ দিক। পরমপুরুষ এই দশ দিকেই সমভাবে বিরাজমান, কোন দিককেই তিনি উপেক্ষা বা অবহেলা করেন না। কোন সত্তা এই দশ দিকের যে কোনটিতেই আশ্রয় নিক না কেন, পরমপুরুষ তাঁকে ঠিকই দেখে চলেছেন।

কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ করে, অন্তরীক্ষে বা সমুদ্রমধ্যে বা পর্বত গুহায় লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে তাতে সে সফল হবে না, কারণ পরমপুরুষ সেখানেও রয়েছেন। 'পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ'।

আবার এই পরম দেবতাই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীটাণুকীটেও অভিব্যক্ত। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীবগুলিও তাঁর কর্মভাব, আর তাদের ওপর তাঁর বৈয়ষ্টিক প্রতিফলনকে বলব এক একটি জীবাত্মা। তিনি যখন এই জীবাত্মাদের সাক্ষিত্বে রয়েছেন তখন তিনি হলেন প্রত্যগাত্মা। 'পূর্বো হ জাতঃ'–তিনি আগে যেমনটি করেছিলেন, বর্তমানেও তেমনটিই করে চলেছেন ও ভবিষ্যতেও তেমনটিই করবেন।

এই বিশ্বে যা কিছু রয়েছে, এ যাবৎ যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে, যা কিছু সৃষ্ট হচ্ছে, ভবিষ্যতেও যা কিছু সৃষ্ট হবে, এসবই হচ্ছে সেই পরমপুরুষ। এই বহুধা– রূপায়িত বিশ্বচরাচর সেই একক সত্তারই অজস্র প্রকাশ। বর্তমানে যা কিছু রয়েছে তা' সবই বিশ্বপিতার প্রতিচ্ছায়া। তেমনি অতীতেও যা কিছু ছিল, সেও ছিল তাঁর প্রতিচ্ছায়া। আবার ভবিষ্যতের গর্ভে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে তাও সবই সেই একই ভূমা সত্তার প্রতিচ্ছায়া।

'প্রত্যঙ্জনাংস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ'। তিনি হলেন সহস্রমুখ। অর্থাৎ তুমি যেদিকেই তাকাও না কেন বা যে কোণ থেকেই তাঁকে দেখবার চেষ্টা কর না কেন, তুমি তাঁর মুখটা দেখতে পাবে। তুমি কিছুতেই তাঁর দৃষ্টিকে এড়াতে পারবে না। তোমার জৈবিক অস্তিত্বটা তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে না, তিনি যে সর্বতোমুখী।

আবার এই পরমপুরুষই হলেন সহস্রশীর্ষ অর্থাৎ অজস্র মস্তক তাঁর। মানুষের আছে কেবল একটিই মস্তিষ্ক আর তার ভেতরে রয়েছে অতি অল্পসংখ্যক স্নায়ুকোষ যাদের শক্তি অত্যন্ত সীমিত। আর সেই যে পরম সত্তা তিনি স্বরূপতঃ অসীম অনন্ত, তাঁর রয়েছে অনন্তসংখ্যক মস্তিষ্ক আর শক্তিও তাঁর অনন্ত।

(পটনা, ৫ই সেপ্টেম্বর, ৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৫

প্রণব–মাহাত্ম্য

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে
পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতদ্।।"

এখানে প্রণব–মহিমা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। যা সাধককে তাঁর ভূমা লক্ষ্যের দিকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যমণির দিকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে তা–ই প্রণব।

'সর্বে বেদাঃ' মানে সকল বেদই। এখানে 'সর্ব' মানে কী? সর্বঃ–সর্বৌ–সর্বে। 'সর্ব' মানে সব কিছু। 'সর্ব' শব্দে রয়েছে তিনটি অক্ষর–স, র, ব। 'স' হ'ল সত্ত্বগুণের ৰীজমন্ত্র। 'স' এক্ষেত্রে শব্দের আদিতে কেন? পরম চৈতন্য থেকে যখন সৃষ্টির ধারাবাহিকতা প্রথম শুরু হয় তখন সেই অভিব্যক্তির আদিতে থাকে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য। তাই 'সর্ব' শব্দের আদ্যক্ষর 'স'।

এর পর আসছে 'র' অক্ষরটি। যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে বা হচ্ছে তাতে চলমানতা থাকতেই হবে। সেখানে থাকবে গতি ও সেই সঙ্গে দ্রুতিও। এই যে গতি ও তার দ্রুতি এটা এসে থাকে এনার্জি বা শক্তি থেকে। এই শক্তি ব্যতিরেকে গতি থাকতেই পারে না। 'র' ধ্বনিটি হ'ল এই এনার্জির বীজমন্ত্র। তাই 'সর্ব' শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর হ'ল 'র'।

আর 'ব' হ'ল তৃতীয় বা শেষ অক্ষর। 'ব' হ'ল বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবধর্মের ৰীজমন্ত্র। বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্ট জীবের রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বভাবধর্ম। নিজস্ব স্বভাবধর্ম নেই এমন সত্তা বা জীব জগতে নেই।

এই পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সবই আসছে ভূমাচৈতন্যের সত্ত্বগুণী প্রকৃতি থেকে। তাই সৃষ্টির প্রাথমিকতাতে রয়েছে 'স'। আর তার পরেই আসছে চলমানতা যা এনার্জির সাহায্যে সংসাধিত হয়ে থাকে। তাই রয়েছে 'র'। আর সব কিছুর রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। তাই রয়েছে 'ব'। স, র, ব–সৃষ্ট জগতের প্রতিটি সত্তাতেই বিদ্যমান এই তিনটি গুণ আর তাই 'সর্ব' মানেই সব কিছু। 'স–র–ব' এই তিনের বাইরে কোন কিছু থাকার জো নেই।

ঋগ্বেদের 'ঋক্' মানে স্তুতি। 'বেদ' মানে জ্ঞান। 'সর্বে বেদাঃ' মানে যাবতীয় জ্ঞান। এখানে জ্ঞান বলতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বোঝাচ্ছে, মানসাতীত জ্ঞানকে বোঝাচ্ছে। মানসিক বা ভৌতিক জ্ঞান জ্ঞান পদবাচ্য নয় কারণ স্থান–কাল– পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান পাল্টে যায়। তারা পারমার্থিক সত্তা নয়। এক সময় বার্লিন জার্মানীর রাজধানী ছিল কিন্তু এখন? না, বার্লিন এখন আর জার্মানীর রাজধানী নয়–জার্মানীর রাজধানী এখন বন* (Bonn)। দু'টোই ঠিক, তবে দু'য়ের মাঝখানে ঘটে গেছে একটা কালগত ব্যবচ্ছেদ.... সময়ের ব্যবধান।

লক্ষ্য পূর্তির জন্যে যে দুঃখ–কষ্ট স্বীকার, যে ক্লেশ–বিপত্তি বরণ তাকেই বলে তপঃ। একে তপস্যাও বলা হয়। যে সব মুনি–ঋষি, যে সব আধ্যাত্মিক সাধক পরম তত্ত্বকে লাভ করবার জন্যে কঠোর তপশ্চর্যা অবলম্বন করেন তাঁরা তা করেন কী জন্যে? না, সেই পরম পদ প্রাপ্তির জন্যে।

'ইচ্ছন্তঃ' মানে যাঁরা পরম তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যাঁরা পরম পদে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে অভিলাষ পোষণ করেন তাঁরা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধকেরা যাঁরা ভৌতিক জগতে বাস করেও পরমপুরুষকে তাঁদের মৌলিক আত্মতত্ত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সেদিন তোমাদের বলেছিলুম যে পরমপুরুষ হলেন চরম জ্ঞাতৃসত্তা, বাকী সবাই তাঁর মানস বিষয়। তিনি কোন অণুজীবের মানস বিষয় হতে পারেন না। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটাই সঙ্গত। কিন্তু সাধারণতঃ ধ্যানাভ্যাসকালে সাধক করে কী? তিনি তোমার মানস বিষয় হতে পারেন না কারণ তিনি তোমার কর্তৃভাব। বরং বলব তিনিই সব কিছু। তিনি তোমার কর্তৃভাব, তুমি হলে তাঁর কর্মভাব। কিন্তু যখন তুমি ধ্যানে বসে তাঁর কথা ভাবছ তখন তোমার মানস ভাবের মধ্যে তিনি এসে যাচ্ছেন। এটা অসম্ভব যে তিনি কারো কর্মভাবে স্থিত রয়েছেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে করবে কী?– না, ধ্যানাভ্যাসকালে ও ইষ্টমন্ত্রের জপ করবার সময় মনে মনে ভাববে তিনি তোমাকে দেখে চলেছেন? এটাই সাধনার গোপন সংকেত।

'ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'। 'ব্রহ্মচর্য' জিনিসটা কী? সংস্কৃত ভাষায় চলার জন্যে অনেকগুলো ধাতু আছে। যেমন একটা হ'ল 'চল্' ধাতু; চলছে নড়ছে এর জন্যে সাধারণতঃ একটা ক্রিয়ারূপ হচ্ছে 'চলতি'। আর একটি হ'ল 'চরতি'–খেতে খেতে চলার জন্যে 'চরতি'। চলছে, সেই সঙ্গে খাচ্ছেও, যেমন গোরু। এখন যদি পথ দিয়ে চলতে চলতে কেউ বাদাম খেতে খেতে চলে তবে তাকেও বলব 'চরছে'। কিছু লোকে বাদামকে বলে চীনিয়া বাদাম, হিন্দীতে বলে 'মুফলী'।

(*প্রবচন চলাকালে বন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী ছিল)

এরপর আসছে 'অটতি'। 'অটতি' মানেও চলছে কিন্তু অটতি মানে সেই ধরনের চলা যাতে মানুষ শিখতে শিখতে চলছে। চরতি/চলতি–এই রকম সাধারণ গতানুগতিক চলা নয়।

এর পর আসছে 'ব্রজতি' যার মানে আনন্দ পেতে পেতে চলা। তাই পরমপুরুষের দিকে যে চলা সেটা 'ব্রজতি'। চলার জন্যে কত ধাতুরূপ রয়েছে।

ব্রহ্মচর্যং: ব্রহ্মণি বিচরণম্ ইতি ব্রহ্মচর্যং অর্থাৎ ব্রহ্মময় জগতে যে সর্বদা বিচরণ তা–ই ব্রহ্মচর্য। সেটা কী রকম? না, মানুষ সর্বদাই তার ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক আভোগ আহরণ করে ব্রাহ্মী জগৎ থেকে। তাই যে মানুষ মধুবিদ্যা বা গুরুমন্ত্রের সাহায্যে ব্রাহ্মী জগতে বিচরণ করছে সে ব্রহ্মচারী। সে একথাটা সর্বদাই স্মরণে রাখে যে ব্রহ্মময় জগৎই তার বিচরণভূমি।

ঋষি বলছেন, "সেই পরম পদ লাভ করো, সেই পরম পদের চরমতম সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হও। আমি বলছি 'ওং' হচ্ছে সেই

প্রণব"। এই 'ওং এতে রয়েছে তিনটি ধ্বনি–অ–উ–ম। তোমরা জান, আর্য–ভারতীয় লিপিমালায় রয়েছে পঞ্চাশটি বর্ণ–১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই বর্ণমালার এক একটি ধ্বনি কে একটি ব্রাহ্মী অভিব্যক্তির ৰীজমন্ত্র। তাই মোট ৫০টি নিয়ন্ত্রক ৰীজমন্ত্র রয়েছে আর সেগুলি থেকে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে জটিল ধরনের বহুসংখ্যক ৰীজমন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। এই যে নিয়ন্ত্রক ধ্বনি একেই বলে প্রণব।

ঋষি বলছেন, এই যে তিনটি মুখ্য নিয়ন্ত্রণক ধ্বনি এরা হচ্ছে অ, উ, ম। 'অ' হ'ল সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র। তাই আর্য–ভারতীয় লিপিমালায় 'অ' হচ্ছে আদ্যক্ষর।

এই বিশ্বের প্রতিটি স্পন্দনের বর্ণ আছে। সেই বর্ণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হতেও পারে নাও পারে। আবার সেই বর্ণের একটা শব্দও আছে। সেই শব্দ মানুষ শুণতে পেতেও পারে নাও পারে, কিন্তু শব্দ অবশ্যই আছে। আমাদের শ্রবণী শক্তির পরিধির মধ্যে সেই শব্দ আসতেও পারে, নাও পারে। আমরা সেই শব্দ কাণে শুণতেও পারি, নাও পারি কিন্তু শব্দ একটা আছেই। কাজেই প্রতিটি কর্ম ও অভিব্যক্তিয় জন্যে একটা শব্দ থাকবেই আর তাই সৃষ্টির আদি ধ্বনি হ'ল 'অ'। তাহলে যদি প্রশ্ন ওঠে 'অ'–কে কেন বর্ণমালার প্রথম বর্ণ করা হ'ল, 'আ'–কে করা হ'ল না কেন? তার উত্তরে বলব 'অ' ধ্বনিটা হচ্ছে সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র।

রোমান লিপিরও প্রথম অক্ষর 'অ' যার উচ্চারণ 'আলফা', 'আলেফ'। এর কারণ 'অ' হচ্ছে সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র।

কোন কিছু সৃষ্টির পরেই তার পালনের প্রশ্ন আসে, তার আদর–যত্ন, ভরণ- পোষণের প্রশ্ন আসে। তাকে প্রয়োজনীয় আভোগ সরবরাহ করতে হবে। 'উ' ধ্বনি হ'ল সেই পালনৰীজ।

যখন তোমরা মনের মধ্যে কিছু তৈরী কর তখন সেটাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখ, তারপর সেটাকে নিজের মনের মধ্যে সংহরণ করে নাও, নিজের মনেতেই প্রত্যাহার করে নাও। অনুরূপভাবে পরমপুরুষ মনের মধ্যে কিছু তৈরী করে নিয়ে পরে মনেতেই তা প্রত্যাহার করে নেন। 'ম' হ'ল এই প্রত্যাহার ক্রিয়ার ৰীজমন্ত্র। এই যে প্রত্যাহার–ক্রিয়া–মরণশীল মানুষের কাছে এটাই হ'ল মৃত্যু কিন্তু পরমপুরুষের কাছে এটা একটা সাধারণ প্রত্যাহার পদ্ধতি মাত্র। এই প্রত্যাহার পদ্ধতির ৰীজমন্ত্র হ'ল 'ম' আর এই জন্যে 'ম' ধ্বনিকে ব্যঞ্জন বর্ণমালার একেবারে শেষে রাখা হয়েছে। এইভাবে অ, উ, ম থেকে 'ওং'। সেদিন তোমাদের বলেছিলুম 'অ' হ'ল সৃষ্টি–ক্রিয়ার ৰীজ, 'উ' হ'ল পালন ক্রিয়া ৰীজ, আর 'ম' হ'ল সংহার ক্রিয়ার ৰীজ। পরমপুরুষ হচ্ছেন এই তিনের সমাহার। তিনি হলেন GOD, 'G' অর্থে generator অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, ০ অর্থে operator অর্থাৎ পালনকর্তা, D অর্থে destructor অর্থাৎ সংহারকর্তা।

(পটনা, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৬

সাধনায় ক্রমোন্নতি

তন্ত্রশাস্ত্রে আছে–

"সর্বে চ পশবঃ সন্তি তলবৎ ভূতলে নরাঃ।
তেষাং জ্ঞানপ্রকাশায় বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ।
বীরভাবং সদা প্রাপ্য ক্রমেণ দেবতা ভবেৎ।।"

তন্ত্রের পরিভাষায় জন্মসূত্রে বিশ্বের প্রতিটি জীব এক একটি পশু–ভাবাত্মক প্রাণী। কিন্তু কালক্রমে জীবের সেই পশুভাবকে দেবভাবে.... দেবত্বে উন্নীত করতে হয়। প্রাথমিক স্তরে যে মানুষটার আচার–আচরণ পশুবৎ, উন্নত জীবনচর্যা ও সাধনার মধ্য দিয়ে তাকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করতে হবে, তারপর সেই মানুষটাকে আরও সাধনা ও প্রয়াসের দ্বারা দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত

করতে হবে। পশুত্ব থেকে দেবত্বে এই যে ক্রমোন্নয়ন এটা যে পদ্ধতির দ্বারা সংসাধিত হয় তারই নাম 'সাধনা'।

একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে:–

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।।"

বলা হচ্ছে, জন্মগতভাবে সবাই শূদ্র। এখানে 'শূদ্র' মানে যার মধ্যে পশুবৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মানুষ যখন প্রাথমিক দীক্ষা অর্থাৎ বৈদিকী দীক্ষা লাভ করে তখন সে শিখে নেয় কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়, উন্নত জীব হিসেবে কীভাবে মানস অভিব্যক্তিকে বাহ্যিক রূপ দিতে হয়। সেই অবস্থায় মানুষকে বলা হয় 'দ্বিজ'। 'দ্বিজ' শব্দটির ভাবারূঢ়ার্থ হ'ল যার দু'বার জন্ম হয়েছে। তারপর যথাযথ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সম্যক্ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পর সে হয় বিপ্র ও শেষ ধাপে তান্ত্রিকী দীক্ষা অর্থাৎ মানসাধ্যাত্মিক সাধনার সাহায্যে ব্রহ্মোপলব্ধির পর হয় ব্রাহ্মণ।

এখানে প্রশ্ন হ'ল: এই যে পশুভাবযুক্ত মানুষ, এই যে অবনতমানস জীব এদের কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? নিশ্চয়ই আছে, কেননা পরমপুরুষ সকলের সঙ্গেই সমভাবে বিরাজমান,

আর তাই মনুষ্যদেহধারী পশুস্বভাবের জীবেতেও তিনি বিদ্যমান। শাস্ত্রের ভাষায় এই যে পশুস্বভাবযুক্ত জীবেরা, এদের উপস্য দেবতা, এদের ধ্যানের ধ্যেয় হলেন সেই একই পরমপুরুষ। তাই তারা তাঁকে সম্বোধন করে 'পশুপতি' হিসেবে। এই অবস্থায় সাধক পরমপুরুষকে তাদের অন্তরের আকুতি জানিয়ে বলে, "হে পরমপুরুষ, হে প্রভু, আমরা তো পশুস্বভাবযুক্ত জীবমাত্র, তুমি আমাদের দেবতা, তুমি হলে 'পশুপতি'। তাই পরমপুরুষের একটি নাম 'পশুপতি'। আধ্যাত্মিক বিচারে প্রসুপ্ত মানবতার জন্যে পরমপুরুষ হলেন 'পশুপতি'।

"তেষাং জ্ঞানপ্রকাশায় বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ"। পরবর্তী ধাপে মানুষ যখন অনুভব করে, বুঝতে শেখে তার কী করণীয় আর কী অকরণীয়, জীবনে কীই বা চর্য্য আর কীই বা অচর্য্য, জীবনের চরম লক্ষ্যই বা কী, তখন তারা বীরভাব প্রাপ্ত হয়। সব রকম প্রতিকূলতা, সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই হ'ল বীরভাবের সাধনা। যারা তেমনটি করে যেতে পারে তাদের অবশ্যই 'বীর' আখ্যা দিতে হবে বৈ কি! মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠার স্তরে এসে সাধকের মধ্যে যখন এই বীরভাব জেগে ওঠে সে তখন মনুষ্যত্ব-বিরোধী তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্যত হয়, সে তখন নেতৃত্বের শিরোপা লাভ করে। তন্ত্রে এই স্তরের সাধকদের বলা হয় 'বীর'। আর তাদের উপাস্য দেবতাকে বলা হয় 'বীরেশ্বর'।

এখন থেকে আর 'পশুপতি' বলা যাবে না। তাই পরমপুরুষের অপর নাম 'বীরেশ্বর'।

তৃতীয় স্তরে সাধক যখন পুরোপুরি বীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন সে আর সংগ্রামে ভীত বা পর্যুদস্ত হচ্ছে না তখন ধরে নেওয়া হয় যে সে দিব্যভাবে উন্নীত হয়েছে (এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এখানে সাধক বলতে নারী–পুরুষ উভয়কেই বোঝাচ্ছে) অর্থাৎ এখন থেকে তাকে 'বীর' না বলে বলতে হবে 'দেব'। "ক্রমেণ দেবতা ভবেৎ"–সে তখন মনুষ্য–আধারে দেবতা। আর এই দিব্যাচারী সাধকদের আরাধ্য দেবতা হলেন 'মহাদেব'– বীরেশ্বর নন।

তাহলে দেখলুম, সাধনার প্রথম ধাপে জীবের উপাস্য দেবতা হলেন 'পশুপতি', দ্বিতীয় ধাপে 'বীরেশ্বর' আর তৃতীয় তথা শেষ ধাপে 'মহাদেব'। সাধকের মানসাধ্যাত্মিক স্তর অনুযায়ী তার উপাস্য দেবতা নির্ধারিত হয়।

সাধারণতঃ তিন ভাবে আমরা মানুষের অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি– (১) মানুষ মনে মনে চিন্তা করে, ২) মুখে কথা বলে ৩) হাতে পায়ে কাজ করে। চিন্তা করবার সময় মানুষ কাজে লাগায় মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোকে, কথা বলার সময় ঠোঁট দু'টো কাজে আসে, আর কাজ করতে গিয়ে প্রায় গোটা শরীরটাই

ব্যবহার করতে হয়। মনুষ্যদেহধারী পশুস্বভাবের মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি তারা মনে মনে ভাবে এক (সাধারণতঃ এদের চিন্তা–ভাবনা স্থূল বা জড়াত্মক) , মুখ দিয়ে বলে আর এক ধরনের, আর কাজ করে আর এক ধরনের অর্থাৎ তাদের চিন্তায়, বাচনিকতায়, কর্মে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও আধারটা মানবিক কিন্তু অভিব্যক্তিতে পশুতুল্য। আজকের মনুষ্যসমাজে এদেরই সংখ্যাধিক্য (majority)। আমি চাই আমাদের মানুষের সমাজে যথার্থ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটুক, এই ধরনের নরপশুদের নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বীরভাবের সাধকদের চিন্তা–ভাবনা অবশ্যই সূক্ষ্মতর, আর তাদের কথায় কাজে একটা মিল থাকে। তবুও তারা যেমনটি ভাবে কথায় ও কাজে ঠিক তেমনটি মেলে না যদিও কথা ও কাজে মিল থাকে। অর্থাৎ তারা মুখে যা বলে কাজেও তা করে। বীরভাবের সাধকেরা সমাজে সম্মান পান, নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান, কেউ কেউ আবার মহাপুরুষ হিসেবেও গণ্য হন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অল্প একটু খুঁত থেকে যাচ্ছে কারণ তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে সব সময় মিল থাকে না যদিও বচনে ও কর্মে মিল থাকে। শেষ ধাপে মানুষ যখন দেবতায় উন্নীত হয় তখন সে যেমনটি মনে ভাবে তেমনটি মুখেও বলে, আর যা মুখে বলে তা সে কাজেও করে। অর্থাৎ তাদের চিন্তায়, বাচনিকতায় ও কর্মে কোন অসঙ্গতি থাকে না।

তাই এটি মানবাস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ ধাপ। আমাদের প্রত্যেকেরই এমনটি হওয়া উচিত।

এই যে মানুষ পশুভাব থেকে ক্রমোন্নতির সোপান বেয়ে ধাপে ধাপে দেবভাবে উন্নীত হচ্ছে, ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে যাচ্ছে–মানুষের সমাজে এঁদের যত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে ততই মঙ্গল। তোমরা এই যে মহৎ কর্ম, সাধনা ও ত্যাগের পথ ধরে এগিয়ে চলার ব্রত নিয়েছ, তাতে সমাজে এই ধরনের দেব– মানবের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে।

(পটনা, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৭

পরম তত্ত্ব প্রতীকীকরণের বাইরে

আধ্যাত্মিক মার্গ হচ্ছে মানবমনের প্রতীকীকরণ সামর্থ্যের বাইরে। অর্থাৎ পরমপুরুষ হলেন অবাঙ্ মনসোগোচর..... অবর্ণনীয়, মানুষের মন তাঁকে ধরতে ছুঁতে পারে না। মানব মনের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতি তা কখনো দেহের আজ্ঞানাড়ী

ব্যক্ত করতে পারেনা। কাজেই মানসাতীত সত্তার অস্তিত্ব অনুধাবন করা তথা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যক্ত করার পক্ষে আমাদের মন একান্ত অপারগ ও অপূর্ণ মাধ্যম।

এমনকি প্রতি মুহূর্তে মানুষের মানস অনুভূতির যে পরিবর্তন লীলা ঘটে চলেছে মানুষের আজ্ঞানাড়ী তা ঠিক ঠিক ব্যক্তীকরণ করতে পারে না। মানব দেহের বাগিন্দ্রিয় বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই মনের সমস্ত অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। একটু সামান্য কষ্ট পেলে বলি 'উঃ', আবার খুব বড় রকমের কষ্ট পেলেও বলি 'উঃ'। এই যে কষ্টসূচক প্রথম 'উঃ' ও দ্বিতীয় 'উঃ', এই দুই 'উঃ'–এর মধ্যেকার পার্থক্যটা যে বিশাল তাও বোঝানো ৰড়ই দুরুহ ব্যাপার। এই দুই উঃ একই ধরনের ব্যথা বা যন্ত্রণাকে সূচিত করেনা।

এখন আমাদের মন আর সংজ্ঞানাড়ী ও আজ্ঞানাড়ীগুলো যখন মানসিক অনুভূতিকেই ঠিক ঠিক ব্যক্ত করতে পারছে না বা পারলেও আংশিক ভাবে পারছে তখন সেই বৃহত্তম সত্তা পরমপুরুষকে মন কী ভাবে ব্যক্ত করতে বা প্রতীকীকরণ করতে পারবে? সে এক অসম্ভব ব্যাপার। তবুও তো আমরা সেই মানসাতীত সত্তাকে একটা যা হোক নাম দিই, বলি 'পরমপুরুষ'। এই 'পরমপুরুষ' শব্দটাও তো একটা প্রতীকীকরণ।

এই ধরনের অসম্পূর্ণ প্রতীকীকরণের অর্থ হ'ল এই যে, যখন আমরা এটাই বলতে চাই, “হে পরমপুরুষ, তোমাকে আমরা ওই নামেই ডাকছি কারণ এছাড়া আমরা আর কোন উপায়ে তোমাকে প্রতীকীকরণ করতে পারছিনা"। কাজেই তাঁকে জানতে গেলে তোমাকে তোমার আপেক্ষিক অস্তিত্বের বাইরে যেতে হবে ও তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। আর সেটাই হবে মানব জীবনে যাবতীয় সাধনার চরম উৎকর্ষ।

(পটনা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৮

'গুরুকৃপা হি কেবলম'

বলা হয়ে থাকে, “গুরুকৃপা হি কেবলম্”। আবার বলা হয়েছে, "ব্রহ্মৈব গুরুরেকঃ নাপরঃ” (আনন্দসূত্রম)। তোমরা জান, 'গুরু' শব্দটিতে রয়েছে দু'টি ধ্বনি–'গু' ও 'রু'। 'গু' ধ্বনির অর্থ হ'ল অন্ধকার–অধ্যাত্মজীবনে অন্ধকার, মানসাধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অজ্ঞানান্ধকার। আর 'রু' ধ্বনির অর্থ হ'ল 'বিদূরক' অর্থাৎ যিনি দূর করেন। তাহলে 'গুরু' শব্দের সামগ্রিক ভাবে অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এই, যিনি মানুষের মানসিক ও

আধ্যাত্মিক জগতের যাবতীয়, অজ্ঞতার, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেন।

এই বিচারে কেবলমাত্র তারকব্রহ্মাই গুরু পদবাচ্য, তিনি ছাড়া আর কেউ জীবের গুরু হতে পারেন না।

নির্গুণ ব্রহ্ম হলেন নির্বিষয় সত্তা, এই পাঞ্চভৌতিক জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। তাই নির্গুণ ব্রহ্মের যে ধরনের দার্শনিক অবস্থিতি তাতে তিনি জীবের গুরু হতে পারেন না। আবার যেহেতু সগুণ ব্রহ্ম দার্শনিক বিচারে কিছুটা সংস্কারৰদ্ধ তাই তিনিও জীবের গুরু পদবাচ্য নন।

গুরু হবার সামর্থ্য কেবল তাঁরই রয়েছে যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ কিন্তু প্রপঞ্চ জগতের সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্রও রয়েছে। অন্য কেউ গুরু হতে পারেন না, অন্য কেউ জীবের মানসাধ্যাত্মিক অজ্ঞানতা দূর করতে পারেন না। তাই "গুরুকৃপা হি কেবলম্”-এর অর্থই হ'ল "ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্”।

'কৃপা' কাকে বলে? সংস্কৃত ভাষায় মূল ধাতুটা হ'ল 'কৃপ্' যার মানে কাউকে প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করা- দোষ-গুণ বা যোগ্যতা বিচার না করে তাকে সাহায্য করা।

যদি কারো পূর্ণত্বের পথে এগিয়ে চলার পর্যাপ্ত শক্তি- সামর্থ্য থাকে তাহলে তারকব্রহ্মের সাহায্য না পেলেও তার চলবে, কিন্তু যদি কারো সেই ধরনের শক্তি–সামর্থ্য না থাকে, আর তাকে সাহায্য করা হয় সেটা হবে কৃপা।

এখন তোমরা বলতে পার, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু তোমরা দেখছ, অনুভব করছ সব কিছুই তো পরমপুরুষের সৃষ্টি। নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর তো সবাইকেই সাহায্য করা উচিত, সকলকেই কৃপা করা উচিত। ব্যষ্টিবিশেষকে তিনি কেন কৃপা করবেন! আমি ইতোপূর্বে তোমাদের কয়েকবারই বলেছি, কাউকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, তা করতে গেলে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। তাই বেছে বেছে ব্যষ্টিবিশেষকে কৃপা করলে চলবে না। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতে হবে। পরমপুরুষ যদি কাউকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ এসে যাবে।

এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে দার্শনিক বিচারে পরমপুরুষই সব কিছুর স্রষ্টা। তাই তিনি সবার ও সব কিছুই তাঁর। কিন্তু যাঁরা পরমপুরুষের গোঁড়া একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁরা তাঁদের বৈয়ষ্টিক জীবনে অত সব দার্শনিক তত্ত্বকথা মেনে চলেন না। তাঁদের বক্তব্য হ'ল–হ্যাঁ, দর্শনে বলা আছে হয়তো নানান

নীতি- নিয়ম, যুক্তি-তর্ক ও দার্শনিকতা, সবই ঠিক কিন্তু ব্যষ্টিগতভাবে আমি অতশত দার্শনিক বিধিবিধানের পথে চলতে রাজী নই। আমি চলব আমার বৈয়ষ্টিক উপলব্ধির পথ ধরে। এখন প্রশ্ন হ'ল, ওই ধরনের পরম একনিষ্ঠ ভক্তের উপলব্ধিটা কী? সে ভাবে, পরমপুরুষ আমারই-তাঁর ওপর আর কারো অধিকার নেই। তার মানে, পরমপুরুষ আমার একেবারেই আপন বৈয়ষ্টিক সম্পত্তি আর আমি এই ধরনের আমার একান্ত আপনার সম্পদকে অন্য কোন দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই না।

যখন সাধকের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি এই ধরনের এক প্রবল ভাবানুভূতি জেগে যায় তখন তার মধ্যে নিশ্চয় একটা সাবলীল মানসিকতারও উৎপত্তি হয়। এই ঋজু মানসিকতা দিয়ে সেই দুর্বল দীনহীন মানুষটি পরমপুরুষকে আকর্ষণ করে আর পরমপুরুষও সেই সাধককে উপেক্ষা করতে পারেন না। দার্শনিক তত্ত্বকথার চেয়ে এই যে ভক্তিসঞ্জাত আকর্ষণ এর শক্তি হাজার গুণ বেশী। যদি পরমপুরুষ সাধকের এই প্রবল ভাবাবেগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় দোষ দেওয়া যায় না।

দোষ হ'ল তোমার নিজের আর তোমার অহঙ্কার-রূপী ছাতাটার। সেজন্যেই তুমি তাঁর অশেষ করুণাধারা থেকে বঞ্চিত

থেকে যাও। এর জন্যে পরমপুরুষ দোষী নন। মূল কথা হ'ল, তোমার মাথার ওপর থেকে ওই অহঙ্কার–রূপী ছাতাটা সরিয়ে দাও, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাঁর বিশ্বপ্লাবী করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে যাচ্ছ।

তাই আমরা দেখছি, একমাত্র তারকব্রহ্মই জীবের গুরু হতে পারেন–অন্য কেউ নয়।

(পটনা, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৩৯

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব

আমার মনে হয়, প্রপত্তি সম্পর্কে আমার কিছু বলা দরকার। বোধ হয়, সেটা আমার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব ও কর্তব্যও। সংস্কৃতে প্র–পত্ + ক্তিন প্রত্যয় করে 'প্রপত্তি' শব্দটি নিষ্পন্ন। প্রপত্তির পেছনে মূল ভাবটা, মূল তাৎপর্যটা হচ্ছে এই যে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটে চলেছে সবই পরমপুরুষের ইচ্ছার অভিপ্রকাশ। তার আদেশ (order) বিনা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগীরণও হবে না, এমনকি একটা ঘাসের

পাতাও নড়বে না। তাই পরমপুরুষ আগে থেকেই যেমনটি বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, যেমনটি পরিকল্পনা করে রেখেছেন ঠিক তেমনটিই ঘটে চলেছে।

মানুষ কিছুই করতে পারে না, কোন জীবিত প্রাণীই কিছু করতে পারে না পরমপুরুষের সমর্থন না থাকলে। অর্থাৎ যখন মানুষের ইচ্ছা পরমপুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়, কেবল তখনই মানুষের ইচ্ছা ফলপ্রসূ হয়, নইলে মানুষের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। যখন জীবের বাসনা আর কৃষ্ণের ইচ্ছা এক হয়, তখনই সে ইচ্ছায় ফল ফলে, নচেৎ তা নির্ঘাত ব্যর্থ হয়। 'প্রপত্তি' শব্দের এইটাই মর্মার্থ, এইটাই প্রকৃত ভাবনির্যাস।

ভক্তিবাদ তত্ত্বটা পুরোপুরি এই প্রপত্তির ওপরেই আধারিত। **জ্ঞানবাদ জিনিসটা প্রপত্তিকে সমর্থন করে না,** ভক্তিবাদ কিন্তু ষোল আনা এই প্রপত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ হয়তো প্রপত্তিবাদের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। জ্ঞানী হয়তো বলতে পারেন, যদি সব কিছু পরমপুরুষের ইচ্ছায় বা সংকল্পেই হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের বৈয়ষ্টিক প্রচেষ্টার দরকারই বা কী? জ্ঞানী হয়তো ভাবতে পারেন–ভক্তের পক্ষে এটা একটা দুরুহ প্রশ্ন, ভক্ত ৰোধ হয় এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু জান তো, যদিও জ্ঞানমার্গীরা ভেবে থাকেন যে তাঁরা সবচেয়ে জ্ঞানী বা অতি

বুদ্ধিমান আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, ভক্তরাই জ্ঞানমার্গীদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। আর যে মানুষটা ভাবে যে সে জ্ঞানী, আমি তো বলব, সে–ই হ'ল সবচেয়ে মূর্খ।

আমি আগেই বলেছি, একজন তথাকথিত জ্ঞানী একটা অতি সামান্য তৃণখণ্ডকেও নাড়াতে পারবে না কিন্তু যে মানুষটা ভক্ত, যে ভগবানের সঙ্গে নিৰিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলে সে তা পারবে। এখানেই ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। আসল ব্যাপারটা হ'ল এই যে মানুষের যোগ্যতা, মানুষের শক্তি–সামর্থ্য, কর্মনৈপুণ্য প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের নিজের বলে কিছুই নেই। তার যা কিছু সবই সে পেয়ে থাকে পরমপুরুষের কাছ থেকে।

দেখ না, মানুষ যদি একনাগাড়ে মাত্র তিন/চার দিন না খেয়ে থাকে অথবা ধর তিন/চার/পাঁচ বছর ধরে–তাহলে তার ভৌতিক অস্তিত্বটার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তার নড়ন–চড়নও ৰন্ধ হয়ে যাবে.... কথা বলবার শক্তিও রহিত হয়ে যাবে। তাহলেই বোঝ, মানুষের নিজের বলে আছেটা কী! ভক্ত জানে, তার যা কিছু সবই ভগবানের; এমনকি সে নিজেও তো পরমপুরুষেরই সম্পত্তি। তাই ভক্তের প্রথম কথাই হ'ল– মানুষ নিজের চেষ্টায় কিছুই করতে পারে না।

জাগতিক জ্ঞান, বৈষয়িক বুদ্ধি, তথাকথিত মানবীয় বিদ্যা–বুদ্ধি–জ্ঞানগরিমা– এসবের বাস্তব মূল্য কতটুকু। এ ধরনের জ্ঞানকে বলে প্রাপ্ত বাক্য অর্থাৎ যে জ্ঞানটা বিভিন্ন পার্থিব মানুষের মাধ্যমে, জাগতিক সত্তার অভিব্যক্তির মাধ্যমে এসে থাকে।

পুরোনো ভূগোলের বইয়ে দেখে থাকবে, এককালে উত্তর প্রদেশের রাজধানী ছিল এলাহাবাদ। পরবর্তী কালের ছাপানো বইয়ে দেখবে, ওই একই উত্তর প্রদেশের রাজধানীর নাম লক্ষ্ণৌ লেখা আছে। ভবিষ্যতে আরও অন্য কিছু দেখতে পাবে। প্রাপ্ত বাক্যের এই তো অবস্থা। প্রাপ্ত বাক্য হ'ল আপেক্ষিক জিনিস তাই তা পরিবর্তন–সাপেক্ষ। তাই ভক্ত সব কিছু চেলে নেয়, খাঁটি জিনিসকে বাজিয়ে নেয়। আর জ্ঞানীরা করে কী? না, তাদের পুঁথিগত বিদ্যার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে অযথা ঝগড়াঝাঁটি করে–হামেশাই।

যে খাঁটি ভক্ত তার কাছে কেবল আপ্তবাক্যেরই মূল্য আছে। পরমপুরুষের কাছ থেকে স্বতঃ উৎসারিত যে জ্ঞান সেটাই আপ্তবাক্য। ভক্ত পরমপুরুষের সঙ্গে নিৰিড় ভালবাসার সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। এই ভক্তির বলে সে পরমপুরুষের ইচ্ছাকে শুণতে, জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সেইটাই তার কাছে আপ্তবাক্য। তোমরা ভক্ত মানুষ, তাই শুধু

আপ্তবাক্যকেই মেনে চলবে। মনে রেখো, তোমাদের পালনীয় ষোড়শ বিধি তোমাদের পক্ষে আপ্তবাক্য।

প্রপত্তিই হচ্ছে তোমাদের জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি। আর প্রপত্তির মূল বক্তব্য হ'ল–পরমপুরুষের ইচ্ছাই সব কিছু, যা কিছু ঘটবে সবই তাঁর ইচ্ছা; তাঁর বিনা অনুমতিতে একটা ঘাসের পাতাও নড়তে পারেনা। পরমপুরুষের কৃপায়, তাঁরই করুণায় আপ্তবাক্যের নির্দেশনা পেয়েছ; সেই শিক্ষা, সেই নীতিকথাকে কঠোর ভাবে মেনে চলা তোমার মহৎ কর্তব্য। মনে রেখো, তথাকথিত জ্ঞানীর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

(পটনা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪০

ভূমামানসের সর্বজ্ঞত্ব

আজ ভূমামানসের সর্বজ্ঞত্ব নিয়ে কিছু বলব। ভূমামানস সর্বজ্ঞ, অণুমানস কিন্তু তা নয়। কেন নয়? অণুমানস সর্বজ্ঞ হতে পারে না কারণ কোন ভৌতিক ও মানসিক বিষয়ের ওপর তার প্রতিফলন–সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু ভূমামানসের ক্ষেত্রে

হয় কী? –না, সব কিছুই তার মানস পরিধির ভেতরে। এর জন্যে কোন কিছু জানবার ব্যাপারে কোন বিশেষ প্রয়াসের তার দরকারই পড়ে না। কেননা, সব কিছুই তো তার ভেতরে রয়েছে, সব কিছুই তার ভূমাচৈত্তিক অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত। অণুমন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে জানতে পারে কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যতের সকল সময়ের জন্যে জানতে পারে না।

বলা হয়েছে, "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্"। অণুমন যখন বিশেষ প্রয়াসের দ্বারা নিজেকে ভূমামনে পর্যবসিত করতে চায়, তখন তার মধ্যে এই সর্বজ্ঞত্বলাভের বাসনা জেগে ওঠে। অণুমনের সেই পর্যায়টা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম"।

জীবের কী করুণ অবস্থা ভেবে দেখ তো! তোমরা অনেকেই জান না, আজ থেকে মাত্র এই এক শ' বছর আগে তোমাদের কার জীবনে কী ঘটেছিল। তোমরা অনেকেই জান না, এই দু'শ বছর আগে তোমাদের কার কী রকম সামাজিক মর্যাদা ছিল, অথচ এটা তো ঠিক যে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সামাজিক পরিচিতি বলে একটা কিছু ছিলই। একশ বছর আগে প্রত্যেকেরই ভাগ্যে কিছু–না কিছু তো অবশ্যই

ঘটেছিল, কিন্তু আজ তা বেমালুম ভুলে গেছ। ভূমামন কিন্তু তা সবই জানেন। হ্যাঁ, আবার তুমি যখন ভূমা মনের একেবারে কাছটিতে এসে যাবে তখন অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যতের সব কিছু জেনে ফেলবে। এখন এই যে এক শ' অথবা দু'শ বছর আগেকার ঘটনাগুলো বেমলুম ভুলে যাওয়া বা না জানা–এতে কিন্তু তোমার মর্যাদা বা গৌরব বাড়ল কি! জিনিসটা মোটেই গৌরবের হ'ল না। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পার। পরমপুরুষের খুবই সান্নিধ্যে, একান্ত কাছটিতে এসে যেতে পার, তাঁর সঙ্গে গভীর প্রেম–প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে পার আর সেইটাই হচ্ছে কার্যসিদ্ধির গোপনতম রহস্য। লোকে বলবে, "দেখো, অতটুকু ছোট্ট ছেলে, ও কত জানে"! বস্তুতঃ ছোট্ট ছেলেটা জানে না কিছুই। কিন্তু যেহেতু সে পরমপুরুষের সঙ্গে স্নেহ–ভালবাসার সম্পর্ক পাতাতে পেরেছে, তাই সে সব কিছু জেনে ফেলেছে।

এখন, এই যে ভূমামন সব কিছু জেনে যাচ্ছে এর পেছনে রহস্যটা হ'ল এই যে সব কিছুই তো তাঁর অনন্ত সংরচনার মধ্যেই, মানসপরিধির অভ্যন্তরেই রয়েছে। সব কিছুই তো তাঁর ভেতরে, তার বাইরে তো কিছুই নেই। সবই তো তাঁর মানসাভ্যন্তরীণ প্রক্ষেপ মাত্র। তাই তিনি সব কিছু জেনে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও জেনে যাবেন। কিন্তু ব্যষ্টি সত্তার পক্ষে, অণুমানসের পক্ষে সবই তো বাহ্যিক। এখানেই জীবের অপূর্ণতা।

আর সাধকের সাধনা জিনিসটা কী? –না, সাধনা হ'ল এই জৈবী অপূর্ণতা থেকে ভূমার পূর্ণতার দিকে অনবচ্ছিন্ন চলমানতা।

বলা হয়ে থাকে যে এই বিশ্বের সব কিছু ভূমামানসের ভেতরকার জিনিস, আর এই বিশ্বসৃষ্টি হ'ল ভূমামানসের কল্পনাধারা। তাই তাঁর কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দরকার পড়ে না, কোন কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দরকার পড়ে না। সব কিছুই তাঁর মনের ভেতরকার ব্যাপার। কিন্তু অণুমনের পক্ষে সবই বাইরেকার জিনিস। তাই অভিব্যক্তির জন্যে অণুমনের পক্ষে কর্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন পড়ে। আর জ্ঞান আহরণের জন্যে, প্রত্যক্ষ বোধের জন্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দরকার পড়ে। কিন্তু যেহেতু পরমপুরুষের পক্ষে কোন কর্মেন্দ্রিয়, কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা সংজ্ঞানাড়ী বা আজ্ঞানাড়ীর দরকার পড়ে না, তাই তিনি অসীম অনন্ত। তিনি হলেন অ- শরীরী (non-corporeal) সত্তা।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের অভিন্ন বিন্দু বা স্পর্শক বিন্দু (tangential point) যখন পাঞ্চভৌতিক শরীরের সংস্পর্শে আসে, আমরা বলে থাকি, তারকব্রহ্মের আবির্ভাব হ'ল। সেক্ষেত্রেও সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র (neucleus) তো থেকেই যায়। তাই

তিনিও কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও সর্বজ্ঞ হতে পারেন। এইটাই রহস্য। পরমপুরুষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম।”

“অপাণিপাদো”। ‘পাণি’ মানে হাত। তিনি অপাণি অর্থাৎ হাত ব্যতিরেকেই সব কিছু করে থাকেন। তোমরা জান, এক পৌরাণিক দেবীর নাম হচ্ছে বীণাপাণি। পরমপুরুষের কোন হাত না থাকলেও তিনি সব কিছুকেই স্পর্শ করতে পারেন। তিনি অপাদ–ও। 'পাদ' মানে পা। তাঁর পা নেই, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। একই সময়ে তিনি পটনাতেও আছেন, মোকামাতেও আছেন, আবার সমস্তিপুরেও আছেন, আবার অন্যান্য গ্রহ–নক্ষত্রেও আছেন।

'জবনো গ্রহীতা'। তিনি হাত–পায়ের সাহায্য না নিয়েও ঘোরাফেরা করেন। তিনি হলেন স্বচক্রে ঘূর্ণায়মান সত্তা। যে বস্তু বা সত্তা কেবল নিজের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে, অন্যের চারপাশে নয়, তাকে ইংরেজীতে বলে circumrotarian |

"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"। তোমরা জান, তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করে চল, তার জন্যে কোন চাক্ষুষী নাড়ীর প্রয়োজন পড়ে না। এজন্যে তোমার বাহ্য দৃষ্টির অতিরিক্ত দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। তুমি সব কিছু এমনিতেই দেখে নাও। অনুরূপ ভাবে তিনি কাণের সাহায্য ছাড়াই মনের ভাষাও শুণে নেন। কেবল যে বাইরের শব্দই শোণেন তা-ই নয়, সকল সত্তার মর্মের অন্তঃস্তলের ধ্বনিও শুণে নেন। মানব মনের যাবতীয় আকুতি-এষণার কথাও শুণে নেন।

"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুর্যং পুরুষং মহান্তম।।"

যা কিছু জ্ঞাতব্য তিনিই সব জানেন। বিশ্বচরাচরে যা কিছু জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় পড়ে, তা সবই তিনি জানেন। কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। তাঁকে জানতে গেলে ভূমাসমুদ্রে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।

(পটনা, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন-৪১

পরমপুরুষের স্বগতোক্তি

পরমপুরুষের স্বগতোক্তিটি কী? –না, সেই স্বগতোক্তি হচ্ছে:

"ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং জাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।"

সব কিছু আমার থেকে উদ্ভুত হয়েছে, সব কিছু আমাতেই স্থিত রয়েছে, সব কিছু আমাতেই লীন হচ্ছে।

'ময্যেব সকলং জাতং'। সব কিছু আমার থেকে সৃষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর মনের মধ্যেই কিছু সৃষ্ট হোক, তাঁর মনের ভেতরেই একটা ভাবজগৎ তৈরী হোক, অর্থাৎ তিন তাঁর মানস কল্পনায় একটা বিশ্বসৃষ্টি রচনা করুন। আর তার ফলেই তৈরী হ'ল এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব।

পরমপুরুষ এমনটাই চেয়েছিলেন। কেন চেয়েছিলেন দার্শনিকরা সে সম্পর্কে কোন যুক্তি খুঁজে পান না।

এখন প্রশ্ন হ'ল, কেন তিনি মনে মনে এমনটা ভাবলেন যে তিনি জগৎ সৃষ্টি করবেন? এখন, কেন পরমপুরুষ সৃষ্টি রচনা করলেন, তার সেই উদ্দেশ্য, সেই এষণা তিনি ছাড়া আর কে

জানতে পারে? যাই হোক, তিনি সৃষ্টি রচনা করলেন। এখন দার্শনিকরা জানেন না পরমপুরুষের মনে এই ধরনের ভাবনার উদয় হ'ল কেন?

এই দিন কয়েক আগে তোমাদের একবার বলেছিলুম, দার্শনিকরা যেখানে বিফল হন, ভক্তরা সেখানে সফল হন। এক্ষেত্রে দার্শনিকরা অন্যকে সৃষ্টি রহস্যের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে একান্ত অপারগ। শুধু তাই নয় এমনকি নিজেরাও নিজেদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। কিন্তু ভক্তরা ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কারণ, পরমপুরুষের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্তলে একটা সুগভীর অভ্যন্তরীণ ভালবাসা রয়েছে, এক অজানা গোপন প্রেম প্রীতি রয়েছে। তারা বলে সৃষ্টি রচনার হেতুটা কী আমরা বিলক্ষণ জানি। আমাদের পরম প্রভু, পরমপুরুষ ছিলেন সম্পূর্ণ একলা। দেখনা, একটা বাড়ীতে তোমাকে যদি সম্পূর্ণ একলা থাকতে হয়, তুমি পাগল হয়ে যাবে। এখন, কাউকে যদি অনন্তকাল বিশ্বে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকতে হয় তাহলে ভাব তো তার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে।

"স বা এষ তদা দ্রষ্টা ন পশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্ ।
মে নে সন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্।।"

পরমপুরুষ একলাই ছিলেন। তাঁর দেখবার, শুণবার, আঘ্রাণ নেবার, কথা বলবার, সব কিছু করবার শক্তি–সামর্থ্য ছিল কিন্তু বিশ্বে দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই যে ছিল না। কার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন? কাকেই বা ভালবাসবেন? কাকেই বা বকাঝকা করবেন? বলবেন, "খোকা, তুমি এমনটা করলে কেন? তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত নয় কি? তোমার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।” কিন্তু সে সময় তিনি কাউকেই শাস্তি দিতে পারেন নি কেননা কেউ ছিল না যে। তিনি ছাড়া কিছুই ছিল না, কেউই ছিল না, তাই ভালবাসবেন বা শাস্তি দেবেন কাকে? আমি 'ঘৃণা করা'–র (hate) কথা বলিনি কারণ পরমপুরুষ কাউকে ঘৃণা করতে জানেন না।

পরমপুরুষ দু'টো কাজ করতে পারেন না। প্রথমতঃ তিনি কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না, আর দ্বিতীয়তঃ তিনি তারই মত আর একটি পরমপুরুষ সৃষ্টি করতে পারেন না। অনন্তকাল ধরে তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তাই থেকে যান।

তাই তাঁকে মনের ভেতরেই বিশ্ব রচনা করতে হয়েছিল, মানস কল্পনায় জগৎ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এই জন্যেই তাঁর এই স্বগতোক্তি–“ময্যেব সকলং জাতং।"

"ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম"। সৃষ্টির পর তাঁর সেই স্ব–সৃষ্ট সংরচনাকে পালন– পোষণ করতে হবে, সংরক্ষণ–সম্ভরণ করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কে এ কাজ করবেন, কে এই গুরুদায়িত্ব নেবে? এই বিশ্বসৃষ্টির দেখাশোণার জন্যে যেহেতু আর কোন দ্বিতীয় অভিভাবক নেই, স্বভাবতই তাঁর সৃষ্ট সংসার তাঁকেই দেখাশোনা করতে হবে। পালন–পোষণের এই বিরাট দায়িত্বভার, সংরক্ষণ– সন্তরণের এই মহান দায়দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হবে। করাচন দাবান

"ময়ি সর্বং লয়ং যাতি”। তোমরা জান, বিশ্বের সব কিছু চলে চলেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক পরিবর্তনশীল দৃশ্যপট, এক চলমান বাস্তবিকতা, এক দ্রুত বিবর্তনশীল আলেখ্য মাত্র। যেহেতু পরমপুরুষের মানসকল্পনাতরঙ্গ এগিয়ে চলেছে, এই বিশ্বসৃষ্টিও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, সব কিছুই সতত অস্থিরভাবে চলে চলেছে। সংস্কৃতে এই জগৎকে (world) বলা হয় 'সংসার' (সম–সৃ + ঘঞ) যার মানে যা স্বভাবগত ভাবে সরে চলেছে। আবার এর আর এক নাম 'জগৎ' (গম্ + ক্বিপ্) যার মানে যা চলৎ, গতিশীল, জঙ্গম। তাই এখানে সব কিছু এগিয়ে চলেছে কারণ ভূমামনের কল্পনাপ্রবাহ বয়ে চলেছে। এই যে কল্পনাতরঙ্গ, এরা এগিয়ে চলে সঙ্কোচ–বিকাশী (systaltic, pulsative) ধারায়। এই যে চলমানতার গতিপথে সৃষ্ট সত্তারা, এরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে কোথায়? –না, গতিপথের শেষ প্রান্ত সেই সৃষ্টিকর্তা

পরমপুরুষে পৌঁছে তাতেই তারা মিশে যাবে। যেখান থেকে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখানেই তারা ফিরে যাবে। সকল জীবের, সকল সত্তার চলার পথের আদি বিন্দুও সেই পরমুপুরুষ, অন্তিম বিন্দুও সেই একই পরমপুরুষ। তাই তাঁর স্বগতোক্তি হচ্ছে "ময়ি সর্বং লয়ং যাতি”। সব কিছু আমাতেই ফিরে আসে। আমি ছাড়া কোন বিকল্প গন্তব্যস্থল নেই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়”। এটাই একমাত্র পথ–এই বৃত্তাকার মার্গ যার নাম ব্রহ্মচক্র (Cosmological order)।

“তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্”। এইটাই আমার স্বভাব। এরা সবাই আমার সৃষ্টি। আমি সৃষ্টি, সংরক্ষণ–সন্তরণ, পালন–পোষণ ও অবশেষে নিজেতেই সব কিছুকে সংহরণ কর্মে লিপ্ত আছি। এই আমার কর্তব্য–কর্ম আর এই কর্তব্য–কর্মের জন্যেই আমি 'ব্রহ্ম' নামে আখ্যাত। আমি এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। দুই ব্রহ্মের কল্পনা অবান্তর–দুই পরমপুরুষের ভাবনা অভাবনীয়।

আমার দু'টি অপূর্ণতা রয়েছে–এক: আমি আমারই মত আর একটি পরমপুরুষ সৃষ্টি করতে পারি না, যে আমাকে ভালবাসে, যে আমার ভজনা করে সে আমাতেই লীন হয়ে যায়, আমাতেই মিলেমিশে এক হয়ে যায়। তার পৃথক অস্তিত্ব সে আর বজায় রাখতে পারে না। তাই সত্তাগত বিচারে আমি এক ও অদ্বিতীয়

থেকেই যাই। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু সবাই, সব কিছুই আমার দ্বারা সৃষ্ট, কাজেই সকলেই আমার সন্তান। তাই আমি কাউকেই ঘৃণা করতে পারি না।

আমি সদা সর্বদাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্মে ব্যাপৃত থাকি, বিশ্রাম নেবার আমার অবকাশ নেই।

(পটনা, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪২

ঈশ্বরপ্রেম–সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত

তোমরা জান, অন্যান্য সকল বিষয়ে যত যত্নই নেওয়া হোক না কেন, তরকারিতে লবণ ঠিক মত না দিলে তা কখনও সুস্বাদু হয় না। তেমনই সসীম ও অসীমের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের যাবতীয় প্রয়াস বিফল হয় যদি ভক্তির অভাব ঘটে।

যেমন কর্মের ব্যাপারেই দেখ না। সাধক হয়তো কর্মযোগী কিন্তু তার মধ্যেযদি ভক্তি না থাকে তাহলে তার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কর্মের সঙ্গে ভক্তি সংযুক্ত থাকলে,

ঈশ্বরপ্রেম যুক্ত থাকলে তবেই কর্ম গৌরবোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নইলে কর্ম ব্যাপারটা একান্ত যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। আর সেক্ষেত্রে কর্মসাধনার গোড়ার দিকে যদিও কর্মী কিছুটা মানসিক অন্তর্মুখিনতা অর্জন করে পরের দিকে সেটাও লোপ পেয়ে যায়, আর তার ফলস্বরূপ জীবন পথে চলতে গিয়ে সে একান্তই বহির্মুখী হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার মানবীয় অস্তিত্বটাই যন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে। তাই কেবল কর্মের দ্বারা মানুষ পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না যদি সেই কর্মের সঙ্গে ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেম সংযুক্ত না থাকে।

এখন দেখা যাক, তপস্বী সাধকের ক্ষেত্রে জিনিসটা কী রকম দাঁড়ায়। তপস্যা ব্যাপারটা হ'ল স্বল্পকালের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে স্বেচ্ছায় ক্লেশবরণ। এখন, তপস্যা করতে গিয়ে যদি সাধকের মনে পরমপুরুষের প্রতি প্রেম না থাকে তাহলে তপস্যা ব্যাপারটাই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের তপস্যা শুধু সময়ের অপচয় মাত্র। ভক্তি–প্রেমবর্জিত তপস্যা তো শুধু অনর্থক কালক্ষেপ। তাতে সাধকের দেহ ও মনের ওপর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার ফল অবশ্যই শুভপ্রদ হয় না।

যোগ কী? "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”। মন বা চিত্তের সকল বৃত্তির নিরুদ্ধাবস্থাই 'যোগ' নামে অভিহিত হয়। এখন এই

নিরোধকালে যদি পরমপুরুষের প্রতি অন্তরে প্রেম–ভক্তি থাকে সেক্ষেত্রে সমস্ত নিরুদ্ধবৃত্তি পরমপুরুষেই সমাহিত হয়ে যায়। ধর, একজন মস্ত বড় যোগী। কিন্তু যদি তাঁর অন্তরে ইষ্টের প্রতি ভালবাসা না থাকে, তবে যাবতীয় নিরুদ্ধ বৃত্তি স্থূল জড়ে পর্যবসিত হয়ে যায়। তার অর্থ, তার সূক্ষ্ম মানব অস্তিত্বটাই বালুকণা ইট–কাঠ–লোহার মত স্থূল হয়ে পড়ে। ভাব তো কী নিদারুণ অধোগতি! কী শোচনীয় অধঃপতন! এই যে বিশেষ প্রকার যোগ যাতে সাধকের মনে পরমপুরুষের প্রতি কোন প্রেম–প্রীতি নেই তাকে সংস্কৃতে বলে 'হঠযোগ'। মানুষের উন্নতির পক্ষে এ ধরনের হঠযোগ মারাত্মক বিপজ্জনক।

'হ' আর 'ঠ' মিলে 'হঠ'। **সূর্য নাড়ী বা ইড়া নাড়ীর দ্যোতক এই 'হ' ধ্বনিটি,** আবার স্থূল শক্তির (Physical force) ৰীজমন্ত্রও এই 'হ' অক্ষরটি। **আর 'ঠ' হ'ল চন্দ্রনাড়ী বা পিঙ্গলা নাড়ীর দ্যোতক**, সেই সঙ্গে মানস শক্তির ৰীর্জমন্ত্রও এই 'ঠ' অক্ষরটি। তাই 'হঠ' শব্দের তাৎপর্য হ'ল স্থূল শক্তির প্রয়োগের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। সাধারণতঃ যখন আচম্বিতে বা আচমকা কোন ঘটনা ঘটে, আমরা বলে থাকি ব্যাপারটা 'হঠাৎ' ঘটে গেল (হঠেন কুরুতে কর্ম)। স্বভাবতই **কোন হঠযোগী মুক্তি–মোক্ষ লাভ করতে পারেন না।**

আবার ধর, কোন একজনের ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ ভক্তি-প্রেম নেই কিন্তু সে মস্ত জ্ঞানী, ৰড় বুদ্ধিজীবী। সবাই মানে, মানুষটি সত্যিই বড় জ্ঞানী, এটা-ওটা অনেক কিছুই সে জানে ৰোঝে। কিন্তু **পরমাত্মাবর্জিত জ্ঞান তো কলার খোসার মত।** সেটা আসল কলা নয়, কলার খোসা মাত্র। তা থেকে তো আর আসল কলার স্বাদ পাওয়া যাবে না। তাই সেই মানুষটির আহৃত জ্ঞান পরাবিদ্যা নয়- অপরাবিদ্যা। তার আপেক্ষিক জ্ঞান তো স্থূল জড়জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই স্থূল জড়বাদী জ্ঞান গত শতাব্দীতে মানুষের সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেছিল। সারা মানব সমাজকে বিভ্রান্ত করেছিল, মানুষকে অমানুষে, পশুতে পরিণত করেছিল। সত্যিই,এই সব জড়বাদী দর্শনগুলোর অনুগামীরা পশুকেও শোষণের হাত থেকে রেহাই দেয়নি।

"প্রেয়স্করা যা বুদ্ধিঃ সা বুদ্ধিঃ প্রাণঘাতিনী।
শ্রেয়স্করা যা বুদ্ধিঃ সা বুদ্ধিঃ মোক্ষদায়িনী।।"

বলা হয়ে থাকে, পরা-অপরা সব বিদ্যাই বিশাল ক্ষীরসমুদ্রের মত। এখন দুগ্ধসমুদ্রকে মন্থন করে আমরা কী পাই? আমরা পাই মাখন ও ঘোল। এই রকম দুগ্ধসমুদ্রকে মন্থন করে ভক্ত পায় মাখনের ভাগটা আর জ্ঞানীর জন্যে পড়ে থাকে অসার ঘোল অংশটা। বুদ্ধিজীবীরা, জ্ঞানীরা ঘোলের মালিকানা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে মরে। আবার শেষ পর্যন্ত

সেই ঘোলটুকুও তারা ভোগ করতে পায় না কারণ ভাগাভাগি করতে গিয়ে মূল্যবান সময়ের অযথা অপচয়ের ফলে সেই ঘোলটুকুও খারাপ হয়ে যায়, বিস্বাদ হয়ে যায়।

ভক্তির আবার প্রকারভেদ আছে। তাদের মধ্যে মুখ্য হ'ল তিন প্রকারের ভক্তি–তামসিকী, রাজসিকী ও সাত্ত্বিকী ভক্তি। তামসিকী ভক্তি মানে তমোগুণী ভক্তি। বস্তুতঃ **তামসিকী ভক্তি ভক্তিই নয়, কারণ এই ধরনের ভক্ত শত্রুর নিধন কামনা করে।** এক্ষেত্রে পরমপুরুষ যেহেতু এই ধরনের ভক্তের অভীষ্ট নন, তাই তারা কস্মিন্‌কালেও পরমপুরুষকে লাভ করবে না।

রাজসিকী ভক্তি মানে রজোগুণী ভক্তি। এই ধরনের ভক্ত পরমপুরুষের কাছে জাগতিক ধনসম্পদ প্রার্থনা করে। তাতে তারা ধনসম্পদ পেতেও পারে, নাও পারে। তবে এটা ঠিক যে তারা পরমপুরুষকে পাবে না কেননা পরমপুরুষ তো তাদের ধ্যেয় নন।

সাত্ত্বিকী ভক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্য হ'ল পরমপুরুষ। এক্ষেত্রে সাধকের একমাত্র প্রার্থনা হ'ল পরমপুরুষ সম্প্রাপ্তি আর তাই মানুষের যাবতীয় মানবিক কর্মৈষণার চরম ও পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(পটনা, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৩

ঈশ্বরের মুখ্য গুণরাজি

আজ ঈশ্বরের কতকগুলি প্রধান ঐশী গুণ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। এগুলো এমন অপরিহার্য্য গুণ যার জন্যে ঈশ্বরকে লোকে ঈশ্বর বলে মানে বা মেনে চলবে। বলা হয়েছে: "ক্লেশকর্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় এই মুখ্য বৃত্তিগুলির দ্বারা যে সত্তা কখনও উপহত হয় না, প্রভাবিত হয় না, সেই সত্তাই ঈশ্বর পদবাচ্য। নইলে তাঁকে 'ভগবান' বলা যেতে পারে, অথবা অন্য যে কোন আখ্যায় অভিহিত করা যেতে পারে কিন্তু 'ঈশ্বর' আখ্যা পেতে পারেন না।

ক্লেশ কী? কতকগুলো মনের বৃত্তি আছে। 'মনের বৃত্তি' বললুম, কারণ এক্ষেত্রে অথবা অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্তু বা স্নায়ুকোষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যখন মানসিক

অনুভূতির সঙ্কোচবিকাশী গতি আমাদের স্নায়ুর সংকোচ-বিকাশী গতির সঙ্গে সমান্তরলতা বজায় রেখে চলতে পারে না তখন সেই বৃত্তি বা বৃত্তিসমূহকে বা মুখ্য নিয়ন্ত্রক বৃত্তিকে বলা হয় ক্লিষ্ট বৃত্তি বা ক্লেশ। যখন সমান্তরলতা অক্ষুণ্ণ থাকে তখন তাকে বলে অক্লিষ্টা বৃত্তি।

ঈশ্বরের ক্ষেত্রে মনের সংকোচ-বিকাশী গতি ও স্নায়ুর সংকোচ-বিকাশী গতির মধ্যে সমান্তরলতা রক্ষার প্রশ্নই ওঠে না কারণ তাঁর ক্ষেত্রে সব কিছুই তো মনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কোন কিছুর সঙ্গেই তাঁর সমান্তরলতা বজায় রাখার অবকাশই নেই। তাই ঈশ্বর ক্লিষ্টাবৃত্তি থেকে চিরমুক্ত।

মানুষের ক্ষেত্রে অবিদ্যার প্রভাবে ক্লেশ বৃত্তির উদ্ভব হয়। অবিদ্যা যার অপর নাম চরম অজ্ঞতা, পঞ্চ স্তরে বিন্যস্ত। স্তরগুলো হ'ল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অ

অবিদ্যাঃ "অনিত্যাশুচিদুঃখমনাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।” যখন অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাত্ম বৃত্তিকে অজ্ঞতাবশতঃ নিত্য, শুচি ও সুখাত্ম বলে গণ্য করা হয় তাকে বলে অবিদ্যা। এই পাঞ্চভৌতিক জগতের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। তবুও যখন এই অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ ভেবে বসে যে তার নিজের বলতে যা কিছু সবই তার সঙ্গে চিরকাল

থেকে যাবে। এই যে ত্রুটিপূর্ণ চিন্তনপ্রক্রিয়া, এরই নাম অবিদ্যা। তার মানে এই যে মানুষ যখন অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, জাগতিক দুঃখ–যাতনাকে সুখ ও অনাত্মিককে আত্মিক সত্তা বলে বিবেচনা করে, তাকে বলে অবিদ্যা। এরা হ'ল অবিদ্যার রকমারি প্রকারভেদ।

এ যেন সেই কুকুরের নিজের হাড় চিবোনো। হাড়ে রস–কষ কিছুই নেই কিন্তু চিবোতে গিয়ে কুকুরের ঠোঁটগুলো কেটে গিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরে। কুকুর তার নিজের রক্ত চুষে ভাবে রক্তটা বুঝি বাইরের থেকে আসছে। যদিও কুকুরটা নিজেই নিজের অঙ্গ চিবিয়ে ঘা করছে, কিন্তু ভাবছে সে সুখ পাচ্ছে। এই ভাবনাটা অবিদ্যাপ্রসূত। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব স্থূল প্রাণহীন অচেতন বস্তুকে অত্যুজ্জ্বল আত্মা বা আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্ত্তি বলে মনে করে। এ সবই অবিদ্যার প্রভাবপ্রসূত।

অস্মিতা : "দৃদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা”। অবিদ্যার দ্বিতীয় স্তর হ'ল অস্মিতা। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় যখন ঠিক মত কাজ করে, মনও ঠিক ঠিক কাজ করে। যদি সাক্ষী মন না থাকত তাহলে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলোর কাজও অসমর্থিত থেকে যেত। অনুরূপভাবে মন যা কিছু করে চিতিশক্তির উপস্থিতির জন্যেই তা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। আবার অবিদ্যাপ্রসূত ভ্রান্তি বশতঃ মানুষ ভুল করে ভেবে নেয় যে

মনের কাজ ও তার দৃক সত্তার কাজ এক। এই ধরনের অজ্ঞতাকে বলা হয় অস্মিতা। যেমন চোখের কাজ দেখা কিন্তু মন সহায়তা করে বলেই চোখ ঠিক মত কাজ করে যেতে পারে। যে শক্তির সাহায্যে চোখ দেখে তার নাম দর্শন। এই দর্শনশক্তি ও মন যথাযথ কাজ করছে বলেই দর্শন ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই জন্যে মনের অস্তিত্ব অপরিহার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মনকে বলা হয় দৃকশক্তি।

হাতের কাজ হ'ল শিল্পন। আজকাল দেখি, যারা ভাল গান গায় তাদেরও বলা হচ্ছে কন্ঠশিল্পী। কন্ঠ বা বাকযন্ত্র দিয়ে তো কোন শিল্পকর্ম হতে পারে না। হাতের কাজ শিল্পন ক্রিয়া, পায়ের কাজ হচ্ছে চরণ ক্রিয়া। দেহের ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে কখন? যখন মন কাজ করে কেবল তখনই ইন্দ্রিয়গুলো কর্মান্বিত হয়–নচেৎ নয়। ইন্দ্রিয়ের কাজ মনের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তাই ইন্দ্রিয়দের বলা হয় কর্মশক্তি আর মনকে বলা হয় কৃৎশক্তি। কৃৎশক্তির অবর্তমানে কর্মশক্তি নিষ্পন্ন হতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে মানুষ কৃৎশক্তি ও কর্মশক্তিকে ভুল করে এক করে ফেলে। ঠিক তেমনি ভুল করে মানুষ দৃক্ ও দর্শন শক্তিকে এক করে ফেলে। যারা তা করে তারা ভ্রান্ত। অবিদ্যার যে শাখা এই অজ্ঞতাজনিত ভ্রান্তি সৃষ্টি করে তার নাম অস্মিতা।

রাগ: রাগ জিনিসটা কী? বাইরের কোন অবাঞ্ছিত প্রভাবে পড়ে–যেমন ভুল বই পড়ে বা কুসংসর্গে পড়ে অথবা কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে অথবা সেই বস্তুর প্রতি যুক্তিবর্জিত ভাবে মানুষ অন্ধের মত ছুটতে থাকে।

অবিদ্যার যে শাখা মনকে এতখানি মোহমুগ্ধ করে তাকে বলে রাগ।

দ্বেষ: অবিদ্যার চতুর্থ স্তরের নাম দ্বেষ। কোন অন্য বস্তুর বৈয়স্টিক বা বৌদ্ধিক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে মনে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। যুক্তিতর্কের বাইরে কোন বস্তুর প্রতি মনে বিকর্ষণ জাগলে, সেই বিশেষ মানস বৃত্তিকে বলে দ্বেষ।

অভিনিবেশ: "স্বরসবাহী বিদুষো হপিতথারূঢ়ো হভিনিবেশঃ”। অবিদ্যার শেষ ও বিপজ্জনক স্তর হচ্ছে অভিনিবেশ। অনেক বিদ্বান মানুষ, অনেক জ্ঞানী–গুণী লোকেরা জানেন কোন জিনিসটা কী ও কেমন। সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাঁরা ক্ষতিকর সব বৃত্তির মোহজালে আৰদ্ধ হয়ে পড়েন। মানুষের এই ধরনের দুর্বলতার নাম অভিনিবেশ। তোমরা দেখে থাকবে, অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা তাদের আঙ্গুলগুলোকে এমন ভাবে নড়ান যেন হাতে ছড়ি রয়েছে। ক্লাসরুমে ছড়ি ব্যবহার করেন কি না, তাই পরবর্ত্তীকালে হাতে ছড়ি না থাকলেও হাতের আঙ্গুলগুলোকে সেইরকম নড়ান। মদ্যপায়ী ভালভাবেই

জানে অত্যধিক মদ্যপানের ফল কী হতে পারে, তা সত্ত্বেও সে মদ খাওয়ার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারে না। এগুলো হ'ল অভিনিবেশের দৃষ্টান্ত।

এই যে পঞ্চস্তরীয় অবিদ্যা যা এতক্ষণ বলা হ'ল, এরা যে যে বৃত্তির উদ্রেক করে তার নাম ক্লিষ্টা বৃত্তি। ক্লিষ্টাবৃত্তি পঞ্চপর্বা–প্রমাণ, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি ও বিপর্যয়।

প্রমাণ: "প্রত্যক্ষানুমানাগমপ্রমাণানি"। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটি হ'ল প্রমাণ। মানুষ যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে তাকে বলে প্রত্যক্ষ। যখন আন্দাজ করে কোন কিছুর অস্তিত্ব বুঝে নেয় তাকে বলে অনুমান। যেমন দূর থেকে তাকিয়ে কোথাও ধোঁয়া চোখে পড়লে মানুষ ধরে নেয় যে সেখানে অবশ্যই আগুন জ্বলছে। এটা হ'ল অনুমান। আগম হ'ল আপ্তবাক্য। কিন্তু কখনো কখনো মানুষ জেনেবুঝে আপ্তবাক্যের নির্দেশ মেনে চলে না।

বিপর্যয়: "মিথ্যাজ্ঞানম্ তদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্ বিপর্যয়ম্”। আমরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করি যার অর্থবোধক বস্তুর অস্তিত্বই নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলে থাকি, "We stay in the heart of Patna town অথবা Oh, that beautiful building is situated in the heart of Patna town". এখন পটনা শহরটা তো জড় বস্তু।

তার হার্ট বা হৃদয় থাকতে পারে কি? শুধু জীবিত প্রাণীদেহেই হৃদয়ের অস্তিত্ব সম্ভব। পটনা তো পুরোপুরি একটা অ-জৈব সত্তা, সম্পূর্ণ জড় সত্তা, তাতে তো প্রাণ নেই, তাই হৃদয়ও থাকতে পারে না। তবুও বলা হয়ে থাকে, "সুন্দর বাড়ীটা অমুক শহরের একেবারে হার্টের মধ্যে"। এই ধরনের ভাষার ব্যবহার বিপর্যয়ের সুন্দর নমুনা। আবার এমন ভাষাও তো ব্যবহার করা হয়, যেমন নীচের শ্লোকটাতে করা হয়েছে-

"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।।"

অজ্ঞতার জন্যে, অবিদ্যার পরিণাম স্বরূপ আমরা এই সব ভাষা পছন্দ করি। এ সব ক্লিষ্টাবৃত্তির উদাহরণ। শ্লোকটার মানে হচ্ছে-মরুতৃষ্ণিকার (মরুতৃষ্ণিকা থাকে মরুভূমিতে; আসলে মরীচিকা বলে কিছুই নেই, আর তাতে জলও থাকে না) জলে স্নান সেরে আকাশকুসুমের (আসলে আকাশে কুসুম বা ফুল থাকে না) চূড়া মাথায় পরে ৰন্ধ্যা নারীর এই পুত্র (ৰন্ধ্যা নারীর পুত্র হয় না) খরগোসের শিঙ (আসলে খরগোসের শিঙ হয় না) দিয়ে তৈরী ধনুর্বাণ হাতে এগিয়ে চলেছে।

বিকল্প: "শব্দগুণানুপাতী বস্তুশূন্যঃ বিকল্পঃ”। অনুরূপভাবে আমরা কখনো বিকল্প ঠিক মত ব্যবহার করি, কখনো করি

না। ধর, তুমি আরা থেকে পটনা আসছ। ট্রেণে ফুলওয়ারিশরিফ পার হবার পরই তুমি বলতে থাক–পটনা এসে গেছে। না, পটনা আসেনি, পটনা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বরং তুমিই পটনার কাছাকাছি এসে গেছ। আবার তোমরা কখনো কখনো বলে থাক–এই রাস্তাটা বারাণসী পর্যন্ত চলে গেছে। আসলে রাস্তা তো আর যায় না। তুমিই রাস্তা দিয়ে চল। এই হ'ল বিকল্প।

নিদ্রা ও স্মৃতি: এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা কয়েকবারই করেছি। তাই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না।

ক্লেশপর্বে এই সব ক্লিষ্টা বৃত্তি আছে।

কর্ম: তারপর আসছে কর্ম। কর্ম মানে বস্তুর স্থান পরিবর্তন। যা বস্তুর স্থান পরিবর্তন ঘটায় তা–ই কর্ম। এখন পরমপুরুষের সব কিছুই তো মানসাভ্যন্তরীণ।

তাই সেখানে বস্তুর স্থান পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। তাই তিনি কর্মের দ্বারা প্রভাবিত বা উপহত হন না।

বিপাক: বিপাক মানে প্রতিকর্ম (reaction, reactive momenta)। যেখানেই কর্ম সেখানেই প্রতিকর্ম, যদি স্থান–কাল–পাত্র এই আপেক্ষিক ত্রিদণ্ড অপরিবর্তিত থাকে। যদি আপেক্ষিক

ত্রিতত্ত্বের মধ্যে কোন একটিতে পরিবর্তন ঘটে তখন কর্মের প্রতিকর্মের পরিমাপ সমান ও বিপরীত হবে না। তা বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে। তথাপি প্রতিটি কর্মগত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তত্ত্ব তিনটিতে পরিবর্তন ঘটবেই। তাই কর্মের প্রতিকর্মের পরিমাপ কখনও সমান ও বিপরীত হবে না। যেমন ধর, কোন লোক ১০০ টাকা ধার করেছে। ধার শোধ করার সময় তাকে আসল ১০০ টাকার সঙ্গে সুদ বাবাদও কিছু টাকা ধরে দিতে হবে কারণ ইতোমধ্যে বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে। তাই মোট দেয় টাকার অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়াবে ১০৫ বা ১১০-য়ে।

ধর, কেউ হয়তো একটা ভুল করে এসে আমার কাছে শাস্তি চাইল। আমি তাকে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারি-হয়তো অল্প কিছুটা বেশী বা কিছুটা কম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির মাত্রাও ঠিক সমপরিমাণ হবে না। সংস্কৃতে এই প্রতিকর্মকেই বলা হয় বিপাক। যেখানে কর্ম রয়েছে, যেখানে কর্মটা প্রভাব বিস্তার করছে, সেখানে প্রতিকর্ম থাকবেই। কিন্তু পরমপুরুষের বেলায় এমনটি হয় না। যা কিছু কর্ম সবই তাঁর অদৃশ্য মানসভূমিতে হয়ে চলেছে। কাজেই তাঁর পক্ষে কর্মের দ্বারা উপহত হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই তিনি বিপাকের দ্বারাও উপহত হন না।

আশয়: আশয় মানে আশ্রয়, আধার (containing entity)। আমাদের এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি অভিব্যক্তি, প্রতিটি সত্তার জন্যে দরকার একটা আধার, একটা আশ্রয়। আধার ব্যতিরেকে কেউ টিকে থাকতে পারে না। তা সে অমূর্ত ধারণাই (idea) হোক বা কর্মই হোক, একটা আধার চাই–ই বিশেষ করে স্থূল ভৌতিক বস্তুর জন্যে।

প্রায় ৪০০০ বছর আগে পটনা শহরটার নাম ছিল কুসুমপুর। সম্রাট অশোকের সময় শহরটার নাম হ'ল পাটলিপুত্র। পরবর্তীকালে গঙ্গা ও শোণ নদীর প্রবল বন্যায় শহরটা ভেসে যায়, দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে একটি নোতুন শহর। শহর বা নগর বা জনবসতির সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে 'পত্তন'। এই 'পত্তন' শব্দ থেকেই বর্তমান।

নাম পটনা। 'পত্তন' থেকে 'পটনা' নাম এসেছে, পাটলিপুত্র থেকে নয়, 'পাটলিপুত্র' একটা বেশ বড় শব্দ। এই পটনা শহরটার আশয় হ'ল পটনা জেলা। আবার পটনা জেলার আশয় হ'ল 'পটনা কমিশনারি', আবার পটনা কমিশনারিটা হ'ল বিহার প্রদেশে। বিহার প্রদেশ হ'ল বৃহত্তর ভারতের একটি প্রদেশ মাত্র। আবার ভারতবর্ষ দেশটা রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। আর এশিয়া মহাদেশ রয়েছে এই পৃথিবী গ্রহে। পৃথিবী গ্রহের সংস্কৃত পর্যায়বাচক নাম কয়েকটিই রয়েছে যেমন ভূ, ভূমি, ধরা,

ধরিত্রী, সর্বংসহা, বসুমতী, গোত্র, কু, পৃথিবী, পৃথ্বী, ক্ষমা, অবনী, মেদিনী, মহী প্রভৃতি।

আবার এই পৃথিবী গ্রহটার আশ্রয় হচ্ছে পরমপুরুষ। কিন্তু পরমপুরুষের জন্যে কোন আশ্রয় নেই। তাঁর কোন আশ্রয়ের দরকার পড়ে না। এই আশয় দ্বারা তিনি মোটেই উপহত হন না।

এই জন্যেই বলা হয়েছে, "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ের পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ"। সেই বিশেষ পুরুষ এই জীবাত্মারা নয়, সেই পরমাত্মা যিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা পরামৃষ্ট বা উপহত হন না, তিনিই ঈশ্বর। মোগল আমলে দিল্লীর সম্রাটরা কখনো কখনো ভাবতেন–দিল্লীশ্বরঃ জগদীশ্বরো বা। তাঁরা প্রায়ই ভুলে যেতেন যে তাঁরা দিল্লীশ্বরও নন, জগদীশ্বরও নন। তাঁরা সাধারণ জীবাত্মা মাত্র।

(পটনা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৪

মানুষ ও তার মুক্তি

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষের মনে মুক্তি-মোক্ষ নিয়ে একটা বড় রকমের প্রশ্ন রয়ে গেছে। মানব দেহের অতিরিক্ত একটা মানস-আধ্যাত্মিক সত্তা দেহের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য রক্ষা করে চলেছে। আর এই সত্তাই শরীর সংরচনার মাধ্যমে নিজের সূক্ষ্ম ভাবস্পন্দনকে অভিব্যক্ত করে চলেছে। এই সত্তাই দেহ সংরচনাকে কাজে লাগিয়ে, মোক্ষ লাভ করতে পারে।

ভগবান সদাশিব বলেছেন, "ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ।” এই জৈব আধার দিয়েও মানুষ মুক্তি-মোক্ষ পেতে পারে যদি সে জৈব ভাবকে ত্যাগ করে ভূমা ভাবে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে। জৈব আধারে এই মানসাতীত সত্তার অস্তিত্বের জন্যেই অণুজীবের মুক্তি-মোক্ষলাভের সম্ভাবনা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।

ভূমা সত্তায় যা অসীম অনন্ত, অণুসত্তায় তা-ই সীমিত মাত্রায় রয়েছে। কিন্তু অণুর সম্ভাবনা ভূমার মতই অসীম অনন্ত। তাই জৈব অস্তিত্বের সীমিত শক্তি- সামর্থ্যকে বিকশিত করে তাকে অসীম ও অনন্তে পর্যবসিত করতে হবে। আর তা

করতে হবে মানসাধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে (mystic approach)।

হ্যাঁ, এই মিষ্টিসিজম্, বলতে ঠিক কী বোঝায়? না, মিষ্টিসিজম্ হ'ল অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সীমাহীন প্রয়াস। আর যখন সেই সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া গেল তখনই শিববাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হ'ল। এই শিববাক্যটি কি? –না, তা হ'ল "ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ”।

ব্রহ্মবন্দনায় বলা হয়েছে যে বিশ্বের যাবতীয় গুণরাজি পরমপুরুষে নিহিত। তাই তাঁকে বলা হয় 'পরেশ'। 'পরেশ' শব্দের অর্থ কী? প্রতিটি আস্তিত্বিক সংরচনার রয়েছে দু'টো দিক–পরা ও অপরা। একই সত্তার দু'টি বিপরীত দিক। দৃষ্ট অংশ যাকে বলা হয় অপরা আর দৃক্ অংশ যাকে বলি পরা। এখন মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু দেখে বা করে তা হ'ল অপরা। আর এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলো হ'ল পরা। পরবর্তী ধাপে ইন্দ্রিয়দ্বারগুলো হ'ল অপরা, আর মন হ'ল পরা। তারও পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে মন হ'ল অপরা ও জীবাত্মা হ'ল পরা। আর শেষ স্তরে এসে জীবাত্মা হয়ে যাচ্ছে অপরা আর পরমপুরুষ হয়ে যাচ্ছেন চরম পর সত্তা। এই ভাবে যিনি সকল পর সত্তার ঊর্ধ্বে তাঁকে বলা হয় 'পরেশ'।

এখন, মানুষ যখন অপর জগৎ থেকে সমস্ত মানসবৃত্তিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে পরমপুরুষের দিকে চালিয়ে দেয় তখন সে এই 'পরেশ'–কে লাভ করে, সেই পরেশ সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সাধনা জিনিসটার গোপন রহস্য এটাই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরমপুরুষ হলেন পরেশ। এই অর্থে–তিনি প্রভু–ও। 'প্র' মানে প্রকৃষ্ট আর 'ভু' মানে হওয়া। তাহলে প্রভু মানে হ'ল সর্বোত্তম সংরচনা। তিনি হলেন এই পরিদৃশ্যমান জগতের 'প্রভু'।

এই যে শিববাক্য, নানান দিক দিয়ে এই আপ্তবাক্যের প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে, পরমপুরুষ হলেন 'সর্বেন্দ্রিয়াগম্য' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরমপুরুষকে জানা–বোঝা যায় না। জৈব আধারে রয়েছে দশটি ইন্দ্রিয়–পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এছাড়া একটি বাড়তি একাদশ ইন্দ্রিয়ও রয়েছে। তা হ'ল মন। একটু আগেই বললুম, পরমপুরুষ হলেন 'সর্বেন্দ্রিয়াগম্য'। সর্ব + ইন্দ্রিয় + অগম্য। "যচ্চক্ষুষা না পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি"–অর্থাৎ চোখ যাকে দেখতে পায় না কিন্তু যার কাছ থেকে চোখ অন্যান্য বস্তুকে দেখবার সামর্থ্য পেয়ে থাকে। তাই তিনি হলেন 'সর্বেন্দ্রিয়াগম্য' অর্থাৎ তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে অন্যান্য যে ইন্দ্রিয়ের মত মানুষের মনও একটা ইন্দ্রিয়–একাদশ ইন্দ্রিয়। তাই বেদে বলা হয়েছে–

"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ মা বিভেতি কুতশ্চন।।”

যেখানে তন্মাত্ররা ব্যর্থ, যেখানে ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি–সামর্থ্য ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, যেখানে মানুষের মনও কোন কিছু জানতে বুঝতে না পেরে বিফল হয়ে ফিরে আসে, সেই সত্তাই হ'ল পরমপুরুষ (Supreme Subjectivity)। যখন, ইন্দ্রিয় সহ মনকে পরমপুরুষ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা থেকে প্রত্যাহার করে কেবল পরমপুরুষের দিকেই চালিয়ে দেওয়া যায়, সেই অবস্থাকে বলা হয় পরমা স্থিতি। আর সেই পরমা স্থিতিতে রয়েছে সম্পূর্ণ অভীতি।

'সর্বেন্দ্রিয়গম্য সত্য'। যে ভূমিতে 'সৎ' তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাকেই বলা হয় 'সত্য'। 'সত্য' শব্দের পরিভাষায় বলা হয়েছে যা অপরিণামী, যা অবিকারী। তাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই পরেশ, সেই সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্তা হ'ল একমাত্র সত্য। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্লোকের শব্দগুলো হুবহু আমি ব্যবহার করছি না। শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ব্যাখ্যা করতে চাই।

'অচিন্ত্য'। পরমপুরুষ কখনো তোমার মনের বিষয় হতে পারেন না। একবার আলোচনা প্রসঙ্গে তোমাদের বলেছিলুম, পরমপুরুষের ধ্যান করতে গিয়ে তোমরা তাকে মনের বিষয় হিসেবে পেতে পারই না। কারণ তিনি তো বিষয়ী (Subject) আর তোমরা হলে তাঁর মনের বিষয় (Object)। বস্তুতঃ এই বিশ্বের প্রতিটি সত্তাই তাঁর এক একটি বিষয়। তিনি হলেন চরম বিষয়ী সত্তা (Supreme Subject)। এখন তিনি যদি বিষয়ী হন তাহলে জপ–ধ্যান করতে গিয়ে তিনি তোমার মানস বিষয় হবেন কী করে? যুক্তি বলে, তিনি কারো বিষয় হতে পারেন না। তাই যা প্রয়োজন–আর এখানেই সাধনার মাধুর্য–তা হ'ল এই যে সাধক জপ–ধ্যান করতে গিয়ে ভাববে যে, পরমপুরুষ তাকে দেখে চলেছেন অর্থাৎ সাধক হ'ল পরমপুরুষের মানস বিষয়। জপ– ধ্যানকালে তোমরা এই কথাটাই ভাল করে মনে রাখবে। এটি একটি মস্ত বড় তত্ত্ব–সাধনা জগতের গুপ্ত রহস্য। তাই বলা হয় পরমপুরুষ হলেন 'অচিন্ত্য'। মানুষ হ'ল তাঁর 'চিন্ত্য'।

পরমপুরুষ যেমন অচিন্ত্য তেমনি অক্ষরও। তাই বলা হয়েছে 'অচিন্ত্যাক্ষরঃ। 'অক্ষর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল যার কোন আয়–ক্ষয় নেই, হ্রাস–বৃদ্ধি নেই।

পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে আর একটি বিশেষণ হচ্ছে 'জগদ্ভাসকাধীশঃ'। জগৎ মানে যা চলে চলেছে। এই ব্যাপ্ত জগতের সবকিছুই চলমান..... গতিশীল.... আমি তো বলি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হ'ল এক চলমান আলেখ্য। এই বিশ্বের প্রতিটি দৃষ্ট সত্তাই পরমপুরুষের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। অর্থাৎ এই বিশ্বের যাবতীয় জ্যোতি, দ্যুতি–সব কিছুর চরম উৎস হ'ল সেই পরমপুরুষ। আমরা সূর্য (Sun or Apolo) থেকে আলোক ও শক্তি পেয়ে থাকি। আর সূর্য আলোক ও শক্তি পেয়ে থাকে পরমপুরুষের কাছ থেকে।

পরমপুরুষ হলেন বিশ্বের পরম সবিতা–সমস্ত আলোর পরম ও চরম উৎস। তাই বেদের গায়ত্রী ছন্দে রচিত সবিতৃ–ঋচিতে পরমপুরুষকে বলা হয়েছে 'সবিতা'। এই বিশ্বের যত কিছু চাকচিক্য আলোর ঝলমলানি তা সবই আসছে সেই পরমপুরুষ থেকেই। তাই তাঁকে বলা হচ্ছে "জগদ্ভাসকাধীশঃ”।

যেহেতু সেই পরমপুরুষ ছোট–বড় গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন সকল সত্তার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছেন তাই সাধক যখন সেই উৎসারিত কিরণমালার পরম উৎসের দিকে এগিয়ে চলবে, স্বভাবতই সে তখন সৃষ্টির চক্রনাভি পরমপুরুষেই পৌঁছে যাবে। তাই ভগবান সদাশিব যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ

সত্য, এক শ' ভাগ সত্য। "ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ”।

আবার মানুষ যখন অংশুমালার বিপরীত পথ ধরে তার উৎসে পৌঁছবে তখনও মানুষ অনুভব করবে তত্ত্বতঃ সে নিজেও ব্রহ্ম। তাই অধ্যাত্মমার্গে বৈবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে দেহভৃৎ অর্থাৎ জীব মুক্তি লাভ করবে। মানসাতীত যে পরম সত্তা জৈব সংরচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকবে সে শেষ পর্যন্ত মানব সংরচনার মাধ্যমেই মোক্ষ লাভ করে। তাই বলব, উপরি- উক্ত শিবোক্তিটি যেমন অতীতেও সত্য ছিল, তেমনি আজও তা সমভাবেই সত্য ও ভবিষ্যতেও তা সত্য থাকবে।

(পটনা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৫

পরম জাদুগর

"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে
চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি একজন বিরাট জাদুগর। তিনি তাঁর পরম ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাকে নিয়ন্ত্রণও করছেন তিনিই। সৃষ্টিতে এমন কেউ নেই, এমন কিছুই নেই যাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বা করেন না। সত্যি বলতে কি, এই বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি সত্তাই তাঁকে মেনে চলে, তিনি তাঁর প্রাকৃত শক্তির মাধ্যমে সবাইকার ওপর, সব কিছুর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।

প্রকৃতি বা শক্তি হ'ল তাঁর আশ্রিত শক্তি–'শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ'। কেবল পরমপুরুষের ইচ্ছা অনুসারেই তাঁকে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই পরমা শক্তির দ্বারাই তিনি বিশ্বের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই যেহেতু তিনি সব কিছুর চরম ও পরম নিয়ন্ত্রক তাই তাঁকে বলা হয় ঈশ্বর।

জাদুগর যখন কোন কিছু তৈরী করেন, দর্শকরা ভাবে–বাপ রে, কী অদ্ভুত জাদু। কী অপূর্ব জাদুজাল! কিন্তু জাদুগর তো জানে এই জাদুর পেছনে রহস্যটা কী। বাজীকর জানে, দর্শকদের কেউ যদি ভোজবিদ্যার ভেতরকার রহস্যটা জেনে যায় বা জানবার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে সেই দর্শক তো জাদুবিদ্যায় ভুলবে না বা সম্মোহিত হবে না। যতক্ষণ এই সম্মোহনটা থাকছে কেবল ততক্ষণই জাদুর জগৎটাকে সে মুগ্ধ হয়ে দেখে। কিন্তু তার পরে সেই মুগ্ধ ভাবটা থাকে না। তখন সে বলবে–না, না আমি আর ম্যাজিক দেখতে চাই না। আমি ম্যাজিসিয়ানের দলের সদস্য হতে চাই, আমি আর দর্শকের গ্যালারিতে বসে থাকতে চাই না।

জাদুগর চায়, মানুষ দর্শক হিসেবে জাদুর খেলা দেখতে থাকুক কিন্তু যে সব দর্শক বা বুদ্ধিমান মানুষ জাদুগরের দলে ভিড়ে যেতে চায়, তারা কী করবে? –না, তাদের জাদুগরের প্রতি ভক্তি–ভালবাসা বেড়ে যাবে, তার দলে ভিড়ে যাবে। আর যেই জাদুগরের দলের সদস্য হয়ে যাবে তখনই জাদুবিদ্যার গোপন রহস্যগুলো তারা একের পর এক জেনে ফেলবে।

"য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ"। এই যে জাদুর খেলা, এই খেলার উৎস তো জাদুগরের মনের ভেতরেই। তিনি নিজেকেই নানান জাদু কৌশলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন। আর সেই

পরম জাদুগরই জাদু–সৃষ্ট জগতের সব কিছুকেই পালন করে চলেছেন, পুষ্ট করে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত ওই জাদুর জিনিসগুলো জাদুগরের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে।

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। যে ভক্তিমান সাধক সেই পরম ঐন্দ্রজালিকের নিৰিড় সান্নিধ্যে এসেছেন, কেবল সেই বুদ্ধিমান সাধকই ভক্তিবলে অমৃতত্ব লাভ করেন।

অমৃতত্ব জিনিসটা কী? এই বিশ্বের সব কিছুই পরিবর্তনশীল। যা এসেছে কালক্রমে একদিন তা ক্রমলয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলবে। কিন্তু যা পরম সত্য তা অপরিবর্তনীয়, তা বিকাররহিত। তাই যে মানুষ বা বুদ্ধিমান সাধক পরমপুরুষের আশ্রয় নেয় সে অমৃতত্ব লাভ করে। তাই শাস্ত্রে পরমপুরুষকে বলা হয় 'মৃত্যোমৃত্যুঃ'।

এই 'মৃত্যোমৃত্যুঃ' শব্দটির দু'টো মানে হয়। প্রথমটি হ'ল, যারা পরমপুরুষকে উপলব্ধি করে তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। তাদের মৃত্যু হ'ল মহামৃত্যু। দ্বিতীয় মানেটি হ'ল–তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু স্বরূপ অর্থাৎ যার কাছে এসে মৃত্যু থেমে যায় অর্থাৎ তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটাতে পারেন। তাই বলা হয়েছে, "অমৃতাস্তে ভবন্তি"–যারা পরমপুরুষকে জেনেছে তারা অমৃতত্ব লাভ করেছে।

(পটনা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৬

বিশ্বমায়া থেকে মুক্তি

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।।"

এই জাগতিক ও অতিজাগতিক বিশ্বে আমরা দুই ধরনের সত্তা দেখতে পাই ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষর হ'ল পরমা প্রকৃতির বন্ধনের দরুণ চিতিশক্তির স্থূলীভূত রূপ। এই জন্যে সংস্কৃতে দার্শনিক পরিভাষায় প্রকৃতিকে বলা হয় 'প্রধান' কারণ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকাই মুখ্য। 'প্রধান' মানে মুখ্য।

এই বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখি বা যা কিছু আমাদের আয়ত্তে এসে যায় তা হ'ল ক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি–সৃষ্ট বস্তু। আর যা প্রকৃতির গুণবন্ধনের আওতায় আসে না চিতিশক্তির সেই

অংশকে বলা হয় অক্ষর। এর মানে হচ্ছে চিতিশক্তির এই অংশটার কোন রূপান্তরণ বা সংরচনাগত পরিবর্তন ঘটছে না। সে অক্ষয় ও অবিকৃত সত্তা।

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ”। আর এই যে অক্ষর অংশ যা কিনা অপরিবর্তনীয়, স্বরূপতঃ তা অমৃতাক্ষর। ক্ষর হ'ল মরণশীল, বিনাশশীল কিন্তু অক্ষর হ'ল অমৃত, অবিনাশী সত্তা।

মৃত্যু বলতে আমরা কী বুঝি? মৃত্যু বা মরণ হ'ল এক ধরনের পরিবর্তন।অক্ষর মানে হ'ল যা এই পরিবর্তনশীল আওতায় আসে না অর্থাৎ যা স্বরূপতঃ অমর। "অমৃতাক্ষরং হরঃ”। এই জন্যেই এই অক্ষরকে বলা হয় 'পর'। 'পর' মানে যাতে কোন রূপান্তরণ বা পরিবর্তনশীলতার কোন প্রকার অবকাশ নেই।

"ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ”। এই ক্ষর ও অক্ষরের বাইরে আরও একটি সত্তা রয়েছে। একটু আগেই বললুম, প্রথমটি ক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের যে রূপটি পরিবর্তিত হয়ে কর্মকারকে এসেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির গুণৰন্ধন–সৃষ্ট এই বহির্বিশ্ব। দ্বিতীয়টি হ'ল অক্ষর ব্রহ্ম যার অপর নাম হর। 'হর' মানে কোন প্রাকৃত প্রভাবে যার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আসে না।

আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হ'ল হরি ও হরের দিব্য লীলা। অর্থাৎ বলতে পারি, এই জগৎ হ'ল হরিহরাত্মক। একটু আগেই বললুম যার কোন প্রকার বিকার বা পরিবর্তন ঘটে না তিনি হলেন হর আর হরি মানে হ'ল যিনি অপরের যাবতীয় পাপকে হরণ করে নেন। "হরতি পাপানি ইত্যর্থে হরিঃ”।

এখন লোকে বলতে পারে যে, পরমপুরুষ এত বিরাট, এত মহান, তিনি কি করে চুরি করতে পারেন। আসলে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু গোলমেলে। তবে ঘটনাটা হ'ল এই যে পরমপুরুষ কখনো কখনো চুরি করেন। কিন্তু এই চুরির জন্যে তাঁকে কোন দোষ বা অপবাদ দেওয়া যাবে না। পরমপুরুষ চান, ভক্ত তার পুঞ্জীভূত পাপরাশি পরমপুরুষকে দিয়ে মুক্ত হোক। কিন্তু যখন পরমপুরুষ ভক্তকে সেই কাজটা করতে বলেন তখন ভক্তরা আকুল হয়ে বলে, "হে নারায়ণ, আমরা তোমাকে আমাদের মন প্রাণ-আত্মা দান করতে পারি কিন্তু আমাদের পুঞ্জীভূত পাপরাশি কী করে দিই! সে কাজ করতে পারব না।” এখন ভক্তমাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। পরমপুরুষও ভক্তদের অত্যন্ত ভালবাসেন। এখন যেহেতু ভক্তরা স্বেচ্ছায় বা অনুরোধে তাদের পুঞ্জীভূত সংস্কার কিছুতেই ভগবানকে দেবে না, তাই পরমপুরুষ বাধ্য হয়েই প্রিয় ভক্তদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপরাশি হরণ করে নেন। তাই তাঁর অপর নাম হরি।

আলোচ্য শ্লোকটিতে আমরা 'হরঃ' শব্দটিকে পাচ্ছি, "অমৃতাক্ষরং হরঃ”। এখন প্রথমতঃ পাচ্ছি ক্ষর ব্রহ্ম, দিতীয়তঃ পাচ্ছি অক্ষর ব্রহ্ম, সেই সঙ্গে তৃতীয় সত্তা হ'ল নিরক্ষর ব্রহ্ম।

তোমরা জান যে এই সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র হচ্ছে 'অ'। আর এই অ, উ ম = ওঁ আর কার্যব্রহ্মের ৰীজমন্ত্র হচ্ছে 'ক'। তাই 'ক' হ'ল আর্য–ভারতীয় বর্ণমালায় প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ আর 'অ' হ'ল বর্ণমালার প্রথম স্বরবর্ণ কারণ 'অ' হ'ল সাধারণ ভাবে সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র।

তাহলে 'ক' বলতে বোঝাচ্ছে কার্যব্রহ্মের ৰীজমন্ত্র। 'ক' ধ্বনির দ্বিতীয় মানে হ'ল আর্য–ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ আর 'ক' শব্দের তৃতীয় মানে হ'ল জল (water)। সংস্কৃতে জলকে 'ক'–ও বলা হয়। তেমনি 'ক' অর্থাৎ জলের আরও কয়েকটি পর্যায়বাচক শব্দ হচ্ছে নীরম্, তোয়ম্, উদকম্, কম্বলম্, পানীয়ম্ ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'ক' বলতে জলকেও বোঝায়।

কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলুম, যে ভূভাগ জল অর্থাৎ 'ক' দিয়ে আচ্ছাদিত সেই ভূভাগের নাম কচ্ছ। 'ক' মানে জল, 'ছ' মানে ছাদিত (covered)। সংস্কৃত মূল ধাতু ছদ্ + ড প্রত্যয়

করে 'ছ' শব্দ পাচ্ছি। এই 'ছদ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় করে আমরা 'ছাদ' শব্দটি পাচ্ছি। 'ছাদ' মানে হ'ল যা দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে। আসলে কচ্ছ জায়গাটা হ'ল ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটি ভূখণ্ড।

হ্যাঁ, বলছিলুম নিরক্ষর ব্রহ্মের কথা। "ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ”। ক্ষর– অক্ষর ছাড়া আরও এক দেব আছেন যিনি এই ক্ষর ও অক্ষরকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি হলেন নিরক্ষর ব্রহ্ম। এই নিরক্ষর শব্দের সাধারণ মানে হ'ল অশিক্ষিত। কিন্তু এখানে 'নিরক্ষর' মানে তারকব্রহ্ম অর্থাৎ সৃষ্টি চক্রে সগুণ ও নির্গুণের ঠিক মাঝখানটিতে যাঁর অবস্থিতি ও সেইসঙ্গে যিনি ক্ষর ও অক্ষরকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। তিনি নিজে নির্গুণ নন কেননা সৃষ্টির কোন সত্তাকেই এই নির্গুণ ব্রহ্ম নিয়ন্ত্রণ করেন না। নির্গুণ সত্তা তত্ত্বতঃ নির্বিষয়ী সত্তা, তিনি কোন কিছুকেই তাঁর বিরাট মনের আভোগ করে নেন না।

মানুষকে সাধনা করতে হবে। এখন, এই যে সাধনা, সেটা কার সাধনা? না, এই সাধনা ক্ষরেরও নয়, অক্ষরেরও নয়। সাধনা করতে হবে নিরক্ষর ব্রহ্মের। কারণ, মানুষ যদি ক্ষরব্রহ্মের ধ্যান করে তাহলে একদিন সে ক্ষরেই রূপান্তরিত হবে, সে ক্রমশঃ স্থূল জড়ে পরিণত হবে। তাই ক্ষর কখনও জীবের ধ্যেয় হতে পারে না।

আবার অক্ষর ব্রহ্মও জীবের ধ্যেয় হতে পারেন না কারণ অক্ষর ক্ষরের সঙ্গে সর্বদাই সংযুক্ত থাকেন, সব সময় ক্ষর সম্পর্কিত ব্যাপারেই জড়িত থাকেন। তাই এই অক্ষর ব্রহ্মক্ষও পুরোপুরি মুক্ত পুরুষ নন। তাই জীবের ধ্যেয় বা উপাস্য হবার যোগ্যতা থাকে কেবল নিরক্ষরের। তাই এখানে বলা হয়েছে "তস্যাভিধ্যানাৎ”। তোমাকে তাঁরই অভিধ্যান করতে হবে।

অভি–ধা + ল্যুট প্রত্যয় করে 'অভিধ্যান' শব্দটা নিষ্পন্ন। এই জগতের যাবতীয় ক্ষণস্থায়ী সত্তা থেকে মনকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই প্রত্যাহৃত মানস বৃত্তি বা বৃত্তিসমূহকে সেই নিরক্ষর ব্রহ্মের দিকে চালিত করতে হবে। এই হ'ল নিরক্ষরের অভিধ্যান। মানুষের মনে অজস্র বৃত্তি লুকিয়ে রয়েছে। সে সবকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তারপর সেই একত্রীভূত মানসবৃত্তিগুলোকে বা বহুতর বৃত্তির সংহত শক্তিকে নিরক্ষরের দিকে পরিচালিত করতে হবে। এরই নাম অভিধ্যান।

"তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ”। অনলস প্রয়াসের দ্বারা, নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের দ্বারা সাধক পরমপুরুষের নিকটতম সান্নিধ্যে আসতে পারে। "যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ”। তৎ + ত্ব = তত্ত্ব। 'তৎ' মানে সেই সত্তা, এখানে নিরক্ষর ব্রহ্ম। সেই এক সত্তার ওপর নিরন্তর ধ্যান করার নাম 'তত্ত্বভাব'

(পঞ্চমীতে 'তত্ত্বভাবাৎ')। আর এই যে বহুতর সাধনার ধারা এর শেষ পরিণতি বা লক্ষ্য কী? –না, বিশ্বমায়ার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি। চ্যারি ডিটি কেম

এখন, এই যে মায়া এর আবার প্রকার ভেদ রয়েছে– মহামায়া, যোগমায়া, অণুমায়া, বিষ্ণুমায়া, বিশ্বমায়া ইত্যাদি। বিশ্বমায়া বলতে বোঝায় সেই সব প্রাকৃত প্রভাবকে যা এই সৃষ্ট জগতের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে যায়। আর যে সর্বব্যাপী মায়িক প্রভাব কেবল এই সৃষ্ট জগতের অভ্যন্তর ভাগে কাজ করে যায় তাকে বলি বিষ্ণুমায়া। এখানে বিশ্বমায়ার ৰন্ধন থেকে মুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এই বিশ্বমায়াই নিপুণ হাতে বর্ণময় ধ্বনিময় জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন।

তাই বলব, এই নিরক্ষর ব্রহ্মের নিরন্তর সাধনার দ্বারাই সাধক তাঁতে বিলীন হবে, বিশ্বমায়ার সর্বগ্রাসী ৰন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে। এর অন্য কোন বিকল্প নেই, অন্য কোন পথ নেই।

(পটনা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৭

চিতিশক্তিই পরম উপাদান

"একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং
নান্যৎ কিঞ্চিৎ বর্ত্ততে বস্তুসত্যম্।।
তয়োর্ভেদো হস্মিন্ ইন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব।।"

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক চিতিশক্তি অখণ্ড ধারায় বয়ে চলেছে আর এই ধারাপ্রবাহ শুধু অনবচ্ছিন্নই নয়, এর না আছে আদি, না আছে অন্ত।

'একম্'। 'এক' বলতে কী বোঝায়? সমস্ত তান্মাত্রিক প্রবাহ যখন মিলেমিশে এক বিন্দুতে পৌঁছে যায়, এক নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় বিন্দুতে উপনীত হয়, কেবল তখনই আমরা 'এক' শব্দটা ব্যবহার করি। আমাদের তন্মাত্রসমূহ যেখানেই প্রত্যাহৃত হোক না কেন, আমরা সব সময় একটা বিন্দুতে বা নির্দিষ্ট বিষয়ে উপনীত হই। কাজেই এই চিতিশক্তি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে এক শব্দটা প্রয়োগ করতে পারি।

'নিত্যমাদ্যন্তশূন্যম্'। নিত্য মানে এমন একটা বাস্তব তত্ত্ব যার বাস্তবিকতা প্রশ্নাতীত, যার আস্তিত্বিক সত্যতা অতীতেও সন্দেহাতীত ছিল, বর্তমানেও রয়েছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। তাকেই বলে 'নিত্য'।

সেই চিতিশক্তিকে আদি কারণও বলা যেতে পারে। সংখ্যাগত বিচারে সেই সত্তা সর্বদাই এক, সেই সঙ্গে নিত্যমাদ্যন্তশূন্যম্–ও। 'আদি' মানে সূত্রপাত... শুরু (starting point), অন্ত মানে শেষ.... সমাপ্তি (culminating point/terminating point)। 'আদ্যন্তশূন্যম্' মানে যার আদিও নেই, অন্তও নেই।

বেদে একটা গল্প আছে। একবার কিছু সংখ্যক দেবতা, দৈত্য ও মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সামনে এক পরম জ্যোতির্ময় সত্তা আবির্ভূত হন। এই সত্তার কোন আদিও ছিল না, কোন অন্তও ছিল না। দেব, দৈত্য ও মানুষদের মধ্যে কেউই তাঁর সামনে যেতেই সাহস করল না, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা। পরে দেবতাদের কেউ কেউ সাহসে ভর করে সেই সত্তার কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল।

প্রথম গেলেন বায়ুদেবতা। গিয়ে সেই সত্তাটিকে প্রশ্ন করলেন, "কে আপনি?” সরাসরি উত্তর না দিয়ে সেই জ্যোতির্ময় সত্তা

বায়ুদেবতাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'? বায়ুদেবতা জানালেন, "আমি পবনদেব"। আমি সামনে যাকেই পাই তাকেই ফুৎকারে উড়িয়ে দিই।" উত্তরটা শুণে সেই জ্যোতির্ময় সত্তা বললেন, "তাই না কি!” আচ্ছা, তোমার সামনে এই একটা তৃণখণ্ড রাখলুম। এটাকে ওড়াও তো দেখি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বায়ুদেবতা সেই তৃণ খণ্ডটাকে একটুও নড়াতে পারলেন না। লজ্জায় মাথা হেট করে পবনদেব সংযত ভাবে প্রস্থান করলেন।

এর পর এলেন অগ্নিদেবতা। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমি অগ্নিদেব। সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দেওয়াই আমার কাজ।” অগ্নিদেবতার সামনে সেই ঘাস পাতাটা রেখে সেই জ্যোতির্ময় সত্তাটা বললেন, "আচ্ছা, এই তুচ্ছ তৃণখণ্ডটা পুড়িয়ে ফেলো তো, দেখি।" অগ্নিদেবতাও বিফল

হলেন, লজ্জায় অধোবদন হয়ে স্থান ত্যাগ করলেন।

অতঃপর এলেন জলদেবতা বরুণ। তিনিও সেই ছোট্ট ঘাসের পাতাটিকে জলে ভিজিয়ে সপ্সপে করতে না পেরে অধোবদন হয়ে ফিরে গেলেন।

তারপর সবাই আলোচনা করে ঠিক করলেন, এভাবে তাঁকে জানা যাবে না। তাঁরা নিজেদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান

সত্তাটিকে খুঁজে বার করলেন। তাঁকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলেই চলবে না, সেই সঙ্গে ভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কী করে কাজ গুছিয়ে নিতে হয় সেই রকম কুশলী কর্মকৃৎ-ও হতে হবে। তাঁরা সেই রকম একজনকে তাঁদের দলপতি নির্বাচন করলেন আর তাঁকেই ভার দিলেন সেই অজ্ঞাত জ্যোতির্ময় সত্তার পরিচিতি খুঁজে বার করতে।

এই দলপতি পরম শ্রদ্ধাভরে সেই প্রোজ্জ্বল সত্তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে জ্যোতির্ময় বিভূতি, হে পরম সত্তা, দয়া করে আমায় জানাবেন কি আপনার আসল পরিচয়?"

সেই সত্তা উল্টে দলপতিকেই প্রশ্ন করলেন, "তোমার পরিচয় কী?”

উত্তর এল, "সেটাই আপনার কাছে জানতে এসেছি, হে মহাত্মন! ঠিক জানি না আমি কে।"

অতঃপর সেই সত্তা আবার প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী কর? তোমার কাজ কী?"

এর পরের উত্তর: "আপনি যা করতে আদেশ করবেন, তা-ই করব।” উত্তর শুণে সেই জ্যোতির্ময় সত্তা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমিই হলুম সেই

চিতিশক্তি। তোমার ভেতরে বাইরে আমিই বিরাজ করি। আমার অস্তিত্বের জন্যেই তুমি টিকে আছ, তুমি কাজ কর, তুমি অনুভব কর, তুমি সব কিছু উপলব্ধি কর। আমার বৃহৎ অস্তিত্বের তুমি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশমাত্র। আমি যদি হই বৃহৎ মহোদধি তুমি হলে তার এক বিন্দু জল মাত্র।"

অতঃপর সেই দলপতি সেই জ্যোতির্ময় সত্তার কাছ থেকে বাণী চাইলেন। সেই সত্তা বললেন, "তোমার প্রতি আমার বাণী হ'ল 'দ'। আমার এই বাণী সবাইকার কাছে পৌঁছে দাও।”

অতঃপর সেই দলপতি সেই জ্যোতির্ময় সত্তার পরিচিতি জেনে নিয়ে ও সেই সঙ্গে তার বাণী নিয়ে নিজের দলের কাছে ফিরে গেলেন। দলের লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাল ও স্থায়ী ভাবে তাঁদের দলের নেতা ও রাজারূপে মেনে নিল। প্রাচীন সংস্কৃতে দলনেতাকে বলা হত ইন্দ্র। সেই থেকে ইন্দ্র হয়ে গেলেন দেবতাদের রাজা।

এখন, সেই যে জ্যোতির্ময় সত্তার বাণী 'দ' ধ্বনিটা–দেবতা, দৈত্য ও মানুষ তাদের আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী তার এক এক রকম মানে করল। এক দল বললে, 'দ' মানে "দমনং কুরু", দমন করা। দমন করো মানে নিজেকে দমন করো, শাসন করো, নিয়ন্ত্রণে রাখো, নিজের যাবতীয় মানস

বৃত্তিকে বশে রাখো, দান্ত হও (দম্ + ক্ত = দান্ত)। ধার সমস্ত মানসিক বৃত্তি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে তাকে বলব দান্ত। এই যে জনগোষ্ঠী যারা 'দ' শব্দের মানে করল "দমনং কুরু”, তারা দেবতা নামে পরিচিত হ'ল।

আর এক দল বললে, 'দ' মানে "দয়াং কুরু"–দয়া করো। এই দয়া বৃত্তি তোমাদের হৃদয়কে মাধুর্যমণ্ডিত করবে আর সেই মাধুর্যভরা হৃদয় ধীরে ধীরে চতুর্দিকে প্রসারিত হবে। এই যে গোষ্ঠী যারা 'দ' শব্দের মানে করল "দয়াং কুরু" তারা মানব বা মানুষ নামে অভিহিত হ'ল।

আর তৃতীয় দল বললে, "না না, 'দ' মানে 'দমনং কুরু নয়'। 'দয়াং কুরু– ও নয়', 'দ' মানে "দানং কুরু"–দান করো, দান করো। এই তৃতীয় গোষ্ঠী পরিচিত হ'ল দানব বা দৈত্য বা অসুর নামে। এই ভাবে তিন ধরনের সংস্কারযুক্ত জীব তৈরী হ'ল।

তাহলে দেখছি, সেই পরম সত্তা হলেন এক, তাঁর উপদেশ, আদেশ বা নির্দেশ সকল জীবের জন্যে এক। স্থূল–সূক্ষ্ম–জ্যোতির্ময় সকলের জন্যে এক।

মানবদেহ পাঞ্চভৌতিক উপাদান দিয়ে তৈরী –ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম দিয়ে। দানবের শরীর তৈরী–অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই চতুর্ভূত দিয়ে আর দেবতাদের শরীর তৈরী হয়েছে তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই ত্রিতত্ত্ব দিয়ে। তাই দেবতাদের শরীর মানুষের চোখে পড়ে না। দেবতাদের সংস্কৃতে বলা হয় 'দেবযোনি' আর তাদের শরীর তৈরী হয় ত্রিতত্ত্ব দিয়ে।

'একম্': সেই পরম সত্তা এক, তাঁর উপদেশও সকলের জন্যেই এক। একটি শব্দ, একটি মাত্রার শব্দ আর সেই একমাত্রিক শব্দটি হ'ল 'দ'।৫০

পরমপুরুষের 'দ' অক্ষরটার 'দানং কুরু' ব্যাখ্যাটা তুলনামূলক ভাবে অবশ্যই স্থূলতম। কারণ, কোন কিছু দান করতে গেলে আগে ভাগে কিছু সঞ্চয় বা সংগ্রহ করে রাখতে হয়। সে বিচারে 'দান করো' কথাটা স্থূল। বালি ছিলেন দৈত্যদের রাজা, দানের জন্যে প্রসিদ্ধি ছিল তার।

এই যে জ্যোতির্ময় সত্তা–চিতিশক্তি, ইনি হলেন বিশ্বের এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। 'সৎ' যখন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পায় তখনই তা হয় 'সত্য। পরমপুরুষ ছাড়া আর কোন সত্তাই সত্যের স্বীকৃতি পায় না। তিনি ছাড়া আর সব সত্তাই চলমান, বিবর্তনশীল,

দ্রুত পরিবর্তনশীল আলেখ্যচিত্র। সবাই ক্ষণিক সত্তা– স্থায়ী কেউ নয়।

তাহলে এই জগতে আমরা এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখতে পাই কেন? এত রূপ রস–শব্দ–বর্ণের বৈচিত্র্য কেন? পরম সত্য যেখানে এক, পরম চিতিসত্তা যেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা, সেখানে এই বৈচিত্র্যময় দুনিয়াটা এল কী করে? কেনই বা আমরা বর্ণময় সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করছি?

এই যে সৃষ্টি–বৈচিত্র্যে দেখছি এর কারণ হ'ল তান্মাত্রিক বিভিন্নতা। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় বহির্জগৎ থেকে অজস্র ভিন্ন ভিন্ন তান্মাত্রিক স্পন্দন গ্রহণ করে থাকে। এই তান্মাত্রিক বিভিন্নতার দরুণই আমরা বহির্জগতের যথার্থ বর্ণ, গন্ধ পাই না। বর্ণ–গন্ধের জন্যে আমাদের তান্মাত্রিক স্পন্দনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতেই হয়। যখন এই সব তান্মাত্রিক স্পন্দন, অবস্তু রূপ জীবাত্মায় প্রত্যাহৃত হয় তখন অণুচিতিশক্তি ভূমার চিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন জীবাত্মা অনুভব করে যে জীবাত্মা–পরমাত্মায় কোন ভেদ নেই–জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই ধাতু, একই উপাদান দিয়ে গড়া। সারা সৃষ্টি একটি মাত্র ধাতু দিয়ে তৈরী আর তা হ'ল চিতিশক্তি।

(পটনা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৮

জীব শিব হয়

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।",

এখানে বলা হয়েছে, বিশ্বস্রষ্টা নানান কিছুর মাধ্যমে লীলাখেলা করে চলেছেন, নিজেকে নানা ভাবে অভিব্যক্ত করে চলেছেন। এই যে মাধ্যমগুলো এরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। দার্শনিক ভাষায় সংস্কৃতে 'সূক্ষ্ম' বলি তাকে যাকে মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য মাধ্যমের সাহায্য না নিয়ে ধরতে পারে না। আর অতি সূক্ষ্ম বলি তাকে যাকে মনও ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় না। 'কলিলস্য মধ্যে' মানে স্থূল বা সূক্ষ্ম সংরচনা বা কাঠামোর মধ্যে। 'বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্' মানে এই বিশ্বের স্রষ্টা নানান রূপাধারে, নানান বর্ণে, নানান ভাবের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করতে চলেছেন।

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম"। এর মানে হ'ল বিশ্বের রূপকার নানান সূক্ষ্ম সংরচনার মাধ্যমে নানান রূপে, নানান বর্ণে, নানা ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করে

চলেছেন আরএই রূপ, রঙ ও ভাবগুলো কখনও কখনও এত সূক্ষ্ম যে তা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রহণ–সামর্থ্যের বাইরে, কখনও কখনও তারা আমাদের মনেরও অবধারণ ক্ষমতার বাইরে।

মানুষ স্থূল চক্ষু দিয়ে শরীরটা দেখতে পায়। চক্ষু হ'ল জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু কোন সংরচনা পাঞ্চভৌতিক না হয়ে যদি চাতুর্ভৌতিক (অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম) হয় তাহলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পক্ষে সেই ধরনের সংরচনাকে প্রত্যক্ষ করা বা অবধারণ করা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। আবার ত্রিতাত্ত্বিক জ্যোতির্দেহ (যাদের সংস্কৃতে দেবযোনি বলা হয়)–যেমন যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, প্রকৃতিলীন, বিদেহলীন –সংরচনাদের মন দিয়ে অবধারণ করা যায় না। কখনও কখনও তারা মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে গেলে মানুষ তাদের দেখতে পেতে পারে খুব অল্প সময়ের মত। তবে তা নিতান্তই ক্ষণিকের জন্যে। তাই বলা হয়েছে, বিশ্বস্রষ্টা এই সমগ্র সৃষ্টি সংরচনার মাধ্যমে নানান রূপে, নানান বর্ণে, নানান মাতৃকাধ্বনির সাহায্যে খেলা করে থাকেন। মানুষ হয়তো এই সমস্ত জিনিস জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শুণতে বা দেখতে পেতেও পারে, নাও পারে।

"বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ”। পরমপুরুষের অভিব্যক্তি কেবল এই সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম আধারের মাধ্যমেই যে হচ্ছে তাই নয়, এমনকি অজস্র স্থূল আধারের মধ্যেও তার অভিব্যক্তি হয়ে চলেছে। সেই সব অভিব্যক্তি বিশ্বগ না হয়ে বিশ্বাতীতও হতে পারে। পরমপুরুষ কেবল তো এই বিশ্বের মধ্যেই সীমিত নন। তিনি বিশ্বাতীতও বটেন।

'জ্ঞাত্বা দেবং'। এর মানে হ'ল, মানুষ যখন সেই পরমপুরুষকে জেনে ফেলে, তাঁর নিকটতম সান্নিধ্যে এসে যায়, তখন সে যাবতীয় পাশ–রিপুর ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়... "মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ”। মানুষ যখন সর্ববিধ ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় সে তখন আর জীব থাকে না। সে শিবই হয়ে যায়। "পাশৰদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ।”

(পটনা, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৪৯

সত্যের পরম নিধান

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তীতি।।”

অণু–ভূমা যা কিছুই উদ্ভূত বা সৃষ্ট হোক না কেন, সবই উৎসারিত হয়ে আসছে সেই এক আনন্দঘন সত্তা থেকে। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।” সেই আনন্দঘন সত্তা রয়েছে বলেই বিশ্বের আর সব সত্তা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। জীবিত সত্তাসমূহ যে জগতে বেঁচে থাকার, দীর্ঘ জীবন লাভের ইচ্ছা পোষণ করে তার কারণ এই আনন্দঘন সত্তার প্রেরণা ও প্রেষণা। "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তীতি”। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সবাই সেই পরম আনন্দঘন সত্তায় ফিরে যেতে চায়। তাতেই মিলে মিশে এক হয়ে যেতে চায়। এই বিশ্বে চরম ও পরম সত্য হ'ল সেই পরম আনন্দঘন সত্তা। 'সত্য' কাকে বলব? অবিকারী বা অপরিণামী সত্তা সৎ যখন চরম প্রতিষ্ঠা পায়, যখন অপরিণামিত্বের সিদ্ধিতে চরম ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাকেই বলব সত্য। তাই মানুষকে সত্যের পথ ধরে এগিয়ে চলতে হবে, সত্যকে জীবনের চরম লক্ষ্য করে নিতে হবে। এটাই একমাত্র পথ, এটাই অভীঃ হবার পথ। মানুষের এতে ভয় পাবার কিছু নেই। যজুর্বেদ বলছেন:

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনাক্রমস্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ
সত্যস্য পরমং নিধানম্।।”

সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। শুধু সংগ্রামেই নয়, প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপারে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সত্যই শেষ অবধি জয়যুক্ত হয়।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং। সত্যের জয় হয়, মিথ্যার নয়। অনৃত বা মিথ্যা কখনও জয়ী হয় না। 'সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।' অর্থাৎ দেবত্বের পথ এই সত্যের দ্বারাই প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ এই সত্যাচরণের দ্বারা মানুষের চলার পথ এত প্রশস্ত ও মসৃণ হয় যে মানুষ সেই পথ ধরে ক্রমশঃ দেবত্বে উন্নীত হয়।

পরমপুরুষের নির্দেশনা হ'ল আপ্তবাক্য আর জাগতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ বা

নির্দেশ হ'ল প্রাপ্তবাক্য। এই অর্থে পুঁথিপত্র বা মনুষ্যসৃষ্ট যাবতীয় দলিল- দস্তাবেজ হ'ল প্রাপ্তবাক্য। কড়াও ছাতার

পরমপুরুষের নিবিড় সান্নিধ্যে আসার পর যে মানুষের আশা-আকাঙক্ষার পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে বলা হয় আপ্তকাম। অতীতে সত্যের পথ ধরেই এই আপ্তকাম ঋষিরা

চলতেন বলেই তাঁরা পরম নিধান পরমপুরুষের নিৰিড় সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন।

"যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।” কথাটার মানে হ'ল, তাঁরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলেন যা হচ্ছে কিনা সত্যের পরম ধাম। তাই ঋষিরা বলতেন:

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতং সত্যে।
সত্যস্য সত্যমমৃতং সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং তং শরণং প্রপন্নঃ।।"

সেই সত্যস্বরূপ পরমপুরুষ বা আনন্দঘন সত্তার মূল বৈশিষ্ট্য কী?

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্য রূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম।।”

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম"। তিনি বিশাল.... বিরাট.... বৃহৎ.... অতি বৃহৎ। এত বৃহৎ যে মানুষ চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে পায় না। মানুষের দৃষ্টি–সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। একটা বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ থেকে অপর একটা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যন্তই

তার গ্রহণসামর্থ্য সীমিত। কিন্তু পরমপুরুষ মানুষের দৃষ্টিসামর্থ্যের অনেক অনেক বাইরে। আবার তিনি যে শুধু মানুষের দৃষ্টিশক্তির বাইরে শুধু তা–ই নয়, তিনি 'অচিন্ত্যরূপম্' অর্থাৎ তিনি অণুমানসের স্পান্দনিক গ্রহণ–সামর্থ্যেরও বাইরে। সোজা কথায় বলতে গেলে এই পরমপুরুষ মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় তথা মনের ধরা ছোঁয়ারও বাইরে। এই সত্তার দৈবী জ্যোতিঃতরঙ্গ মানুষ তার সীমিত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃশক্তি দিয়ে ধরতে পারে না।

"সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি"। অর্থাৎ সেই পরম সত্তা কেবল যে অতি বিরাট তা–ই নয়, তিনি এত ক্ষুদ্র, এত সূক্ষ্ম যে ইন্দ্রিয়গুলো তাঁকে দেখতে পায় না, অনুভব করতে পারে না। এমনকি মন তাঁকে ছুঁতেও পারে না। আগেই বলেছি, এই সত্তাটা ছোট হতে পারে কিন্তু অত্যুজ্জ্বল সত্তা। দেবযোনি প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে একবার বলেছি, এরা আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু জ্যোতির্ময়।

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ"। 'দূর' মানে এখান থেকে বহু মাইল ব্যবধানের পথ আর 'সুদূর' মানে বহু দূরের ব্যবধান। কখনো কখনো তোমরা ভাবতে পার, হয়তো তোমার কথাগুলো, তোমার অভিব্যক্তিগুলো পরমপুরুষ শুণতে বা জানতে পারছেন না। যদি এমনটা ভেবে থেকে থাক তাহলে বলব তোমার যাবতীয় প্রয়াস, তোমার মান্ত্রিক অভিব্যক্তি, তোমার যাবতীয়

মানসিক প্রয়াসশীলতা সব বিফলে যাবে। কেননা যদি ভাব যে তিনি তোমার থেকে অনেক দূরে, হতে পারে তুমি যতটা দূরত্বের কথা ভাবছ তিনি তার চেয়েও বহু গুণ দূরে রয়েছেন। হয়তো তিনি এতখানি নিকটে যে তুমি যতটা নিকট ভাবছ তার চেয়েও বহু নিকটে রয়েছেন। তিনি এত নিকট সত্তা যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

যাঁরা সাধনার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন তাঁরা অনুভব করেন পরমপুরুষ তাঁদের আমিত্বের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন। আর যখন তিনি তোমার আমিত্ব- ৰোধের মধ্যে নিহিত রয়েছেন তখন তাঁকে জানবার জন্যে এখানে সেখানে যাবার প্রয়োজন কী? যেমন কোন রাজার রাজকোষে যাবতীয় ধন-সম্পদ মজুদ থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ান, সেটা যেমন হাস্যকর তেমনি নিজের আমিত্বের মধ্যে পরমপুরুষকে খোঁজ না করে বহির্জগতে খোঁজ করা একেবারেই নিরর্থক।

তোমার ভেতরে তাঁর খোঁজ কর, আর খোঁজ কর চরম ঐকান্তিকতার সঙ্গে , পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, পরম ভক্তির সঙ্গে। তবেই সেই চিরভাস্বর সত্তা তোমার হৃদাকাশে চরম দ্যুতি নিয়ে ফুটে উঠবেন।

(পটনা, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫০

"ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ”

বেদে বলা হয়েছে, পরমপুরুষকে একমাত্র উপাস্য বলে গণ্য করা উচিত। তন্ত্রেও একই কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রের বক্তব্য হ'ল:

"তদেকং জপাম স্তদেকং স্মরামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ।।"

"তদেকং জপামঃ”। বলা হয়েছে, যখন কেউ জপক্রিয়া করবে তখন সেই জপক্রিয়ার উদ্দিষ্ট দেবতা হবেন সেই পরমপুরুষ। জপ কী? জপ হ'ল অভ্যন্তরীণ অথবা বলা যেতে পারে বাহ্য–অভ্যন্তরীণ মানসাধ্যাত্মিক প্রয়াস বা স্বগত অভিভাবন। এতে হয় কী? –না, এতে মানস বৃত্তির অভ্যন্তরীণ–বাহ্যিক গতিধারা বাইরের দিক থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের দিকে পরিচালিত হয়; তা ছাড়া

মনের চিত্তাণবিক সংরচনা অধিকতর চূর্ণীভূত হয়ে চিতিশক্তির সঙ্গে একীভূত হয়।

"তদেকং স্মরামঃ”। স্মৃতি জিনিসটা কী? "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ”। যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় কোন কিছু চৈত্তিক প্রত্যক্ষ করো বা মনে মনে কিছু ভাব তখন হয় কী? না, মনের চিত্তাণবিক সংরচনা বাহ্যিক বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করে। আর যখন কিছুকাল পরে বাইরের কোন তান্মাত্রিক স্পন্দনের সাহায্য ছাড়াই মানস শক্তির সহায়তায় মনের মধ্যে সেই আগের দেখা বা ভাবা জিনিসটাই পুনর্নির্মাণ কর, মনের ভেতরে এই পুনর্নির্মাণ পদ্ধতিকেই বলা হয় স্মৃতি। ধর, আজ থেকে দশ বছর আগে তুমি একটা যাঁড় বা অন্য একটা জন্তু দেখেছ। দশ বছর পর আজ আবার যখন মনের মধ্যে আগেকার দেখা সেই ষাঁড় বা জন্তুটা পুনরায় তৈরী করে নিলে–এই যে তৈরী করার পদ্ধতি এরই নাম স্মৃতি (memory)।

'অসম্প্রমোষঃ' মানে পূর্বানুভূত সত্তার পুনর্নির্মাণ। এতে হয় কী? তোমার অতিস্ফুট সংস্কার অনুযায়ী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তুমি এমন অনেক বাহ্যিক বস্তু সৃষ্টি কর যার মাধ্যমে তুমি তোমার মনের ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত কর। যেমন ধর, তুমি রসগোল্লা খেতে ভালবাস। তুমি মনে মনে রসগোল্লা তৈরী

করে নিতে পারতে। কিন্তু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তোমার মনের ভেতরে প্রায় রসগোল্লা তৈরী হয়ে যায়। সাধনার সময় সেই রসগোল্লা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের মধ্যে এসে যায়, তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়।

ধর, মনে মনে কেউ হয়তো ভাবছে অমুকের কাছ থেকে ঘুষ নেবে। সাধনার সময় সে কী ভাবছে–ঘুষ.... ঘুষ.... ঘুষ। তাহলে দেখ, তোমার বৃত্তিপ্রবাহ ঘুষের দিকে ছুটছে আর তাতে তোমার আধ্যাত্মিক স্মৃতিকে ব্যাহত করছে। তুমি চাইছ তোমার স্মৃতিকে বাড়াতে, কিন্তু পারছ না। সাধনাকালে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবের দরুণ ওই সব অবাঞ্ছিত চিন্তা মনের মধ্যে এসে ভীড় করছে। 'তদেকং স্মরামঃ'। এখানে বলা হচ্ছে, যদি মনের মধ্যে নিতান্তই কিছু স্মরণ করতে চাও তো কেবল সেই পরমপুরুষকেই মনে ঠাঁই দিও, অন্য কিছুকে নয়।

"তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং”। যেখানেই কোন কিছুর অস্তিত্ব সেখানেই চলমানতা, আবার যেখানে গতিময়তা সেখানে একটা লক্ষ্য, একটা গন্তব্যস্থল থাকতেই হবে। বিশ্বের সব কিছুই চলে চলেছে। মানুষও চলছে শারীরিক দিক দিয়ে, মানসিক দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে। এখানে বলা হচ্ছে, যখন তুমি চলছ ও চলবেই তখন চলার পথে একটা লক্ষ্য, একটা সমাপ্তি–বিন্দু নির্দিষ্ট করে নিও। যা তোমার ত্রিস্তরীয় চলমানতার শেষ

প্রান্তবিন্দু এখানে বলা হচ্ছে– সেই পরমপুরুষ হলেন মানুষের যাত্রাপথের পরিসমাপ্তি, অন্তিম গন্তব্যধাম। তিনিই হলেন সর্বজীবের চরম ও পরম লক্ষ্য (Supreme desideratum)।

'আলম্ব' মানে ভৌতিক আধার। মানস বিষয়ও এক প্রকার আলম্ব। মানস আলম্বের জন্যে সংস্কৃতে আর একটি পর্যায়বাচক শব্দ আছে–'আভোগ'। ভৌতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যাবতীয় সত্তাই আল বা আভোগ ব্যতিরেকে অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু পরমপুরুনের ক্ষেত্রে কোন আলম্ব বা আভোগ প্রয়োজন নেই। এই জন্যে তাঁকে বলা হয় নিরালম্ব। তিনিই জীবিত সত্তার লক্ষ্য, আলম্ব, তাঁর নিজের জন্যে কোন আজীব বা আভোগের প্রয়োজন নেই।

"ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ”। পরমপুরুষ হলেন যেন প্রকাণ্ড জাহাজ যা বিশাল ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেছে। এই 'ভব' জিনিসটা কী? পূঞ্জীভূত সংস্কারের সেই অভুক্ত অংশটুকু যার জন্যে মানুষকে পুনর্জন্ম নিতে হয়। এই 'ভব' জিনিসটা হ'ল বিপজ্জনক সমুদ্র, দুস্তর সমুদ্র। এই ভব সমুদ্র পাড়ি দিতে গেলে চাই একটা উত্তম মানের প্রকাণ্ড মজবুৎ জাহাজ। “হে পরমপুরুষ, তুমিই হলে সেই প্রকাণ্ড জাহাজ। আমরা সবাই ওই জাহাজে আশ্রয় নিতে চলেছি। আমরা সবাই এই দুস্তর ভব সমুদ্র

পাড়ি দিতে চাই।” এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়'।

(পটনা, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫১

শক্তি ও চিতিশক্তি

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।।"

মূলতঃ শক্তি (energy) এক, কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানান রূপে। তথাকথিত এই শক্তিগুলো একে অন্যে রূপান্তরিত হতে (interchangeable) পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি চুম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, চুম্বক শক্তি ধ্বনি শক্তিতে, ধ্বনি শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। লৌকিক সংস্কৃতে এই তেজস্তত্ত্বের জন্যে সংস্কৃত শব্দ হ'ল 'অগ্নি', প্রাচীন সংস্কৃতে 'ইন্দ্র'। স্রষ্টা পরমপুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন আর এই সৃষ্টি উদগত হয় মাতৃকাবর্ণ 'অ' ধ্বনি থেকে।

এই সৃষ্টির বিবর্তনধারায় এই এক শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব হয়। এখানে শক্তি মানে প্রকৃতি (Operative Principle) নয়। প্রকৃতি হ'ল এক বিশেষ ৰন্ধনী- শক্তি। এই ৰন্ধনী-শক্তির কাজের যে বিশেষ ধারা বা শৈলী এরই নাম 'স্বভাব'-ইংরেজীতে 'nature'। যাঁদের জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে-বিশেষ করে ভৌতিক ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অভাব রয়েছে-তাঁরা বলতে পারেন এই সব কিছু স্বভাবজ বা স্বাভাবিক কিন্তু ব্যাপারটা হ'ল এই যে, nature বা স্বভাব প্রকৃতির এক কর্মপদ্ধতি বিশেষ, স্বভাব কোন স্বাধীন সত্তা নয়। যখন বিশ্বপ্রকৃতি এক বিশেষ কর্মপ্রণালী অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যায় অর্থাৎ এক বিশেষ স্বভাব অনুযায়ী মানুষ প্রতিটি স্তরে এক বিশেষ ধরনের ষ্ট্যামিনা পায়, তার নাম এনার্জি। এই এনার্জির ৰীজমন্ত্র হচ্ছে 'র' ধ্বনিটি। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, এই যে এনার্জি এটা এক ধরনের সৃষ্টি, ভূমাচৈতন্যের দ্বারা এর সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সেদিন তোমাদের বলেছিলুম, এই বিশ্বে যা কিছু আছে তা সবই তিনটি মৌলিক শব্দের দ্বারা বিধৃত। এই বিশ্বের সব কিছু সেই আনন্দঘন সত্তা থেকে উৎসারিত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ-এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় এই আনন্দঘন ভাবটি

বিধৃত। যখন সেই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখন গুণ ত্রিকোণের কোন এক কৌণিক বিন্দু থেকে সৃষ্টির এষণা বহির্গত হতে থাকে। তাই নিশ্চয়ই প্রথমাবস্থায় সত্ত্বগুণই বলবৎ থাকে। অর্থাৎ সেই আনন্দঘন সত্তা থেকে তাই 'স' ধ্বনি দিয়ে সৃষ্টির শুরু আর কৌণিক বিন্দু দিয়ে যাত্রা শুরুর পর থেকে একে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় আর এগিয়ে চলার জন্যে দরকার এনার্জি। এনার্জির সমর্থন না পেলে তা সম্ভব নয়। তাই 'স' থেকে যাত্রা শুরু করে 'র'–এর দিকে এগিয়ে চলা। 'র' হ'ল এনার্জির ৰীজমন্ত্র। আর যখন তা চলতে শুরু করে তখন তার মধ্যে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বা প্রবণতা জেগে ওঠে। আর এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের বীজমন্ত্র হ'ল 'ব'। এই 'স–র–ব' মিলে 'সর্ব'। তাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের এই সব কিছুর জন্যে সংস্কৃত শব্দ হ'ল 'সর্ব'। 'স– র–ব সর্ব উচ্যতে'। সকল সত্তায় 'স–র–ব'–এর উপস্থিতির জন্যে সকল সত্তাকে বলা হয় 'সর্ব'। এই সংস্কৃত 'সর্ব' শব্দ থেকেই হিন্দী 'সব' ও মৈথিলী 'সভ' শব্দ এসেছে কিন্তু মূল শব্দটা হ'ল 'সর্ব'।

এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই অগ্নি লুকিয়ে আছে–অগ্নি অর্থাৎ 'র'।

"অগ্নিযথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।”

'ভূ' মানে ভুবন। ভুবন মানেই এমন এক অভিব্যক্তি যা পাঞ্চভৌতিক উপাদান দিয়ে তৈরী। সংস্কৃত 'ভূ' হ'ল পৃথিবী অর্থে স্বীকৃত পর্যায়বাচক শব্দগুলোর অন্যতম ভূ-ভূমি-ধরা-ধরিত্রী-গোত্র-কু-সর্বংসহা-বসুমতী-পৃথিবী- পৃথ্বী-মেদিনী-মহী প্রভৃতি। বিভিন্ন সত্তার যে বৈয়ষ্টিক সংরচনা সেই সংশ্লিষ্ট সংরচনার মধ্যে এনার্জি সত্তার সংহতি বজায় রাখে। এই যে ঘরের মধ্যেকার সিলিংফ্যান বা ৰাল্ব বা অন্যান্য আসবাবপত্র এদের মধ্যেও এনার্জি কাজ করছে, কিন্তু আমরা কি তা কখনও দেখতে পাই বা অনুভব করি? কেউ কখনো এনার্জি জিনিসটা কেমন চোখে দেখেনি বা তার অস্তিত্বও প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করেনি কিন্তু সবাই তার কাজটা বা প্রভাবটা অনুভব করে। বৈদ্যুতিক পাখাকে ঘুরতে দেখে আমরা জানতে পারি এর পেছনে এনার্জি কাজ করছে। আমরা ৰাল্ব থেকে আলোক পাই কিন্তু এনার্জি দেখতে পাই না। মোট কথা হ'ল, এনার্জি কী তা কখনও দেখা যায় না বা অনুভব করা যায় না কিন্তু নানান মাধ্যমের দ্বারা এনার্জির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বা অনুভব করা যায়।

"একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।।"

অনুরূপভাবে সেই এক চিতিশক্তিও এই এনার্জির মতই। তোমাদের প্রত্যেকের শরীরে রয়েছে প্রাণশক্তি যার সাহায্যে তোমরা কথা বলছ, নড়াচড়া করছ, মনে মনে কত কিছু

ভাবছ। যখন এই শরীর–সংরচনা থেকে কোন প্রকার `শক্তির অভিব্যক্তি ঘটবে না, লোকে বলবে ও তো মৃত। অনুরূপভাবে সেই এক চিতিশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন সত্তার মাধ্যমে তাদের বিষয়ী হয়ে কাজ করে। চিতিশক্তির এই কর্তৃভাবাত্মক অভিব্যক্তির দরুণই মানুষ নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে। পরমপুরুষের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় কিন্তু তাঁকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় না, ব্যক্ত করাও যায় না। আমরা এর বাহ্যিক প্রকাশটা প্রত্যক্ষ করি মাত্র। অনুরূপভাবে আমরা চিতিশক্তির অভিব্যক্তিগুলো দেখতে বুঝতে পারি। আত্মাকে দেখা যায় না, প্রত্যক্ষ করা যায় না, ভাবা যায় না–বৈয়ষ্টিক ভাবেও নয়, সামূহিক ভাবেও নয়।

এই যে চিতিশক্তি, প্রতিটি সংরচনার ভেতরে সে তো রয়েইছে, বাইরেও রয়েছে। এ কেবল সর্বব্যাপীই নয়, এ সংরচনার সব কিছুকে ঢেকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। তাই এর অপর নাম বিষ্ণু।

(পটনা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫২

মন ও চিতিশক্তি

"জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি চৈতন্যং যদ্ প্রকাশতে। তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্বৰন্ধেঃ প্রমুচ্যতে।।"

মানুষের মনের চারটে স্তর-জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যখন চেতন মন পুরোপুরি সচেতন ও সক্রিয় সেটা মনের জাগ্রৎ অবস্থা। আমরা সবাই এই জাগ্রৎ অবস্থায় বেশীর ভাগ সময় কাটাই। যখন চেতন মন সচেতন ও সক্রিয় নয়, কিন্তু অবচেতন মন সজাগ ও কোন কিছুর দ্রষ্টা তাকে বলি স্বপ্ন বা dream। যেখানে চেতন ও অবচেতন দুই-ই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চলে যায় তাকে বলে সুষুপ্তির অবস্থা। আর যেখানে চেতন, অবচেতন ও অচেতন-মনের এই তিন অবস্থাই নিষ্ক্রিয় থাকে ও চিতিশক্তিতে সমাহিত থাকে সেখানে তাকে মনের তুরীয়াবস্থা বলা হয়।

জাগ্রৎ অবস্থা কাকে বলে? জীবাত্মা কী? জীবের মানসপটে পরমাত্মার প্রতিফলনকে বলা হয় জীবাত্মা। যথার্থ বিচারে একমাত্র পরামাত্মাই আত্মা পদবাচ্য। জীবাত্মা হ'ল এই পরমাত্মার প্রতিফলন মাত্র। তাই প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে:

"যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং

বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীর্বিয়োগে নিরাভাসকো যঃ সঃ
নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপো হয়মাত্মা।।"

ধর, কারো একটা মুখ বা একটা ফুল–একটা লাল টুকটুকে ফুল। চারদিকে সাজানো রয়েছে কতকগুলো আর্শী। সেই একটা মুখ বা একটা লাল ফুল অতগুলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে অতগুলো ফুল বা মুখের রূপ নিয়েছে। আয়নার স্বভাব বা স্বচ্ছতার মাত্রা অনুযায়ী প্রতিফলিত মুখ বা ফুলের ছবি ফুটে উঠবে। সবগুলি প্রতিফলন ঠিক একই রকমের হবে না। প্রতিফলিত ছবিগুলো কেমন হবে তা নির্ভর করবে আয়নাগুলো স্বচ্ছতার ওপর। একটাই মুখ বিভিন্ন আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে নানান মুখের রূপ নেবে। অনুরূপভাবে পরমপুরুষ বা চিতিশক্তি বা আদিকারণ অজস্র মানসমুকুরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

সকল জীবিত সত্তার, সকল প্রাণীরই একটা করে মন আছে। সেই মন কোথাও অবিকশিত, কোথাও বিকশিত, কোথাও অতি বিকশিত। অর্থাৎ যেখানে প্রাণ আছে, যেখানে প্রতিফলন আছে সেখানে মন থাকবেই। আর যেখানে মন আছে সেখানে জীবাত্মা থাকবেই। মনের ওপর প্রতিফলিত অণুচৈতন্যই জীবাত্মা আর মূল আত্মা বা জীবের মানসপটে প্রতিফলিত তার নাম প্রত্যগাত্মা। প্রতিফলন অংশটুকুই জীবাত্মা আর মৌলিক অংশটুকু

প্রত্যগাত্মা। প্রত্যগাত্মা বস্তুতঃ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন, জীবাত্মা পরমাত্মা নয়–পরমাত্মার প্রতিফলন।

"মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং"। মুখের সামনে থেকে আয়নাগুলোকে যখন সরিয়ে নেওয়া হয় তখনও মূল মুখটা যথাপূর্বং থেকে যায়–তার কোন প্রতিফলন থাকে না। ঠিক তেমনি যখন সকল মনগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন প্রত্যগাত্মা এক অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে থেকেই যান, কিন্তু জীবাত্মা বলে কিছু থাকছে না।

"ধীর্বিয়োগে নিরাভাসকো যঃ"। অর্থাৎ মন না থাকায় পরমাত্মার প্রতিফলন ঘটতে পারছে না। "সঃ নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপো হয়মাত্মা"। তিনিই সর্বসত্তার, সর্বজীবের উপাস্য, তিনিই হলেন চরম ও পরম চিতিশক্তি।

এই একটু আগেই মনের চারটে অবস্থার কথা বললুম–জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়। তুরীয় অবস্থায় হয় কী? আত্যন্তিকী একাগ্রতার দরুণ, সর্বপ্রকার মানস বৃত্তির বিন্দুস্থীকরণের দরুণ চেতন মন পুরোপুরি সমাহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ চেতন মন বিন্দুস্থ হয়ে অবচেতনে মিশে যায়, আবার অবচেতনও বিন্দুস্থ হয়ে অচেতনে মিশে যায়। আর এই অচেতন মন স্নায়ুতন্ত্র ও স্নায়ুকোষের সাহায্য না নিয়েই পরম চিতিশক্তির

সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে। ধ্যানের সহায়তায় চেতন মন ভূমাচৈতন্যের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সেই অবস্থায় মনের সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে, মনের যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা ৰন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ মনের তিনটি অবস্থাই তখন পরম জ্ঞাতৃভাবের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় তুরীয় বা কৈবল্যাবস্থা।

'কেবল' মানে 'শুধু এক'। সেই অবস্থায় মাত্র একটি সত্তাই থাকে– পরমাত্মা। তাই এই অবস্থাটাকে বলা হয় কেবলাসিদ্ধি।

"জাগ্রৎ–স্বপ্ন–সুষুপ্ত্যাদি চৈতন্যং যদ্ প্রকাশতে"। এখানে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে হ'ল মনের ব্যক্ত অবস্থা আর তুরীয় হ'ল মনের প্রত্যাহারের চরম অবস্থা।

এই যে মনের চার অবস্থা এরা উৎসারিত হয় কোত্থেকে? না, এরা উৎসারিত হয় ভূমাচৈতন্য থেকে, পরমপুরুষ (Macrocosmic Entity, Supreme Entity) থেকে কারণ এরা হ'ল সেই পরম সত্তার প্রতিফলন।

'চৈতন্যং যদ্ প্রকাশতে'। সেই পরম চৈতন্যময় সত্তা (Supra-Paychic Entity, Supreme Cognition) মনের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অভিব্যক্তির কারণ।

তদ্ৰহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা”। সেই যে পরমপুরুষ তিনিই হলেন জীবের প্রকৃত 'আমি', শুদ্ধ 'আমি' (Pure 'T', actual 'T')। মানুষের এই যে মন যার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে জাগ্রদবস্থা–স্বপ্নাবস্থা–সুষুপ্তাবস্থার, যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে প্রতিফলিত জীবাত্মার–সে কিন্তু জীবের প্রকৃত 'আমি' নয়। মানুষ যখন এই সব মানস স্তরের সুখ–দুঃখের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে তখন সে নিত্যানন্দ বা ভূমাচৈতন্যের পারমার্থিক আনন্দের অনুভূতি পেতে পারে না। আর যখন তুমি ক্ষুদ্র 'আমি'–কেন্দ্রিক সুখ–দুঃখের অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে তখনই হবে তোমার চরম আত্মিক প্রতিষ্ঠা। সেইটাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি–এটা যথার্থ সমাধি পদবাচ্য।

"তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্বৰন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে"। অধ্যাত্মসাধক যখন অনুভব করে যে পরমপুরুষই তার সত্যিকারের 'আমি', কেবল তখনই সে যাবতীয় জাগতিক ৰন্ধন থেকে মুক্তি পায়।

(পটনা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫৩

প্রত্যাহার যোগ ও পরমাগতি

প্রাণায়ামের মত প্রত্যাহার যোগও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন জীবিত সত্তার প্রাণবায়ুর গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে পদ্ধতি তারই নাম প্রাণায়াম। **"প্রাণান্ যময়ত্যেষঃ প্রাণায়ামঃ"**। আধ্যাত্মিক সাধক এই প্রাণায়াম–পদ্ধতির দ্বারা দেহের প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রাণায়াম সম্পর্কে একটা বিশেষ কথা মনে রাখতে হবে, প্রাণায়ামের সঙ্গে বিন্দুধ্যানের সম্পর্ক রয়েছে। প্রাণায়াম অভ্যাসকালে মনকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিৰদ্ধ রাখতে হবে। **প্রাণায়ামকে যদি বিন্দু ধ্যান থেকে বিচ্যুত করে নেওয়া হয় তাতে নিজের মানস শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হবে, মন চঞ্চল হয়ে পড়বে।**

অনুরূপভাবে, প্রত্যাহার যোগের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ধারণার। 'প্রত্যাহার' শব্দের সমার্থক শব্দ হ'ল withdrawal। ধ্যান ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে, ধ্যান হ'ল কিছুটা স্থিরতামূলক, অর্থাৎ যাঁর ধ্যান করা হচ্ছে সেই উদ্দিষ্ট সত্তা স্থির..... অচঞ্চল; পক্ষান্তরে ধারণায় মনের বিষয় সরে সরে যায়। অর্থাৎ **ধারণা–ক্রিয়ার মধ্যে একটা চলমানতা রয়েছে কিন্তু ধ্যানক্রিয়ার মধ্যে কোন চলমানতা নেই।**

আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধনার প্রারম্ভিক স্তরে সাধককে বিশ্বের বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে মনকে প্রত্যাহার করতে হবে।

এখন এই বস্তুজগৎ থেকে মনের সমস্ত বৃত্তিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তার পর কী করবে? এই প্রত্যাহৃত মানস বৃত্তিগুলোকে পরিচালিত করবে কার দিকে? প্রশ্ন হ'ল, এই যে মানস বৃত্তিগুলো বাইরে থেকে তুলে নিয়ে একটা বিন্দুতে সংহত করলে কিন্তু কোন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালালে না, তাতে হবে কী? না, সেই সমস্ত প্রত্যাহৃত অথচ অপরিচালিত বৃত্তি মনের প্রশান্তিকে ব্যাহত করবে, অবচেতন ও অচেতন মনকে চঞ্চল করবে। এটা বড়ই বিপজ্জনক অবস্থা। অতীতেও এমনটি হয়েছে, ভবিষ্যতেও এমনটি হতে পারে যে, **সমর্থ গুরুর নির্দেশনা না নিয়ে যদি কোন সাধক কেবল বই পড়েই সাধনা শুরু করে দেয়, তাতে তার ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট।** তাই যখনই বাইরের জগৎ থেকে তোমার মানস বৃত্তি বা প্রবণতাকে প্রত্যাহার করে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে কোন চলমান মানস বিষয়ের দিকে তাদের পরিচালিত করে দাও। সেই চলমান বিষয়টা কী? সেটা হ'ল তোমার চিত্ত। তোমার বিষয়ীভূত 'আমি'। মনের চিত্ত অংশ গতিশীল.... চলমান।

তাহলে দেখছি, প্রত্যাহৃত মানস বৃত্তিগুলোকে চিত্তের দিকে চালাতে হবে, বাইরের বস্তুর দিকে নয়। সেক্ষেত্রে বাইরের বস্তুর দিকে মনের ছোটাটা বন্ধ হয়ে যায়, তার বদলে মানস বৃত্তিগুলোর গতি হয় মনের ভেতরের দিকে। এখানেই একটা কাজের কাজ হয়।

মনকে বাইরের বস্তু থেকে তুলে নিলুম, কিন্তু চিত্তের দিকে চালালুম না। তাতে মনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে বা হয়। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, "যচ্ছেদ বামনসি প্রাজ্ঞঃ”।

বুদ্ধিমান সাধক এই অবস্থায় কী করবেন? মনের সমস্ত প্রবণতা অভীপ্সাকে চিত্তের অভিমুখে চালিয়ে দেবেন। এখানে 'বাঙ্' বলতে মানসিক বৃত্তির বহির্মুখী গতির কথা বলা হচ্ছে। মনের বৃত্তিগুলোকে চিত্তের দিকে চালিয়ে দেবে। "প্রাজ্ঞঃ বানসি যচ্ছেদ”।

"তদ্ যচ্ছেজ্জ্ছান্তাত্মনি"। চিত্তে যখন ওই বহির্মুখী বৃত্তিগুলো সংহত হ'ল তার পরেও তো চিত্তের চলমানতা অক্ষুণ্ণ থাকছে। সে মনের পরিসীমার মধ্যেই চলাফেরা করছে, বাইরের বস্তু জগতের দিকে নয়। সে বাইরের কোন হাতীকে দেখছে না ঠিক কিন্তু মনের ভেতর তৈরী মানসিক হাতীটাকে দেখছে।

"তদ্যচ্ছেজ্ঞানমাত্মনি”। এর পরের অন্যান্য প্রত্যাহৃত বৃত্তিসহ চিত্ত অহংয়ের দিকে পরিচালিত হবে। এই অহংতত্ত্ব হবে কর্তৃ– 'আমি' যা কিন্তু বস্তুসম্পৃক্ত বিষয়ভাবের আপাতঃ বিষয়ী ভাব। এখন এই যে অহংতত্ত্ব এই চলমান অবস্থায় না থাকলেও চলমানতার সামর্থ্য পুরোমাত্রায় রয়েছে। এটা চলতে পারে। এ নিজেকে আংশিক ভাবে চিত্তে রূপান্তরিত করে নিতে পারে। এ ধরনের সম্ভাবনা এর মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে।

এই জন্যে চিত্তকে (Done 'I') অহংতত্ত্বের দিকে চালিয়ে দিতে হবে। "আমি আছি” বোধকে নয়, **"আমি করছি” বোধটা হ'ল অহংতত্ত্ব।**

"জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ”। এখন এই যে জ্ঞানাত্মা বা অহংতত্ত্ব, তার বিরাট সম্ভাবনা; তার মধ্যে রজোগুণের প্রভাব জবরদস্ত। 'এই যে আমি করছি' বোধ বা রজোগুণী শক্তি এটাও একটা বন্ধন। তাই সাধককে এই জ্ঞানাত্মা বা অহংকে মহৎতত্ত্বে টেনে তুলতে হবে। মহৎ তত্ত্বটা কী? **'আমি আছি' বোধই দার্শনিক পরিভাষায় হ'ল মহৎতত্ত্ব।**

এই মহৎতত্ত্বে গতিশীলতা নেই বললেই চলে কারণ এই মহৎতত্ত্ব হ'ল সত্ত্বগুণ সঞ্জাত। কিন্তু তোমরা জান যে সত্ত্বগুণ কোন ভাবকে কোন রূপ দিতে পারে না, সীমারেখায় রেখাঙ্কিত

করতে পারে না। তবুও সেটা একটা বন্ধন তো আর যেখানেই ৰন্ধন সেখানে ভেতরে বাইরে সংঘর্ষ। ধর, তুমি কিছু 'একটা করছ; এতে কি কোন সংঘর্ষ, চলমানতা নেই? যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন চিত্র বা আকৃতি নেই, তবুও তাতে সংঘর্ষ আছে–গতিশীলতা আছে।

বলা হচ্ছে, 'জ্ঞানাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ'। অহংতত্ত্বকে মহৎত্ত্বে বিসর্জন দিয়ে দাও। তবুও। কিছুটা ৰন্ধন থেকেই যাচ্ছে। ধর, কোন একজন ভদ্রলোক কোন অসজ্জনকে খুব কড়া ভর্ৎসনা করছেন কারণ অসজ্জন লোকটি তাঁকে অসম্মান করেছেন। এটা কি অসঙ্গত? না, না, মোটেই অসঙ্গত নয়। এই হ'ল সাত্ত্বিক ক্রোধ। ক্রোধ জিনিসটা মুখ্যতঃ তামসিক, তবে কখনো কখনো সাত্ত্বিকও হতে পারে। সংস্কৃতে একে বলে সাত্ত্বিক ক্রোধ।

'তদ্ যচ্ছেৎ শান্তাত্মনি'। এই যে বিশুদ্ধ অস্তিত্বৰোধ যেখানে সমস্ত বৃত্তিসহ চিত্ত ও পরে চিত্ত সহ অহংতত্ত্ব ও মহতত্ত্ব মিলে একীভূত হয়, এই সবকে প্রত্যাহার করে শান্তাত্মায় মিশিয়ে দিতে হয়। এই শান্তাত্মা যাবতীয় ৰন্ধনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই হ'ল জীবের পরমাগতি (Supreme Goal of human existence)।

(পটনা, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫৪

রাম ও নারায়ণ

একটা গল্প আছে। একবার হনুমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আচ্ছা হনুমান, তুমি তো বড় ভক্ত। তুমি জান যে নারায়ণ ও রামের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তবু তুমি সর্বদাই রামের নাম নাও, কদাপি ভুলেও নারায়ণের নাম নাও না। যদিও রাম ও নারায়ণ মূলগত ভাবে একই সত্তা, তবু তুমি এমনটি কর কেন?"

হ্যাঁ, নারায়ণ ও রাম তত্ত্বতঃ একই সত্তা। কেবল নামেই তফাৎ। 'নারায়ণ' একটি সংস্কৃত শব্দ। নার + অয়ন করে সন্ধিবন্ধ শব্দ হ'ল 'নারায়ণ'। সংস্কৃত 'নার' শব্দের তিনটি মানে। একটি মানে হ'ল জল দ্বিতীয় মানে হ'ল পরমা প্রকৃতি, আর তৃতীয় মানে হ'ল ভক্তি। নার দা+ড নারদ মানে যিনি জীবকূলে নার অর্থাৎ ভক্তি বিতরণ করেন। এখানে 'নারদ' শব্দের 'নার' মানে ভক্তি। 'নার' শব্দের আরও দুটো মানে বলেছি জল ও পরমা প্রকৃতি। 'অয়ন' মানে আশ্রয়। শিবায়ন মানে শিবের আশ্রয়। রামায়ণ মানে রামের যেটা আশ্রয় অর্থাৎ

এমন একখানা গ্রন্থ যাতে রামকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ‘অয়ন’ মানে আশ্রয়। নারায়ণ মানে নার অর্থাৎ পরমা প্রকৃতির আশ্রয়। এখানে পরমা প্রকৃতির আশ্রয় কে? না, পরমপুরুষ। তাই নারায়ণ মানে পরমপুরুষ– Cosmic Consciousness, Supreme Cognition |

এখন ‘রাম’ শব্দের অর্থ কী? একটি মানে হ’ল “রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন্” অর্থাৎ ‘রাম’ হলেন এমনই এক সত্তা যাকে যোগীরা তাঁদের মানসাধ্যাত্মিক আভোগ (Psycho-spiritual Pabulum) হিসেবে গ্রহণ করেন, মানসাধ্যাত্মিক আনন্দের উৎস বলে মনে করেন। এখন এই যে যোগীদের মানসাধ্যাত্মিক আনন্দের উৎস, ইনি কে? না, পরমপুরুষ। তাই ‘রাম’ মানে পরমপুরুষ বা নারায়ণ। রাম শব্দের অপর মানে হ’ল– “রতি মহীধরঃ রামঃ”। ‘রাতি’ শব্দের আদ্যক্ষর ‘রা’ আর ‘মহীধরঃ’ শব্দে প্রথম বর্ণ হ’ল ‘ম’। বিশ্বের সবচেয়ে জ্যোতিষ্মান সত্তা হ’ল রাম যিনি অপরকেও তারই মত জ্যোতিষ্মান করে তোলেন। তাঁর জ্যোতিতে অন্যান্য সত্তারাও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। চাঁদ তার দীপ্তি পেয়ে থাকে পৃথিবী থেকে। পৃথিবী জ্যোতি পেয়ে থাকে সূর্য থেকে আর সূর্য আলো পেয়ে থাকে পরমপুরুষের কাছ থেকে। তাই পরমপুরুষ হলেন এমন এক সত্তা যিনি অপরকে তাঁর মত প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। কে সেই প্রোজ্জ্বল সত্তা?

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো হয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।"

পরমপুরুষই হলেন সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় সত্তা। 'রাতি মহীধরঃ' মানে সেই পরমপুরুষ–অন্য কেউ না। 'রাম' শব্দের তৃতীয় মানে হ'ল 'রাবণস্য মরণম্ রামঃ'। 'রাবণস্য' শব্দের আদ্যক্ষর হ'ল 'রা' আর 'মরণম্' শব্দের আদ্যক্ষর হ'ল 'ম'। তাই 'রাম' মানে সেই সত্তা যার চাপে রাবণের মৃত্যু হয়। 'রাবণ' শব্দের মানে হ'ল দুষ্ট মন, অধোগামী মন যা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ, অধঃ, ঈশান, নৈঋত, অগ্নি ও বায়ু এই দশ দিকেই কাজ করে চলেছে। মানুষের যা কিছু দুষ্প্রবৃত্তি যা এই দশ দিকে ছুটে চলে তারই সামূহিক নাম রাবণ। রৌ অণ = রাবণ অর্থাৎ যার প্রবণতা হ'ল নরকের পথে চলা। এই রাবণের মৃত্যুর ৰীজ কোথায় নিহিত? এই দশানন দৈত্যের কোথায় মৃত্যু? মানুষ যখন রামের শরণ নেয় তখনই রাবণের মৃত্যু। তাই 'রাবণস্য মরণম্' মানে রাম। যে মানুষ রামের অর্থাৎ পরমপুরুষের শরণ নেয় সে অবশ্যই রাবণকে নিধন করতে পারে। তাই 'রাবণস্য মরণম্' মানে পরমপুরুষ। তাই রাম ও নারায়ণে কোন মৌল পার্থক্য নেই। তবুও "হে হনুমান, তুমি সর্বদাই কেবল রামেরই নাম নাও,

কদাপি নারায়ণের নাম নাও না। এ কেমনতর ব্যাপার"। উত্তরে হনুমান বলছেন:–

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।"

যখন সর্বাধিক আন্তরিকতা নিয়ে কোন বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাও তখন মনের যাবতীয় বৃত্তিকে একটা বিশেষ বিন্দুতে সংহত করতে হয়। আর সেই সংহত বা একীভূত বিন্দুস্থ অহংবোধকে অদ্বিতীয় সত্তার দিকে চালিয়ে দিতে হয়। তাই হনুমান বলছেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে"। 'শ্রী' শব্দের গারুঢ়ার্থ হ'ল লক্ষ্মী ধনের দেবতা এর ভাবারুঢ়ার্থ হ'ল রজোগুণী শক্তি যা প্রভূত শক্তিসম্পন্ন।

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দের দু ধরনের মানে–একটি ভাবারুঢ়ার্থ, অপরটি যোগারুঢ়ার্থ। ভাবারুঢ়ার্থ মানে ব্যুৎপত্তিগত মানে, যোগারুঢ়ার্থ মানে ব্যবহার সিদ্ধ মানে। ধর, একটা শব্দ 'পঞ্চানন'। 'পঞ্চানন' মানে পাঁচটি মুখযুক্ত সত্তা। এটি হ'ল ভাবারুঢ়ার্থ, কিন্তু মানুষ 'পঞ্চানন' শব্দ ব্যবহার করে শিবের জন্যে। এটা হ'ল যোগারুঢ়ার্থ। আবার ধর, 'নিল', 'অনিল'। 'নিল' মানে স্থির, 'নীল' মানে নীল রঙ (blue colour)। 'অনিল' মানে যা স্থির নয়, যা ছুটে চলেছে, বয়ে চলেছে। এটা

ভাবারূঢ়ার্থ। যোগারূঢ়ার্থ হবে বায়ু। বায়ু এক মুহূর্ত অচঞ্চল বা স্থির হয়ে থাকে না। তাই এর নাম 'অনিল'। এটা হ'ল যোগারূঢ়ার্থ, ভাবারূঢ়ার্থ হ'ল যা স্থির নয়।

তিনটে বর্ণ আছে শ, র, ঈ। 'শ' ধবনিটি হ'ল রজোগুণের ৰীজমন্ত্র, 'র' ধবনি 'এনার্জি' বা শক্তির বীজমন্ত্র, আর 'ঈ' হ'ল স্ত্রীলিঙ্গবাচক– "স্ত্রিয়াম্ ভীষ"। তাই যার মধ্যে রজোগুণ আছে, যার মধ্যে শক্তি বা কর্মচঞ্চলতার অভিব্যক্তি আছে, যা স্ত্রীবাচক তাই 'শ্রী'। বিশ্বের সবাই রজোগুণী কর্মদ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতে চায়। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে নামের আগে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত আছে। 'শ্রীনাথ' মানে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি অর্থাৎ নারায়ণ, জানকীনাথ মানে জানকী অর্থাৎ সীতার পতি রামচন্দ্র। 'সীতা' শব্দ আসছে 'সী' ধাতু থেকে। 'সী' মানে চর্চা করা, ট্রাক্টর বা হলাকর্ষণ দ্বারা জমিকে উর্বর করে তোলা। 'সী' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন 'সীতা' মানে উত্তমরূপে চর্চিত (well-cultivated) ভূমি অর্থাৎ যতদূর সম্ভব উর্বর করে তোলা। এখন এই যে চর্চার দ্বারা উৎকর্ষসাধন এটা আসছে কোত্থেকে? কার কাছ থেকে এই চর্চার সমর্থন বা প্রেরণা আসছে? না, পরমপুরুষের কাছ থেকে। যাই হোক, এই শ্রীনাথ বা জানকীনাথ মানে হ'ল পরমপুরুষ। তাহলে শ্রীনাথ ও জানকীনাথের মধ্যে কোন পার্থক্য

নেই। হনুমান সেটা জানেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রকার মৌলিক পার্থক্য নেই।

"তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ”। তাই মনের সমস্ত বৃত্তিকে সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার দিকে চালিয়ে দিতে হবে, কেবল নিজের ইষ্টমন্ত্রের দিকে মন রেখে। অন্য কোন দ্বিতীয় মন্ত্রের দিকে নয়। তাই হনুমান বলছেন, "এই জন্যে আমি সব সময় কেবল রামের নামই নিই–নারায়ণের নয়। এমনকি নারায়ণকে আমি জানিও না"।

তাই প্রতিটি সাধকের নিজের নিজের ইষ্টমন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। **জগতে কেবল একটি মন্ত্রই আছে, আর তা হ'ল তার নিজের ইষ্টমন্ত্র....এছাড়া আর কোন মন্ত্র নেই।**

(পটনা, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫৫

কৃষ্ণ বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন:–

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।"

কৃষ্ণ কে? তাঁর আসল পরিচিতিই বা কী? 'কৃষ্ণ' শব্দের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। সংস্কৃত 'কৃষ' ধাতু থেকে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি। 'কৃষ' ধাতুর একটি মানে হ'ল কর্ষণ করা (to plough) অপর মানে হ'ল আকর্ষণ করা (to attract)। যে সত্তা বিশ্বের সকল সত্তাকে নিজের দিকে টানছেন, আকর্ষণ করছেন তিনিই কৃষ্ণ। তাহলে কৃষ্ণ মানে বিশ্বের চক্রনাভি। 'কৃষ্ণ' শব্দের তৃতীয় অর্থটা হ'ল 'ভূ'–বাচক অর্থাৎ যে সত্তা জীবের অস্তিত্ববোধের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আছেন, তাই আমি আছি আর কৃষ্ণ না থাকলে আমিও থাকছি না। অর্থাৎ কৃষ্ণের অস্তিত্বের ওপরই আমার অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

তোমরা জান, প্রতিটি সত্তার জন্যে এক একটি ৰীজমন্ত্র আছে। অর্থাৎ প্রতিটি সত্তা বিশ্বে এক এক ধরনের স্পন্দন সৃষ্টি করে থাকে আর সেই বিশেষ ধরনের স্পন্দনটা হ'ল একটা ৰীজমন্ত্র (acoustic root)। সংস্কৃতে একে বলে ৰীজমন্ত্র। কৃষ্ণের ৰীজমন্ত্র হচ্ছে ~~'কৢং'~~ ক্লৃং (klrm') = ক + ৯ + অনুস্বার। কৃষ্ণের জন্যে ~~'কৢ~~ ক্লৃং বীজমন্ত্র হবার হেতুটা কী? 'ক' হচ্ছে কার্যব্রহ্মের বীজমন্ত্র। পরমপুরুষ তাঁর দিব্যদেহ থেকে এই পরিদৃশ্যমান জগৎখানি সৃষ্টি করেন। তাই আমি বলে থাকি

বিশ্বের প্রতিটি সত্তার অস্তিত্বই হ'ল দৈবী অস্তিত্ব। প্রতিটি ছেলে, প্রতিটি মেয়ে, প্রতিটি জীবিত সত্তাই পরম দৈবী সত্তার এক একটি অবতার। তাই কেউই ঘৃণ্য নয়, উপেক্ষণীয় নয়। সবাই পরমপিতার সন্তান।

পরমপুরুষ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করেন, সেই অবস্থার স্রষ্টা হিসেবে তিনিই হলেন কারণ ব্রহ্ম কারণ তিনিই তো সৃষ্টির মূল কারণ। তিনিই কারণ সত্তা আর তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্ব হ'ল কার্যব্রহ্ম কারণ তিনিই কার্যস্বরূপ। কারণ ব্রহ্মের বীজমন্ত্র হ'ল 'ওঁ' আর কার্যব্রহ্মের বীজমন্ত্র হ'ল ক। তাই সংস্কৃত বর্ণমালায় 'ক' হ'ল আদি ব্যঞ্জন। আর্য–ভারতীয় বর্ণমালায় 'ক'–কে ব্যঞ্জনের তালিকায় প্রথমেই রাখা হয়েছে। তার কারণ 'ক' ধ্বনিটি হ'ল সৃষ্ট বিশ্ব অর্থাৎ কার্যব্রহ্মের বীজমন্ত্র।

সংস্কৃত 'ক' শব্দের একাধিক অর্থ। 'ক' মানে বর্ণমালার আদি ব্যঞ্জন। 'ক' শব্দের অপর মানে জল যার পর্যায়বাচক অন্যান্য শব্দ হচ্ছে নীরম, তোয়ম্, উদকম্, পানীয়ম্, কম্বলম্ ইত্যাদি। 'ক' মানে পেলুম জল। সেদিন বলেছিলুম, যে ভূখণ্ড জল দিয়ে ঘেরা বা ঢাকা তার নাম 'কচ্ছ' (ক + ছদ + ড = কচ্ছ)। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের একটি অঞ্চলের নাম কচ্ছ। 'ক' শব্দের তৃতীয় মানে কার্যব্রহ্ম অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। "কৃষ্ণ” শব্দের ৰীজমন্ত্র হ'ল 'কৃং'। প্রথম বর্ণ হ'ল 'ক' কারণ

এই 'ক'-ই এই ব্যক্ত জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভালবাসে। তাই ৰীজমন্ত্রের প্রথম অক্ষর হ'ল 'ক'। এখন এই কৃষ্ণের অবস্থিতিটা কোথায়-ব্যোমতত্ত্বে, না অপতত্ত্বে, না তেজস্তত্ত্বে? না, তিনি সমস্ত জীবিত সত্তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন। সেই হিসেবে তিনি ভূতত্ত্ব বা ক্ষিতিতত্ত্বের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছেন। এই ক্ষিতিতত্ত্বের ৰীজমন্ত্র হ'ল 'ল'। এই 'ক'-কে যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন ও 'ল' অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বে যিনি লুকিয়ে রয়েছেন তিনি 'কুং'। কৃষ্ণ হলেন এই ব্যক্ত জগতের ঈশান.... পরম প্রভু।

কৃষ্ণ বলছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে”। অর্থাৎ এই বিশ্বে আমরা যা কিছু স্পর্শ করি, দেখি তা সবেরই স্রষ্টা হলেন কৃষ্ণ। মানুষ তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা অনুযায়ী, মানস প্রবণতা অনুযায়ী পরমপুরুষের কাছ থেকে যা চায় তা সাধারণতঃ পেয়েও যায়। মানুষ তাঁর কাছ থেকে যে জিনিসটা প্রার্থনা করে থাকে তিনি তা যোগান দেন। তাই কৃষ্ণ বলছেন, যে যে রকম বাসনা-কামনা নিয়ে আমার কাছে যা চাইবে আমি তার যোগান দিয়ে থাকি। আমি সেই ভাবে তার মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকি। কেউ যদি তাঁর কাছ থেকে ধনদৌলত চেয়ে থাকে সে হয়তো তা পেয়েও যাবে কিন্তু সে পরমপুরুষকে পাবে না। কারণ সে তো ধনদৌলতই চাইছে, পরমপুরুষকে তো চাইছে না। তেমনি কেউ যদি পরমপুরুষের কাছ থেকে যশঃ-প্রতিপত্তি চায় সে তা পেলেও পেতে পারে, কিন্তু পরমপুরুষকে পায় না কারণ সে

যশঃ–প্রতিপত্তি চাইছে, পরমপুরুষকে নয়। মানুষ হয়তো চাইল যে পরমপুরুষ তার শত্রুর নিধন করুন। এখন মানুষ যদি ধর্মপথে থাকে অর্থাৎ তার দাবীদাওয়াগুলি যদি ধর্মসংগত হয় পরমপুরুষ হয়তো তার শত্রু নিধন করবেন। কিন্তু সে পরমপুরুষকে পাবে না কারণ পরমপুরুষকে তো সে চায় নি। ঠিক তেমনি মানুষ যদি পরমপুরুষের কাছ থেকে মুক্তি–মোক্ষ চায় তাহলে যদি সে মুক্তি–মোক্ষ লাভের উপযুক্ত পাত্র

বিবেচিত হয় তবে তা সে পেয়ে যাবে, কিন্তু পরমপুরুষকে পাবে না কারণ সে তো আর পরমপুরুষকে চাইছে না।

কাজেই যে সাধক বুদ্ধিমান সে বলবে, "হে পরমপুরুষ, আমি তোমাকে চাই–অন্য কিছু নয়, অন্য কাউকে নয়। যদি বলো আমি কেন তোমাকে চাই তাহলে বলব তুমি আমাকে আনন্দ দেবে এই জন্যে আমি তোমায় চাইছি না, তোমার উপস্থিতি আমাকে তোমার সেবা করবার সুযোগ দেবে বলে চাইছি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি তোমাকে আনন্দ দেবোর সুযোগটা নিতে চাই। তোমায় আনন্দ দিয়ে আমার আনন্দ। আমি নিজে আনন্দ পাবার জন্যে চেষ্টা করছি না। তাই বুদ্ধিমান আধ্যাত্মিক সাধক বলবেন–আমি তোমার কাছ থেকে কোন স্থূল পাঞ্চভৌতিক জিনিস চাই না, আমি শুধু তোমাকে চাই।

রামায়ণে একটা গল্প আছে। এটা নিছক গল্প—একটা বিশেষ লোকশিক্ষার গল্প। একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে মিথিলার দিকে যাচ্ছিলেন। গঙ্গা নদীর অপর পারে গিয়ে মাঝি নৌকাটা ঘাটে ভিড়াল। দেখলে—নৌকাটা আর কাঠের নেই, সেটা সোণা হয়ে গেছে। মাঝি ভাবলে রাম নামের ওই ছোট্ট ছেলেটি নিশ্চয় সাধারণ বালক নয়। সে ভাবলে এই অসাধারণ বালকেরই অলৌকিক পাদস্পর্শে কাঠের নৌকা সোণার নৌকায় রূপান্তরিত হয়েছে। তখন মাঝির স্ত্রী বাড়ী থেকে যত কাঠের আসবাবপত্র নিয়ে এসে রামচন্দ্রের চরণপ্রান্তে এনে জড় করলে। সে ঘর থেকে এক একটা—কাঠের জিনিসকে নিয়ে এসে রামচন্দ্রের পায়ে স্পর্শ করিয়ে সোনায় পরিণত করে নিলে। তাই দেখে মাঝি তার স্ত্রীকে বললে—দেখো, তুমি কি বোকা মেয়েমানুষ, কী করতে হয় সে আক্কেলটাই তোমার নেই। তোমার বাস্তব বুদ্ধির বড্ড অভাব। তুমি দেখছ রামচন্দ্রের ওই চরণ দুটির কী বিরাট গুণ। যদি তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে থাকো, যদি ঘটে তোমার বুদ্ধি থাকে তাহলে ওই চরণযুগলকেই বাড়ীতে নিয়ে যাও আর সব কিছুকে সেই শ্রীচরণে ছুইয়ে সোণায় পরিণত করে নাও। এইটাই হ'ল সিদ্ধির গুপ্ত রহস্য।

তাই বুদ্ধিমান সাধক কী করবেন? তিনি বলবেন, হে পরমপুরুষ, আমি তোমার কাছ থেকে কোন কিছুই চাই না। যেহেতু তুমিই সব কিছুর উৎস, তাই আমি তোমাকেই চাই। কিন্তু কী জন্যে? না, তোমার সেবা করবার জন্যে। কেন সেবা করবার জন্যে? না, সেবার মাধ্যমে নিজের আনন্দ পাবার জন্যে নয়, পরমপুরুষকে আনন্দ দেবার জন্যে। যে পরমপুরুষকে আনন্দ দিতে চায় তাকে সংস্কৃতে বলে 'গোপঃ'। "গোপায়তে যঃ সঃ গোপঃ”। অন্যকে আনন্দ দেওয়া যার ব্রত সে-ই গোপ, যারা গোরু চরায় তারা ঠিক গোপ নয়। “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্”। আমার কাছ থেকে যে যা চায় আমি তাকে তাই দিয়ে থাকি। এটা আমার কর্তব্য। তোমার প্রয়োজন মত, তোমার মানসবৃত্তি অনুযায়ী তুমি চাইতে পার।

"মম বানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ”। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একট কথা মনে রাখবে যে আমি মানুষের জন্যে যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি মানুষকে শেষ পর্যন্ত সেই পথেই চলতে হবে। এর কোন ব্যতিক্রম বা অন্যথা হবে না। এই পথটাই হ'ল প্রতিসঞ্চর ধারা। কোন মানুষই এই প্রতিসঞ্চর ধারা পথকে এড়িয়ে চলতে পারে না। মানুষকে আমার চারদিকেই ঘুরতে হবে। আর আমার থেকে মানুষের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য মানুষের পক্ষে কম-বেশী হতে পারে। কারো দৈর্ঘ্য বেশী, কারো বা কম। কিন্তু দৈর্ঘ্য কম বা

বেশী যাই হোক, একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের মধ্যে মানুষকে পরমপুরুষের চারদিকে ঘুরে চলতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

আণবিক সংরচনায় আমরা লক্ষ্য করি, বিদ্যুতণুরা তাদের নিউক্লিয়াস বা চক্রনাভির চারিদিকে ঘুরে চলেছে। অনুরূপ ভাবে, এই বিশ্বসংসারে সৃষ্ট সকল সত্তাকেই সংরচনার চক্রনাভির চারদিকে ঘুরে চলতে হবে। কৃষ্ণ হলেন বিশ্বের চক্রনাভি আর সব চেতন সত্তাই ওই বিদ্যুতণুদের মত তাঁর চারপাশে ঘুরে চলেছে।

(পটনা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫৬

সৎসঙ্গে দিন কাটাবে

মানুষের জীবনচর্যায় করণীয়–অকরণীয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্।।"

"ত্যজ দুর্জনসংসর্গং”। দুর্জন মানুষের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্জন কে? যে অন্যকে বিপথগামী করে, অসৎ বুদ্ধি যোগায় সে-ই 'দুর্জন'। এখন ধর, কোন একজন বিশেষ মানুষ। সে হয়তো সকলের পক্ষে দুর্জন নাও হতে পারে। ধর 'ক' 'খ'-এর পক্ষে দুর্জন, কিন্তু 'গ' এর পক্ষে দুর্জন নাও হতে পারে।

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ, প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে দোষগুণ দুই-ই আছে। ধর, 'ক' লোকটা 'খ' লোকটার কাছে দুর্জন। ধর, 'ক'-এর গুণের মাত্রা ২০ ভাগ, দোষের মাত্রা ২৫ ভাগ। তাহলে তার মধ্যে দোষের মাত্রাগুণের মাত্রাকে ৫ ভাগ বেশী ছাড়িয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে 'ক' অবশ্যই 'খ' এর পক্ষে দুর্জন। আবার ধর 'খ' লোকটার মধ্যে গুণ ১৫ ভাগ, দোষ ১৩ ভাগ। তার মধ্যে গুণের মাত্রা ২ ভাগ বেশী। লোকটা অবশ্যই ভাল। কিন্তু তার মধ্যে ভাল গুণের মাত্রা ২ ভাগ, আর 'ক' এর মধ্যে অবগুণের মাত্রা ৫। সেক্ষেত্রে দোষের ভাগটার দিকেই পাল্লা ভারী। 'ক'-এর সংস্পর্শে এসে 'খ'-এর অবনতির সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু ধর, 'গ'-এর মধ্যে গুণের পরিমাণ ৩০ ভাগ, দোষের পরিমাণ ১৫ ভাগ। তাহলে গুণের দিকে পাল্লা ভারী ১৫ ভাগ। 'ক'-এর মধ্যে দোষ মাত্র ৫ ভাগ, 'গ'-এর মধ্যে গুণের পরিমাণ ১৫ ভাগ। সেক্ষেত্রে 'ক' 'গ' এর সংস্পর্শে এলে 'ক'-এর তাতে উন্নতিই হবে। সেক্ষেত্রে 'গ' 'ক' এর পক্ষে দুর্জন নয়। তাই সে চাইলে 'ক'-কে প্রগতিতে সাহায্য করতে পারে।

আর এই জিনিসটা একেবারেই স্থায়ী নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্যও হতে পারে। কাজেই 'দুর্জন' শব্দটা একান্তই আপেক্ষিক শব্দ। "ত্যজ দুর্জনসংসর্গং”– তোমার পক্ষে যে বা যারা দুর্জন তুমি অবশ্যই তার বা তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলবে। যাদের গড়পড়তা দোষের মাত্রা তোমার গড়পড়তা গুণের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে। তাহলে তুমি করবেটা কী? দুর্জনের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, "ভজ সাধুসমাগমম্”। সৎ লোকেদের সাধু মানুষদের সঙ্গ কামনা করবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে 'সাধু' কে? 'সাধু' শব্দের পরিভাষা হচ্ছে:

"প্রাণা যথাত্মনোহভীষ্টাঃ ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ।।”

গেরুয়া বস্ত্র পরলেই মানুষ সাধু হয় না। মানুষ সাধু হয় অন্তর–সম্পদের দৌলতেই। মানুষকে সাধু হতে হবে মনে প্রাণে। হয়তো বাইরে গেরুয়া বসন থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় বিধি অনুযায়ী যাঁদের 'সাধু' বলা হত বা হয় তাঁরা সাধারণতঃ পুরোপুরি শ্বেত বস্ত্রই পরিধান

করতেন, আর সন্ন্যাসীরা পরতেন পুরোপুরি গেরুয়া বস্ত্র। আরও প্রচলিত নিয়ম ছিল বা আছে এই যে সাধুরা নামের শেষে ব্যবহার করতেন 'দাস' পদবী। যেমন গোবর্দ্ধন দাস, যমুনা দাস, হরিদাস ইত্যাদি। নামের শেষে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করাই রীবাজ। আর যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা নামের শেষে ব্যবহার করতেন বা করেন 'আনন্দ' শব্দটা–যেমন বিবেকানন্দ, পরমানন্দ ইত্যাদি। সাধু ও সন্ন্যাসীতে এই হ'ল পার্থক্য। আনন্দমার্গে ত্যাগব্রতী কর্মীরা সন্ন্যাসী বলে পরিচিত। মার্গের অবধূতরা হলেন সন্ন্যাসী।

"ভজ সাধুসমাগমম্”। সাধু পুরুষেরা সৎ বা ধার্মিক লোকের সাহচর্য কামনা করবে। ইতোপূর্বে 'সাধু' শব্দের ব্যাখ্যা করা হ'ল। সংক্ষেপে বলব যিনি অপরকে জীবনের সকল স্তরে উন্নীত হবার পথ নির্দেশনা দেন তিনিই সাধু। অর্থাৎ যিনি মানুষকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সহায়তা করেন তিনিই সাধু। যাঁরই মধ্যে অবগুণের তুলনায় গুণের ভাগ বেশী দেখবে তিনিই তোমার পক্ষে সাধু। দুর্জন প্রসঙ্গে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাধু প্রসঙ্গে ঠিক তার উল্টো ব্যাখ্যা হবে। ধর, তোমার মধ্যে গুণের ভাগ ৪৫, অন্য একজনের ৬০, তাহলে ৬০ ভাগ গুণযুক্ত মানুষটি হলেন তোমার কাছে সাধু। তাই 'সাধু' শব্দটাও আপেক্ষিতা গুণযুক্ত

শব্দ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত এই সাধুসঙ্গে অতিবাহিত করার চেষ্টা করো।

"কুরু পুণ্যম্ অহোরাত্রম্”। দিন–রাত পুণ্যার্জনে তৎপর থাকবে। 'অহোরাত্র' মানে চবিবশ ঘন্টা–সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী অহোরাত্র মানে মধ্য রাত্রি থেকে পরের মধ্য রাত্রি পর্যন্ত; প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল। ভারতের হিসাব অনুযায়ী আজকের সূর্যোদয় থেকে কালকের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে বলব একদিন। পাশ্চাত্ত্য হিসেব মত আজকের মধ্যরাত্রি থেকে কালকের মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সময়কে বলব একদিন। তাই পাশ্চাত্ত্য পঞ্জিকায় মধ্যরাত্রির পরই তারিখ পাল্টে যায়, ভারতীয় তারিখ পাল্টায় সূর্যোদয়ের পর। এটাই হ'ল স্বীকৃত রীতি। শুধু অহঃ বা দিন বললে বোঝায় বার ঘন্টা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু। আর রাত্রি বলতে বোঝায় সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কালটুকু বা রাতের সময়টুকু।

মানুষ পুণ্য কর্ম করবে দিনে রাতে সব সময়–সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। বলা হয়ছে "কুরু পুণ্যম্”। 'পুণ্য' বলতে ঠিক কী বোঝায়?

"অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।

পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।।"

মহর্ষি বেদব্যাস অনেকগুলো পুরাণ রচনা করেন। তিনি বলেছেন, যখনই মানুষ কোন ভাল কাজ করে তখনই সে পুণ্যার্জন করে। আর যখন সে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করছে তার মানে সে পাপ করছে। পুণ্য কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রেখো–সব সময়, ২৪ ঘণ্টা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, আবার সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ রাত্রিতে ঘুমোতে ঘুমোতে কী করে পুণ্য কর্ম করতে পারে? উত্তর হ'ল, মানুষ যদি জাগ্রদবস্থায় পুণ্য কর্ম করে তাহলে নিদ্রিতাবস্থায়ও তার একটা প্রভাব পড়ে। অভ্যন্তরীণ শান্তির এক স্নিগ্ধ প্রভাব, কল্যাণ কর্মের একটা প্রশান্তির ভাব মানুষের দেহ–মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নিদ্রিতাবস্থায় মানুষ পুণ্য কর্মে রত থাকতে পারে। এই ভাবে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টাই পুণ্য কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারে।

সংস্কৃতে সাহিত্য জগৎকে মুখ্যতঃ চারটে ভাগে ভাগ করা যায়–কাব্য, ইতিকথা, ইতিহাস ও পুরাণ। কাব্যের সংজ্ঞা হ'ল–"বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্"। কোন গল্প বা কাহিনীকে সহজ সরস ভাবে বর্ণনা করা হলে সেটাই কাব্য। আর ইতিহাস অতীতের ঘটনাপুঞ্জের যথাযথ পঞ্জীকরণ, অতীতে যেমনটি

ঘটেছে তারই হুবহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা। ইতিহাস হ'ল ইতিকথার সেই অংশটুকু যার প্রভূত শিক্ষাগত মূল্য আছে, যা মানুষের প্রগতির পথে চলার সহায়ক। 'ইতিকথা'র ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল (History), ফারসীতে 'এস্তোয়ার' (Histoire), 'ইতিহাস' শব্দের কোন যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। **আর পুরাণ হ'ল নিছক গল্প, বাস্তব ঘটনাও নয়, সত্যিকারের বাস্তবানুগ ঘটনার পঞ্জীকরণও নয়।** তবে পুরাণ গল্প হলেও কিছুটা শিক্ষাগত মূল্য আছে তার। মানুষের শারীরিক, মানসিক ও –আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কিছুটা সাহায্য অবশ্যই করে। এই বিচারে রামায়ণ হ'ল পুরাণ, মহাভারত ইতিহাস, আর স্কুল–কলেজে ইতিহাস নাম দিয়ে যা পড়ানো হয় তা হ'ল ইতিকথা। স্কুল–কলেজে আজকাল যা পড়ানো হয় তা আর যাই হোক, ইতিহাস নয়।

এইমাত্র বললুম যে পুরাণ হ'ল গল্প যার শিক্ষাগত মূল্য অবশ্যই আছে। মহর্ষি বেদব্যাস আঠার খানা পুরাণ লিখেছেন। এই পুরাণের মূল ভাবার্থ কী? কেনই বা তিনি এত অধিক সংখ্যক পুরাণ লিখতে গেলেন? তাঁর অভিপ্রায় ছিল পৃথিবীর মানুষকে এটা বোঝানো যে মানুষের সার্বিক প্রগতিতে সহায়তা করাই পুণ্য আর মানুষকে জীবনপথে অধোগামী করা, ভুল পথে পরিচালিত করাই হ'ল পাপ। এখানে 'পুণ্য' শব্দের ব্যবহার করা

হয়েছে। মানুষকে পুণ্য কর্মে রত থাকতে হবে। মানুষকে সাহায্য করতে হবে, আর তা করতে হবে সদা–সর্বদাই চব্বিশ ঘণ্টাই।

'স্মর নিত্যমনিত্যতাম্”। মানুষের সর্বদাই মনে রাখা উচিত, সে বাস করছে একটা সদা পরিবর্তনশীল জগতে...। বিশ্বের কোন দৃশ্য, কোন ছবি, কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়। শাশ্বত নয়। আর যা আছে কাল তা থাকবে না, অর্থাৎ সব কিছুই পালটে যাবে, সব কিছুই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে। মানুষকে সেই বিবর্তিত পরিবর্তিত নোতুন অবস্থা বা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হবে।

(পটনা, ২৭শে সেপ্টেম্বর, '৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫৭

অণু ও ভূমা

প্রশ্ন হ'ল, অণু ও ভূমার মধ্যে মূলগত পার্থক্যটা কোথায়? বলা হয়েছে:

"তয়োবিরোধো হয়মুপাধিকল্পিতো ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষ।
ঈশাদ্যমায়া মহদাদিকারণং জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোষম্।।”

বলা হচ্ছে, এদের উভয়ের মৌল পার্থক্যটাই হ'ল গুণগত। তবে এই যে গুণগত বিশেষণের তারতম্য এটা কি শাশ্বত নয়? বরং এটা সাময়িক অস্থায়ী। অর্থাৎ আজকে যে পার্থক্যটা চোখে পড়ছে পরবর্ত্তীকালে তা নাও থাকতে পারে।

"ঈশাদ্যমায়া মহদাদিকারণম্”। এই যে গুণগত ভেদ এটা সাময়িক। আজ যা আছে কাল তা নাও থাকতে পারে। এও বলা হয়েছে, 'পাশৰদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ'। মানুষ যতদিন পাশৰদ্ধ ততদিন সে জীব (microcosm) আর যখন সে পাশের ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন সে আর ৰদ্ধ জীব থাকছে না, সে জীবত্বের ৰন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শিবের সঙ্গে মিলেমিশে শিবই হয়ে যাচ্ছে।

"ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষ"। পুরুষ সত্তার ওপর প্রকৃতির প্রভাবের দরুণ, প্রাকৃত ৰন্ধনী শক্তির প্রভাবের দরুণ আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পাচ্ছি, আমরা ভাগজগৎকে পাচ্ছি, আবার ভূমা–মানসের অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলোকেও পাচ্ছি।

"জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোষম্"। জৈবী সত্তা পঞ্চকোষাত্মিকা। ছোট্ট মানব দেহখানি আর তার স্থূল মন, কামময়-কোষ, মনোময় কোষ, অতিমানস কোষ ও অন্যান্য কোষসমূহ নিয়েই তার জৈবী অস্তিত্ব। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে অণুজীবের সংস্কার সঞ্জাত এই ছোট্ট মানব শরীর ও নানান স্তরসমন্বিত এই সীমিত মানস শরীর নিয়ে মানব অস্তিত্ব। এখানেই অণু ও ভূমার মধ্যেকার মৌল পার্থক্য। অর্থাৎ একটা গুণগত ভাবে ভূমা... অপরটা গুণগত ভাবেই অণু।

এবার অণুর মৌল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। যার যে ধরনের মনেগত ইচ্ছা তদনুযায়ী সে ফল পায়। যে লোকটা অত্যন্ত পেটুক, কেবল খাই-খাই রব, হতে পারে যে মৃত্যুর পর শূকরদেহ নিয়ে জন্মাল। যে মনে মনে হরিণের মত কেবল ছোটাছুটি দৌড়ঝাঁপ করতে চায়, পর জন্মে সে হয়তো হরিণ হয়েই জন্মাল। এও অসম্ভব কিছু নয়।

ভূমামানসের জগৎ অত্যন্ত বৃহৎ যাকে সাধারণতঃ আমরা বিশ্ব বা universe বলে থাকি। আর অণুর জগৎ হ'ল এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটা আর এই প্রপাঞ্চিক দেহটা তৈরী হয়েছে মানুষের নিজের অর্জিত সংস্কারানুযায়ী, অতীতের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে। হয়তো কেউ এককালে হরিণের

মত দ্রুত ছুটতে চেয়েছিল। তাই সে মরণের পরে হরিণের দেহ পেল। অণু ও ভূমার মধ্যে এই হ'ল সূক্ষ্ম পার্থক্যের সীমারেখা।

এক্ষেত্রে অণুর করণীয় কী? বলা হয়েছেঃ

"এতাবুপাধি পরঃ জীবয়োস্তয়োঃ
সম্যগ্ নিরাসেন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য
খেটকস্তয়োরপোহেন ভটো না রাজা।।"

এখন এই পরমপুরুষ থেকে যদি গুণগুলো সরিয়ে ফেলা হয়, আবার অণু সত্তা থেকে যদি গুণগুলো সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকবে না। সেক্ষেত্রে জীব ও শিব এক হয়ে যাবে। কোন পার্থক্য থাকবে না। বলা হয়েছে 'এতাবুপাধি পর জীবয়োস্তয়োঃ'। বলা হচ্ছে, পর থেকে (এখানে 'পর' মানে পরমপুরুষ) গুণগুলো ও জীব থেকে তার জৈব গুণগুলো দূর করে দিলে সেক্ষেত্রে পরও থাকবে না, জীবও থাকবে না। পরমপুরুষও থাকছেন না, জীবাত্মাও থাকছেন না। দুয়ে মিলে এক হয়ে যাবে।

ধর, একজন মানুষ। তারসঙ্গে একটা রাজ্য যুক্ত হ'ল। রাজ্য জিনিসটা একটা গুণগত ব্যাপার। সেক্ষেত্রে মানুষটার

পরিচিতি দিয়ে বলব সে যে এক রাজা কারণ মানুষটার সঙ্গে রাজ্যরূপী একটা গুণ যুক্ত হয়েছে। আবার ধর আর একটা লোক। তার হাতে রয়েছে একটা মুদার। তাকে বলব রেসলার। ওই গদারূপী গুণটার জন্যে সে পালোয়ান। এক যদি প্রথম মানুষটার কাছ থেকে রাজ্যরূপী গুণটা, আর দ্বিতীয় মানুষটার কাছ থেকে মুদারটা কেড়ে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকছে না।

অনুরূপভাবে পর সত্তা যদি উপাধিরহিত হয় আর জীবও যদি উপাধিরহিত হয়, সেক্ষেত্রে উভয়েই হবে পরম শিব। সাধনা জিনিসটা তাহলে কী? না, মানুষে মানুষে এই যে গুণগত ৰন্ধন এই গুণগত ৰন্ধনকে দূর করার প্রয়াসই হ'ল সাধনা। এই হ'ল আধ্যাত্মিক সাধনা.... ধর্মাচরণ।

(পটনা, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৫৮

চিতিশক্তির ভূমিকা

চিতিশক্তি হ'ল চরম ও পরম জ্ঞাতৃশক্তি (দর্শনের পরিভাষায় বলে পরমপুরুষ)। পরমপুরুষ ব্যতীত আর সব কিছুই তাঁর মনের বিষয়। পরমপুরুষের কাছে গোপনীয় বলে কিছু নেই। তিনি জানেন না বা দেখেন না এমন কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না।

পরমপুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে তুমি কিছুই করতে পার না। এমনকি লুকিয়ে তাঁকে তুমি কোন কিছু চিন্তাও করতে পার না।

তোমরা জান, এই যে আধ্যাত্মিক সাধনা সেটা হচ্ছে কী? না, Electronic imperfection থেকে Nuclear perfection লাভ। এই বিশ্বের অণু–পরমাণু–এ্যসরেণু সব কিছুই তাঁর চারদিকে ঘুরে চলেছে। পরমপুরুষের কাছে ক্ষুদ্র–বৃহৎ সবাই সমান। প্রকাণ্ড ঐরাবতই হোক অথবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকাই হোক পরমপুরুষের কাছে কোন ভেদ নেই। সবাই, সব কিছুই তাঁর স্নেহের সন্তান। "সম পুষিণা সম মশকেন সম নাগেন সম এভিস্ত্রিভিলোকৈঃ।” "সম পুষিণা”। একটা ছোট কীটকে দেখিয়ে তুমি বলতে পার এটা তো একটা ক্ষুদ্র নগণ্য কীট মাত্র। 'পুষিণ' মানে উইপোকা। 'সম মশকেন'–মশক বা মশা একটি নগণ্য জীব। কিন্তু সেই তুচ্ছ মশার প্রতিও পরমপুরুষের স্নেহ বা ভালবাসার কোন অংশে কম নয়। তার জন্যেও সমান

ভালবাসা–মমতা রয়েছে। 'সম নাগেন'। সংস্কৃতে 'নাগ' শব্দের তিনটি মানে। একটা মানে ৰড় সাপ (python), আর একটি মানে ঐরাবত (mammoth), আর একটি মানে পর্বত সম্বন্ধীয় (pertaining to hills)। এখানে 'নাগ' অর্থে ঐরাবতের কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে ঐরাবতের প্রতিও পরমপুরুষ সমান স্নেহশীল। 'সম এভিস্ত্রিভিলোকৈঃ'। বলা হচ্ছে এই যে ত্রিভুবন অর্থাৎ স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ জগৎ–এই ত্রিভুবনের প্রতিও পরমপুরুষের স্নেহ–ভালবাসার পরিমাণ সমান।

পরমপুরুষ সব কিছুই দেখতে পান, সব কিছুই জানতে পারেন। এই বিশ্বে এমন কিছু নেই যা তাঁর দৃষ্টি শক্তি বা অনুভব সামর্থ্যের বাইরে। তাঁর অবস্থা কতকটা ক্যান্ডেসেন্ট লাইটের মত। যখন রঙ্গমঞ্চের ওপর আলোকপাত করা হয় তখন মঞ্চের ওপরকার সব কিছু চোখে পড়ে। মঞ্চের ওপর যে যা করছে– যেমন কেউ হয়তো অভিনয় করছে, কেউ হয়তো নৃত্য করছে, কত কুশীলব কত রকমের ভূমিকায় কাজ করে চলেছে–সেই ক্যান্ডেসেন্ট লাইটটা সব কিছু দেখে চলেছে। ঠিক তেমনি এই সংসার–রঙ্গমঞ্চে মানুষ যেমনটি করছে, যেমনটি ভাবছে, যা কিছু মানুষ ঘ্রাণ নিচ্ছে, আস্বাদন করছে সব কিছুরই তিনি সাক্ষীসত্তা।

আবার যখন মঞ্চের ওপর কোন কিছুই হচ্ছে না–যেমন সেখানে অভিনেতাও নেই, নর্তকও নেই, গায়কও নেই, কেউ নেই, কোন প্রকার কর্মচাঞ্চল্যই নেই–সেই দীপটা তাও দেখে যাচ্ছে। অর্থাৎ দেখছে সেই সময়টায় মঞ্চের ওপর কোন কিছু ঘটছে না। অনুরূপভাবে মানুষ যখন কোন কিছুই করছে না, সে তাঁর সামান্য দেহে বা কারণ দেহে লীন হয়ে রয়েছে, সেই কর্মরাহিত্যের অবস্থাটাও পরমপুরুষ দেখে যাচ্ছেন। মানুষ কিছু কাজ করুক বা না করুক, এমনকি তার মনে মনে চিন্তা করাটা, বস্তুর আঘ্রাণ বা আস্বাদন ক্রিয়াটাও চলছে। সে অবস্থাটাও পরমপুরুষের জানা। তাই মানুষ যেমন পরমপুরুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে পরমপুরুষও তেমনি মানুষ জাতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধিত হয়ে রয়েছেন।

মানুষ কোন অবস্থাতেই একক নয়, অসহায় নয়। মানুষ সর্বদাই পরমপুরুষের একান্ত কাছটিতে রয়েছে। তাই মানুষ যেন কখনও মনের মধ্যে কোন প্রকার নৈরাশ্যবাদ বা হীনম্মন্যতা বোধকে প্রশ্রয় না দেয়।

(পটনা, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

আগম ও নিগম

**"আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।"**

তোমরা জান, তন্ত্র শাস্ত্রের দু'টো পাখা বা শাখা। একটির নাম আগম, অপরটির নাম নিগম।

'তন্ত্র' শব্দের দু'টো ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত বিচারে 'তন্ত্র'কে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা ব্যাখ্যা হ'ল: 'তং জাড্যাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ তন্ত্রঃ পরিকীর্তিতঃ'। 'ত' হ'ল জড়তার বীজমন্ত্র (dullness, lethargy)। 'ত্র' মানে মুক্তিদাতা (liberator)। যা মানুষকে আধ্যাত্মিক জড়তা থেকে ত্রাণ করে তাই তন্ত্র।

অপর ব্যাখ্যাটি হ'ল: সংস্কৃত 'তন্' ধাতুর মানে বিস্তারিত হওয়া (to expand)। আর 'ত্র' মানে মুক্তিদাতা (ত্রৈ + ড= ত্র)। 'ত্রৈ' মানে ত্রাণ করা, মুক্তি দেওয়া। তাহলে 'তন্ত্র' শব্দের মানে হ'ল যে বিজ্ঞান মানুষকে বিস্তারিত করতে সাহায্য করে অথবা যা সর্বাত্মক বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত করে। তন্ত্র মানে বিস্তৃতির পথ। একটা ছোট্ট শিশু। তার ছোট্ট দেহখানি প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে একটু একটু

করে বেড়েই চলে। এই জন্যে ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের দেহকে বলে 'তনু'। সংস্কৃতে 'তনু' মানে বর্দ্ধনশীল....যা বেড়ে চলেছে। ৩৯ বছরের পর থেকে মানুষের দেহকে আর তনু বলব না–বলব 'শরীর'। শরীর মানে যা ক্রমশঃ শীর্ণ হতে থাকে।

বলছিলুম, তন্ত্রের দু'টো ডানা আগম ও নিগম। আ–গম্ + অল্ করে 'আগম' আর নি–গম্ + অল্ করে 'নিগম' শব্দ নিষ্পন্ন।

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতম্।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাৎ আগম উচ্যতে।।"

পাবর্তী শিবকে প্রশ্ন করলেন, "আধ্যাত্মিক সাধকের ন্যূনতম যোগ্যতা কী?" উত্তরে শিব বললেন, সাধকের ন্যূনতম যোগ্যতা হ'ল, তার একটা মানব শরীর থাকতে হবে। তাই মানুষ মাত্রেরই আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বনিম্ন যোগ্যতা রয়েছে কারণ মানুষ মাত্রেই দেহধারী জীব।

"আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্"। শিব বললেন, মানুষ যখন আত্মজ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ যখন সে বোঝে, উপলব্ধি করে সে কে, তখন কী হয়? না, সে মোক্ষ লাভ

করে। এই জন্যে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে নিম্নতম যোগ্যতা হ'ল: "সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা"। প্রতিসঞ্চর ধারায় নানান পশুজীবনের পর জীব মানুষের শরীর পায় ও মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করে। এই মানুষের শরীর পাওয়াটাই হ'ল ন্যূনতম যোগ্যতা।

"সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানীচেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।”

"সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা”। প্রতিসঞ্চর ধারায় নানান সংঘর্ষ–সমিতির মধ্য দিয়ে চলার পরিণতিতে জীব মানবদেহ লাভ করে। 'সুকৃতৈঃ' শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃতের অর্থে বুঝতে হবে। এর তাৎপর্য হ'ল: নানান পশুজীবনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে, বিভিন্ন সংঘাত ও সংস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন পথে এগোতে এগোতে এক সময়ে সে পেয়ে যাচ্ছে মানবাধার। এই সংরচনায় এসে তবেই মানুষ অধ্যাত্ম সাধনার যোগ্যতা অর্জন করছে, তার আগে নয়। যতদিন জীব পশু দেহ নিয়ে রয়েছে ততদিন অধ্যাত্ম সাধনার সুযোগ পাচ্ছে না, কেবল মানব দেহ পাবার পরই সেই সুযোগ পাচ্ছে। তাই মানবাধার পেয়েও কেউ যদি অধ্যাত্ম– সাধনা না করে, বুঝতে হবে সে নিশ্চয়ই বোকা কারণ সে তো তার সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে না।

এর পর মানুষ যখন আত্মজ্ঞান লাভ করে তখন সে অর্জন করে নির্গুণাস্থিতি বা মোক্ষ। শ্লোকটির প্রথমার্ধে বলা হয়েছে 'আত্মজ্ঞানম্', দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে

"জ্ঞানীচেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ"।

'আত্মজ্ঞান' বলতে ঠিক কী বোঝায়? তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সে অপরকে দেখতে চাইছে, নিজেকে নয়। মানুষ যখন নিজেকে কর্তৃকারকে রেখে অন্যকে কর্মকারকে রাখে (মজা হচ্ছে, মানুষ কখনও নিজেকে কর্মকারকে রাখছে না), তাতে হয় কী? না, তার কর্তৃভাব কখনও কর্মভাবের সঙ্গে মিলেমিশে যায় না। এখানেই যত বিপত্তি। মানুষ কত শত জিনিস জানতে চায় কিন্তু সে নিজেকে কখনও জানতে চায় না। মানুষের আত্মা হ'ল সব চেয়ে নিকটতম সত্তা কিন্তু মানুষ তার আত্মাকে জানতে চায় না। এইটাই সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার।

আত্মজ্ঞান মানে হ'ল বিষয়রাহিত্যের অবস্থা। নিজের অস্তিত্বের ভেতরেই নিজেকে জানা, অণুর অভ্যন্তরীণ চিতিশক্তি বা মানসশক্তিকে বাইরের কোন বিষয়ের দিকে চালিয়ে দেওয়া নয়। মানুষের মধ্যে প্রভূত মানস সম্পদ, প্রভূত আত্মিক সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ তার সেই মূল্যবান

মানসিক ও আত্মিক সম্পদকে বহির্জাগতিক বিষয়ের দিকে চালিত করে দেয়। কিন্তু মানুষ যদি তার সমস্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে পরমাত্মার দিকে চালিয়ে দেয় ও বহির্জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে না নেয়, সেই ধরনের মানসাধ্যাত্মিক অবস্থাকে বলা হয় 'আত্মজ্ঞান'। আত্মজ্ঞানই সত্যিকারের জ্ঞান। তদতিরিক্ত যাবতীয় জ্ঞান আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট। আর এই জ্ঞান যেহেতু অন্য দ্বিতীয় সত্তানিরপেক্ষ তাই তা আপেক্ষিকতার অপবাদমুক্ত। এ হ'ল আত্মিক জ্ঞান, পারমার্থিক জ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে মানুষের গাদা গাদা বই পড়বার দরকার পড়ে না। আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে দরকার ঐকান্তিক আকৃতি ও পরমপুরুষের প্রতি ভালবাসা। এই হ'ল সাধনা। আর এই পথ ধরে আত্মোপলব্ধির পরই মানুষ অর্জন করে মোক্ষ। এই হ'ল শিবোক্তি। একেই 'আগম' বলে গণ্য করা উচিত।

(পটনা, ৩০শে সেপ্টেম্বর '৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬০

নারী কি মুক্তি–মোক্ষ পেতে পারে?

সম্প্রতি আমাকে একটি দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমস্যাটা বা প্রশ্নটা হয়তো কিছুটা দুরূহ কিন্তু উত্তরটা খুবই সরল। প্রশ্ন ছিল, মহিলারা মুক্তি-মোক্ষের অধিকারী কি না।

কিছুদিন আগে তোমাদের বলেছিলুম যে তন্ত্রে বলা হয়েছে, "দেহভৃৎ মুক্তো ভবতি নাত্র সংশয়ঃ”। আত্মজ্ঞান লাভের ন্যূনতম যোগ্যতা হ'ল এই যে সাধককে মানুষের শরীর পেতে হবে। এটাই হ'ল তার ন্যূনতম যোগ্যতা। কই, এখানে তো উল্লেখ করা হয়নি যে সে সাধক নারী বা পুরুষ হবে। এর থেকে এটাই পরিষ্কার যে নারী-পুরুষ উভয়েই মুক্তি-মোক্ষ লাভের সমান অধিকারী।

একথা সত্য যে প্রায় সকল শাস্ত্রেই, তাদের ভাষ্যে, টীকা-টিপ্পনীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে মেয়েরা মোক্ষ লাভের অধিকারী নয়। কিন্তু আনন্দমার্গের সিদ্ধান্ত বা ভাবাদর্শ বা বিচারধারা বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। আমাদের মার্গের মতে ও ব্যষ্টিগত ভাবে আমার মতে মুক্তি-মোক্ষে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের অধিকার-ভেদ আমি সমর্থন করি না।

সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে, মানব অস্তিত্বের সকল কোষের মধ্যে-অন্নময়, কামময়, মনোময়, অতিমানস, বিজ্ঞানময় ও

হিরণ্ময় কোষ–নারী–পুরুষে ভেদ কেবল নিম্নের দু'টি কোষে– অন্নময় ও কামময় কোষে। কোষ দু'টি সম্পূর্ণতঃ শরীর সম্পর্কিত। এই দু'টি বাদে অন্য কোষগুলির ব্যাপারে নারী–পুরুষে কোন ভেদ নেই। জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভিরুচি, অন্যান্য সূক্ষ্মতর পরীক্ষা–নিরীক্ষা- অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ওপরের চক্রগুলির দ্বারা। নীচের কোষগুলি একান্ত ভাবে শুধু শরীর সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে।

মেয়ে হোক আর ছেলেই হোক, সন্তানের প্রতি বাপ–মায়ের ভালবাসার হেরফের হয় না। তেমনি বিশ্বের সমস্ত ছেলেই পরমপুরুষের পুত্র সন্তান, সমস্ত মেয়েই পরমপুরুষের কন্যা সন্তান। পরমপুরুষ তাঁর আপন পুত্র–কন্যাদের মধ্যে ভেদরেখা টানবেন কেন? যদি পুরুষের জন্যে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয় তবে নারীদের জন্যেও মুক্তির দ্বার সমান ভাবেই উন্মুক্ত। এটাই স্বাভাবিক যুক্তি। এর অন্যথা হবে কেন?

যারা কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক, যারা রেলিজনের জগতে (আধ্যাত্মিক জগতে নয়) কায়েমী স্বার্থের মৌরসী–পাট্টা নিয়ে শিকড় গেড়ে বসেছিল তারাই ঘোষণা করেছিল নারীর মুক্তি–মোক্ষের অধিকার নেই। এটাই ছিল মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রেষিত হয়ে তারা বহুকাল ধরে নারীর ওপর শোষণ

চালিয়েছিল। তাই তারা বলত–কেবল পুরুষই মুক্তি–মোক্ষের অধিকারী।

এখন কথা হ'ল, এই সমগ্র বিশ্বই তো পরমপুরুষের সৃষ্টি। বরং এটা বলা আরও সঙ্গত হবে যে এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমপুরুষের বিবর্তিত রূপ। মনে পড়ে আমি ইতোপূর্বে তোমাদের বলেছিলুম–আমরা অবতারবাদে বিশ্বাস করি না। সেই সঙ্গে এও বলেছিলুম যে এই ব্যক্ত জগতের প্রতিটি অণু–পরমাণু পরমপুরুষের অবতার। তোমরা সবাই তাঁর এক–একজন অবতার। কেবল ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও তাঁর অবতার।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।"

"হে পরমপুরুষ! নারীরূপে, পুরুষরূপে, কুমার বা কুমারীরূপে তুমিই প্রকাশিত হয়েছ। তুমিই লাঠিতে ভর করে বৃদ্ধের বেশে পথ দিয়ে হেঁটে চল, তুমিই নিজেকে বহুধা–বিকশিত রূপে ব্যক্ত করে চলেছ। সেই তুমিই আবার সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বতোমুখ হয়ে সব কিছুই দেখে চলেছ”। সবাই তাঁর এক একজন অবতার।

'অবতার' মানে ওপর থেকে নীচে নেমে আসা সত্তা। এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষ নানান রূপে, নানান সংরচনায় নিজেকে প্রকাশিত, ব্যক্ত করেছেন- স্থূল-সূক্ষ্ম, নারী-পুরুষরূপে। সৃষ্টির সকল সত্তাই, ক্ষুদ্র বৃহৎ সবাই সেই পরম মোক্ষ ধামের অধিকারী। যারা মানুষের শরীর পায়নি তাদের সাধনা করার সুযোগ নেই কিন্তু পরমপুরুষের কৃপায়, তাঁর আনন্দধারায় অভিষিক্ত হয়ে একদিন তারাও তা পাবে। পরমপুরুষ চাইলে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গও মুক্তি-মোক্ষ পেতে পারে। এটা ঠিক যে কীট-পতঙ্গ মানুষের শরীর পায়নি বলে সাধনা করতে পারে না কিন্তু পরমপুরুষ চাইলে তারাও মুক্তি-মোক্ষ লাভ করতে পারে।

ওই যে শাস্ত্রকাররা যারা বলে থাকে যে নারীর মুক্তি-মোক্ষের অধিকার নেই, আমি বলব ওদের ওই ধরনের কথা বলার অধিকারই নেই। এ ধরনের কথা বলা চরম ধৃষ্টতার পরিচয়।

(পটনা, ১লা অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন-৬১

যোগের তান্ত্রিক সংজ্ঞা

যোগ কী? তোমারা জান যে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের প্রায় প্রতিষ্ঠি শব্দের দু'টো করে মানে হয়। একটি হ'ল ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সংস্কৃতে যাকে বলা হয় ভাবারূঢ়ার্থ, দ্বিতীয়টি হ'ল সাধারণ প্রচলিত অর্থ অর্থাৎ লোকে যে অর্থে শব্দটাকে সচরাচর ব্যবহার বা প্রয়োগ করে থাকে। এটির সংস্কৃত নাম যোগারূঢ়ার্থ।

উদাহরণস্বরূপ, ধর, 'পঞ্চানন' শব্দটি। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অর্থাৎ ভাবারূঢ়ার্থ হচ্ছে 'যার পাঁচটা মুখ আছে'। যোগারূঢ়ার্থ হচ্ছে শিব। দেশে পঞ্চানন নামে কত শত ভদ্রলোক আছেন। এখানে আসল অর্থটা হ'ল এমন কেউ বা এমন কিছু যার পাঁচটা মুখ আছে।

'যোগ' শব্দেরও চারটে ব্যাখ্যা আছে। 'যুজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় করে 'যোগ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এখানে 'যোগ' মানে addition, যেমন ২ + ২ = ৪। এটা যোগ।

সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণগুলোর ঠিক ঠিক উচ্চারণ তোমাদের ভাল ভাবে জানা উচিত। আর্য–ভারতীয় বর্ণমালায় চারটে বর্ণ আছে যাদের বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ য, র, ল, ব। এই বর্ণগুলি

স্বাধীন বা মৌলিক ধ্বনি নয়। এরা অন্তঃস্থ বর্ণ অর্থাৎ শব্দের আদিতে বসলে তাদের এক বিশেষ ধরনের ধ্বনি হয়, আবার যখন শব্দের আদিতে না বসে মধ্যে বা অন্তে বসে তখন আর এক ধরনের ধ্বনি হয়। যেমন 'য' = ই + অ, দু'টোই স্বরবর্ণ। এই 'য' যখন শব্দের আদিতে বসে তখন এর উচ্চারণ হবে 'জ' এর মত (যেমন ইংরেজী 'Jump' শব্দটির 'j'-এর মত)। তাই 'যোগ' উচ্চারণ করতে হবে 'জোগ'–এর মত, 'ইয়োগ'–এর মত নয়। আবার শব্দের মধ্যে বা শেষে বসলে এর উচ্চারণ হবে 'য়'–এর মত–'জ'–এর মত নয়। যেমন 'বিয়োগ'–'বিজোগ' নয়; 'সময়'–'সমজ' নয়।

'র' ধ্বনিটা যখন শব্দের আদিতে থাকে তখন তার পুরো উচ্চারণ হবে (যেমন 'রথ'), নতুবা এর উচ্চারণ হবে হ্রস্ব, যেমন ঋ = অর্। অনুরূপভাবে 'ল' যদি শব্দের প্রথম অক্ষর হয় তাহলে এর পুরো উচ্চারণ হয় যেমন 'লতা', কিন্তু অন্তঃস্থ 'ল'–এর উচ্চারণ 'প্র' (lra)। উদাহরণস্বরূপ, 'ফল' শব্দের উচ্চারণ 'ফল'। গ্রাম্য লোকেরা বলে 'ফড়', এটাই ঠিক উচ্চারণ, 'ফল' ঠিক নয়।

'ব' অক্ষরটা শব্দের আদিতে থাকলে এর উচ্চারণ হবে ইংরেজী 'v' অক্ষরটার মত, যদি আদ্যক্ষর না হয় তবে উচ্চারণ হবে 'w' অক্ষরটির মত।

তাহলে 'যোগ' শব্দের উচ্চারণ দাঁড়াচ্ছে 'জোগ' শব্দের মত, কারণ 'য' এখানে শব্দের আদ্যক্ষর। যেখানে মূল ধাতুটা হ'ল 'যুজ' সেখানে 'যোগ' মানে addition (যেমন দু'য়ে দু'য়ে চার)। সেক্ষেত্রে সত্তাদ্বয়ের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু যেখানে 'যোগ' শব্দটা 'যুঞ্জ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন সেখানে 'যোগ' (যুঞ্জ ঘঞ যোগ) মানে unification। যেমন জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। যেখানে unification অর্থ হয় সেখানে একাধিক সত্তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে না। যেমন ধর, চীনী ও জলের মিশ্রণ। দু'য়ে মিলে সরবৎ তৈরী হ'ল। এক্ষেত্রে চীনী ও জল দু'য়ের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রইল কি? তাই দর্শন শাস্ত্রে বা তন্ত্র শাস্ত্রে আমরা যে 'যোগ' শব্দটা জানি তা কিন্তু 'যুজ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়নি, তা নিষ্পন্ন হয়েছে এই 'যুঞ্জ' ধাতু থেকে। অর্থাৎ এই যোগের অর্থ হ'ল unification। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয় তখন জীবাত্মার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

'যোগ' শব্দের তৃতীয় অর্থটা মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রের ওপর আধারিত। সেখানে 'যোগ' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”। মানুষের মধ্যে অনেকানেক বৃত্তি রয়েছে যা পশুর মধ্যে নেই। মুখ্যতঃ মানব মনে বৃত্তির সংখ্যা পঞ্চাশটি। এই পঞ্চাশটি বৃত্তি মানুষের মনের ভেতরেও কাজ করে, বাইরেও কাজ করে আর তারা কাজ করে কর্মেন্দ্রিয় ও

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। কাজেই বৃত্তির সংখ্যা সর্বসাকুল্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক হাজারে। তাহলে এই মৌলিক পঞ্চাশটি বৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটছে হাজার রকমে। সংস্কৃতে এদের বলা হয় চিত্তবৃত্তি। এই হাজার বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সংস্কৃতে বলা হয় সহস্রার চক্র। একে সহস্রদল কমলও বলা হয়। ইংরেজীতে বলা হয় Pineal gland or pineal body.

"চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। এই যে হাজার দিকে ধাবমান বৃত্তিসমূহ, এদের অভিব্যক্তিগুলোকে যখন সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ'। যদি এই মানসিক বৃত্তিগুলোকে নিরুদ্ধ করে ফেলা হয় তখন

মানব সংরচনার বাকী সব কাজও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে এটাই যোগের চরম অবস্থা।

সংস্কৃত 'নিরোধ' শব্দের মানে স্তম্ভন–suspension। নি–রুধ্ + ঘঞ্প্রত্যয় করে 'নিরোধ' শব্দ নিষ্পন্ন। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ সম্পর্কিত এই সংজ্ঞা তন্ত্র স্বীকার করে না। তন্ত্রের মতে যোগের পরিভাষা হ'ল "সংযোগঃ যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্মা পরমাত্মনঃ"। অর্থাৎ তন্ত্রের মতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগকে বলে 'যোগ'। এখানে তন্ত্র প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। পতঞ্জলির মতে যোগ মানে মানসবৃত্তির

নিরুদ্ধাবস্থা। তোমরা জান যে মানসবৃত্তিগুলোকে যখন বাইরের জগৎ থেকে প্রত্যাহার করে নিরুদ্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে সেই নিরুদ্ধ বৃত্তিকে যদি কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা না হয়, তাহলে তারা তো মনের বিভিন্ন কোণে চঞ্চলতা সৃষ্টি করবে। যদি বাইরের জগতে কোন অভিব্যক্তি না ঘটে থাকে, মনের ভেতরে তো তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করবেই। যেমন কেউ হয়তো বাইরের জগতে কোন জিনিস চুরি করল না, কিন্তু মনে মনে চুরি তো করতেই পারে।

তন্ত্র যোগের এই সংজ্ঞা স্বীকার করে না। তন্ত্র মতে যোগের পরিভাষা হ'ল পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মহামিলন। মানস বৃত্তিকে অবাঞ্ছিত বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেগুলোকে পরমপুরুষের দিকে চালিয়ে দিতে হবে, তবে প্রত্যাহার যোগের কাজটা পুরো হবে। এই প্রত্যাহৃত মানস বৃত্তিগুলোকে পরম চৈতন্যের দিকে পরিচালনার মধ্য দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ সম্ভব হবে। এই হ'ল যোগ।

(পটনা, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬২

সাফল্যের গুপ্ত রহস্য

অতীতে কয়েকবারই আমি তোমাদের একটা গল্প শুনিয়েছিলুম হর–পার্বতী সংবাদ থেকে। গল্প আছে, একবার পার্বতী শিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সাফল্য লাভের রহস্য কী"? উত্তরে শিব বলেছিলেন, সাফল্য লাভের সাতটি গোপন রহস্য আছে।

"ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেপ্রথমলক্ষণম্।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনম্।।
চতুর্থো সমতাভাবো পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারো সপ্তমং নৈব বিদ্যতে।।"

(শিবসংহিতা)

সাফল্যের প্রথম রহস্যটা হ'ল: 'ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেপ্রথমলক্ষণম্'। "আমি যে ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছি তাতে জয়যুক্ত হবই হব”–এই যে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এটাই সাফল্যের প্রথম চাবিকাঠি। যারা আধ্যাত্মিক সাধক তাদের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকতেই হবে। আমি যে ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছি সেই ব্রতে সফল হবই হব, এই যে অবিচল আত্মবিশ্বাস এটা থাকে তাদেরই যাদের পরমপুরুষের প্রতি চরম ও পরম ভালবাসা আছে। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা– ভালবাসা যখন কোন মতে টোল খায় না, ঘোলাটে হয়ে যায় না, তখনই এই বজ্রকঠোর সংকল্প

জেগে যায়। "আমি লক্ষ্যে পৌঁছুতে সফলকাম হবই হব” –এটাই হ'ল সাফল্যের প্রথম গুপ্ত রহস্য।

দ্বিতীয় গোপন রহস্য হ'ল: "দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তম্”। মানুষ যাকে উপাস্য বা লক্ষ্য হিসেবে একবার মেনে নিয়েছে তার প্রতি তাকে অবিচল আস্থাশীল, শ্রদ্ধাশীল থাকতেই হবে। শ্রদ্ধা জিনিসটা কী রকম? পৃথিবীর কোন উন্নত ভাষাতেই এই সংস্কৃত 'শ্রদ্ধা' শব্দটির ঠিক সমার্থক শব্দ নেই। তাই এই শব্দটির ভেতরকার তাৎপর্য ভেঙ্গে বলতে হবে। 'শ্রৎ' শব্দ থেকে 'শ্রদ্ধা' শব্দ নিষ্পন্ন। 'শ্রৎ' মানে সত্যম্। ধা+ কি প্রত্যয় করে আসছে 'ধা' শব্দ। মানুষ যখন তার সব কিছু তার লক্ষ্য বা উপাস্য দেবতাকে দিয়ে দেয় (এখানে উপাস্য দেবতা মানে পরমপুরুষ), সেই মানস প্রবণতাটাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। প্রথমতঃ লক্ষ্যকে পরম সত্য বলে মনে করা (এখানে পরমেশ্বরই পরম লক্ষ্য) ও তারপর মনের সমস্ত প্রবণতাকে সেই লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে দেওয়ার নাম শ্রদ্ধা। পরমপুরুষের প্রতি আত্যন্তিকী ভালবাসা, ঐকান্তিক অনুরাগ থাকলে তবেই মানুষের মনে শ্রদ্ধা জাগতে পারে। তাই সাফল্যের দ্বিতীয় যে রহস্য তাও ঈশ্বরনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে।

"তৃতীয়ং গুরুপূজনম্”। 'গুরু' মানে কী? প্রাচীন সংস্কৃতে, 'গু' মানে অন্ধকার, 'রু' মানে যে দূর করে.... বিদূরক। তাই

গুরু মানে যে সত্তা জীবের অন্ধকার–বিশেষ করে আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করে দেন। 'গুরুপূজনম্' মানে গুরুর মনঃপূত কর্ম করা। যখন গুরুকে অধ্যাত্ম–নির্দেশনার মূর্ত প্রতিভূ হিসেবে গণ্য করা হয়, যখন ব্রহ্মকে অধ্যাত্মবিদ্যার প্রবক্তা গুরু হিসেবে গণ্য করা হয়, তখনই এই তৃতীয় সর্ত পূরণ করা হচ্ছে ধরা হয়।

"চতুর্থো সমতাভাবো"। যেহেতু বিশ্বের সব কিছুই পরমপুরুষের সৃষ্টি, পরম স্রষ্টার সন্তান, তাই সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা হচ্ছে সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক। কেউ ৰড়ও নয়, কেউ ছোটও নয়। কারো মধ্যে কোন প্রকার হীনম্মন্যতা বা মহামান্যতা থাকবে না। অর্থাৎ সাধকের মধ্যে থাকবে সমতাভাব, পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য। যখন এই ভারসাম্য, এই মানসিক ভারসাম্য প্রতির্ষ্ঠিত থাকে আমরা সেই অবস্থাটাকে বলি 'সমতাভাবো'।

"পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ”। মানুষের জীবনে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এ দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে মানুষের কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। যদি এই কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে ভালভাবে বশে আনা যায় তাহলে মন ভালভাবে কাজ করতে পারে, পরম চৈতন্যের দিকে এগিয়ে চলতে পারে। তাই পঞ্চম রহস্য হচ্ছে,

সাধককে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

'ষষ্টঞ্চ প্রমিতাহারো"। আ হৃ ঘঞ আহার। বাইরের জগৎ থেকে মানুষ যা সংগ্রহ করে, আহরণ করে তাই আহার। এটা হ'ল জাগতিক আহার। মানসিক আহার সংগ্রহ করা যেতে পারে বাইরের এই বস্তুজগৎ থেকেও, আবার মানস জগৎ থেকেও। তুমি একটা সত্যিকারের রসগোল্লা খেতে পার, খেয়ে আনন্দ পেতে পার, আবার মনের মধ্যেও একটা রসগোল্লা তৈরী করে মনে মনে তা খেয়েও তৃপ্তি পেতে পার।

এখানে 'পরিমিতাহার নয়, 'প্রমিতাহার' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। 'পরিমিত' মানে নিয়মিত (controlled), পরিমাণে বেশীও নয়, কমও নয়। এই শ্লোকে 'প্রমিতাহার' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রমিতাহার মানে হ'ল আহারের পরিমাণটা যেমন নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার তেমনি পুষ্টিকরও হওয়া দরকার। এমন অনেক লোক আছে যারা এমনিতে মানুষ হিসেবে ভাল কিন্তু আহারের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ যা খাবে তা নিশ্চয়ই ভেবে- চিন্তে খাবে। হাতের কাছে যা পেলুম তাই খেয়ে ফেললুম, এটা ঠিক নয়। বরং বলব খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে মানুষের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার, সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে, আহার যেন পুষ্টিকর হয়।

সাফল্যের এই ছ'টি মোক্ষম উপায় ব্যাখ্যা করার পর শিব বলছেন, দেখ পার্বতী, এই ছটা উপায়ই যথেষ্ট, আর সপ্তম উপায়ের কথা নাই বা জানলে, তার আর দরকার পড়বে না।

(পটনা, ৩রা অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৩

গুরুপূজা

শিব পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে সাফল্যের সাতটি উপায় সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে গতকাল কিছু বলেছিলুম। উপায়গুলোর একটি ছিল 'গুরুপূজনম্'। 'পূজনম্' শব্দের মানে বলেছিলুম–গুরুর গুণগত অবস্থিতির স্তরে পৌঁছানো। আর 'গুরু' শব্দের মানে বলতে গিয়ে বলেছিলুম, 'গু' মানে অন্ধকার, মনোজগতের অন্ধকার, আধ্যাত্মিক জগতের অন্ধকার, আর 'রু' মানে বিদূরক সত্তা। আর তাই 'গুরু' মানে যিনি অধ্যাত্ম সাধকের মানসাধ্যাত্মিক জগতের যাবতীয় অন্ধকার দূর করে দেন।

গুরুপূজা করতে গিয়ে আমরা একটা বিশেষ মন্ত্র ব্যবহার করি। সেই মন্ত্রের ভেতরকার অর্থটা কী? মন্ত্রের প্রথম পঙক্তিটা হচ্ছে– "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্”। 'আনন্দসূত্রম' বইয়ে বলেছি, "ব্রহ্মৈব গুরুরেকঃ নাপরঃ”। ব্রহ্মের যাবতীয় গূঢ় তত্ত্ব, ভূমামানসের তথা ভূমাচৈতন্যের গোপন তত্ত্বগুলো একমাত্র ব্রহ্মই জানেন, অন্যে তা জানে না, জানতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, "ব্রহ্মৈব গুরুরেকঃ নাপরঃ”। যতদিন পর্যন্ত না তিনি কোন জাগতিক রূপ পরিগ্রহ করে অন্যকে তা শেখাচ্ছেন অন্যে জানবে কী করে? অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মাই গুরু। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেউ গুরু হতে পারেন না। তাঁর গোপন তত্ত্ব কেবল তিনিই জানেন। তিনি বিশেষ আধারে নিজেকে ব্যক্ত করেন। সাধারণতঃ লোকেরা ভুল করে ভেবে বসে যে, ওই যে বিশেষ মানবীয় রূপ, ওই ফর্ম বা মানবীয় রূপটিই গুরু। কিন্তু না, সেটা ঠিক নয়, গুরু সেই আধারটির মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত করছেন মাত্র।

তোমাদের ইতোপূর্বেই বলেছি, এই যে পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগৎ, এটা বিশাল হলেও অনন্ত নয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময় প্রকৃতির তমোগুণী শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়েছিল, ভবিষ্যতেও কাজে লাগানো হবে। এই তমোগুণী স্বভাবের জন্যেই এটা কখনও অনন্ত হতে পারে না। কোথাও একটা ৰন্ধন থেকে যাবেই কারণ তমোগুণী প্রকৃতির

ধর্মই হ'ল সব কিছুকে একটা সীমার ৰন্ধনে বেঁধে ফেলা। আবার কিছুটা ডিম্বাকৃতি বলে সংস্কৃতে এই সৃষ্ট জগৎকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ড মানে ডিম। ব্রহ্ম অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। অর্থাৎ পরমপুরুষের অন্ডাকৃতি অভিব্যক্তি। এটা পরমপুরুষের অখণ্ড প্রকাশ। তাই বলা হচ্ছে 'মণ্ডলাকার'। পরমপুরুষের এই পাঞ্চভৌতিক অভিপ্রকাশই হ'ল এই বিশ্বটা। এই বিশ্বের সর্বত্রই তিনি পরিব্যাপ্ত। এই যে সর্বব্যাপিত্ব এর জন্যে ইংরেজী শব্দ হচ্ছে all-pervasive, সংস্কৃতে এর জন্যে রয়েছে 'বিশ্' ধাতু। এই কারণে সর্বানুস্যূত এই পরমপুরুষের জন্যে 'বিষ্ণু' শব্দ প্রযুক্ত হয়। বিষ্ণু মানে ব্যাপনশীল (all-pervasive)।

"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ”। তোমরা এও জান যে, এই যে সর্বব্যাপী সত্তা পরমপুরুষ বা বিষ্ণু, ইনি অণুজীবের ধরা–ছোঁয়ার বাইরে। গুরুর সহায়তা ছাড়া মানুষ নিজের চেষ্টায় এই পরমপুরুষের সান্নিধ্যে আসতে পারে না। জীব ও শিবের মধ্যেকার যোগসূত্র হলেন গুরু। এই যে যোগসূত্র, এই যোগসূত্রটুকুও হলেন শিবের অংশ অর্থাৎ শিবই গুরু। "তৎপদং দর্শিতং”–এই যোগসূত্রই বস্তুতঃ পরমপুরুষ, এই যোগসূত্রই তারক ব্রহ্ম। এঁকেই অনুসরণ করতে হবে। "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ”–আমি তোমার বেদীমূলে আত্মসমর্পণ করছি।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া"। তোমরা জান, চোখে মলম বা অঞ্জন লাগাতে গেলে একটা শলাকার দরকার পড়ে। শলাকা মানে ছোট একটা ষ্টিক। এখন তত্ত্বগতভাবে দেখতে গেলে সমস্ত অণুজীবই সেই পরম কারণ সত্তার খন্ড প্রকাশ, সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন আংশিক প্রকাশ। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ, অজ্ঞানতার অন্ধকারের দরুণ তারা আসল জিনিসটা দেখতে পায় না। তাই তাদের অধ্যাত্মজ্ঞানের মলমেরদরকার পড়ে। গুরু শলাকা দিয়ে তাদের চোখে অধ্যাত্মজ্ঞানের মলম লাগিয়ে দেন।

"চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"। শলাকা দিয়ে অধ্যাত্মজ্ঞানের মলম লাগানোর পর মানুষের চোখ খুলে যায়। তারপর বলা হচ্ছে, "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"– "হে পরম গুরু, তোমার বেদীমূলে নিজেকে সমর্পণ করলুম।" 'নমঃ' মানে আত্মসমর্পণ করা। এখানে 'নমঃ' মানে নমো মুদ্রা। এর মানে হ'ল আমার যাবতীয় অভিপ্রকাশ, আমার যাবতীয় নৈপুণ্য– কলাকৌশল যা কিনা আমার দু' হাতের দশ আঙ্গুল দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, তা সব কিছুকেই একটা বিন্দুতে জড়ো করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য, কলানৈপুণ্য সব কিছু নিয়ে তোমার শরণে এলুম।

"গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণুঃ গুরুদেবো মহেশ্বরঃ”। 'গুরুব্রহ্ম'। ব্রহ্মা কী ও কেন? পরমপুরুষের কর্মগত অভিব্যক্তি তিন ধরনের। তিনি সব কিছুর জনক, সবাই তাঁর সন্তান। স্রষ্টা হিসেবে তিনি সব কিছুর সৃষ্ট করেন, অভিভাবক হিসেবে তিনি সব কিছুকে রক্ষা করে চলেছেন, পালন–পোষণ করে চলেছেন। সব কিছুই তাঁর সৃষ্টির পরিপার্শ্বে রয়ে গেছে। তাঁর পারমার্থিক অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে যখন কাউকে তিনি সংহরণ করে নেন, তখন সবাই, সব কিছুই তাঁতেই মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তা (generator), পালনকর্তা (operator), আর ধ্বংসকর্তা (destroyer) হিসেবে তিনি হলেন G-O-D। তিনটি পৃথক পৃথক শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে God শব্দটি তৈরী।

তোমরা জান, যখনই কোন কিছু সৃষ্ট হয় তখন একটা স্পন্দন জাগে। যেখানে স্পান্দনিক ক্রিয়া আছে সেখানে ধ্বনিও আছে, আলোক তরঙ্গও আছে। সেই সঙ্গে বস্তুর ধর্মদ্যোতক বা বৈশিষ্ট্য–সূচক অভিব্যক্তিও আছে। সৃষ্টি রচনাকালে তিনি 'অ' ধ্বনি দিয়ে সৃষ্টিকার্য চালান। যখন পালন– পোষণের কাজ করেন তখন সৃষ্টি হয় 'উ'–ধ্বনির। যখন সব কিছুকে তিনি নিজের মধ্যে সংহার বা প্রত্যাহার করে নেন তখন 'ম' ধবনিটির উদ্ভব। এই ভাবে 'ওঁং' বললে পরমপুরুষের যাবতীয় গুণের অভিব্যক্তিকে বোঝায়। এই জন্যে ত্রিপাদবিভূতিনারায়ণ শ্রুতিতে বলা হচ্ছে, 'প্রণবাত্মকং ব্রহ্ম'। ওঁং–কে বলা হয়

প্রণব। যখন তিনি সৃষ্টিকার্যে নিরত তখন 'অ' ধ্বনিটির উদ্ভব। এই ব্রহ্ম অ–ব্রহ্মা। 'গুরুব্রহ্মা' মানে ব্রহ্মের বিশেষ সর্জনী শক্তি।

"গুরুবিষ্ণুঃ”। ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে, 'বিষ্ণু' মানে সর্বব্যাপী সত্তা (all- pervading entity)। তিনি তাঁর অনন্ত বিষ্ণুমায়ার সহায়তা নিয়ে প্রতিটি সত্তা ও ভাবের ভেতরে ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। "গুরুদেবো মহেশ্বরঃ"। 'দেব' মানে কী?

"দ্যোততে ক্রীড়তে যস্মাদ উদ্যতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ দেব ইতি প্রোক্তঃ সূয়তে সর্বদেবতৈঃ।”

বিশ্বের যাবতীয় স্পন্দন, যাবতীয় অভিপ্রকাশ, ক্রিয়াগত অভিব্যক্তি যা বিশ্বকে স্পন্দিত–ছন্দিত করে চলেছে ও পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আণবিক অপূর্ণতা থেকে পারমার্থিক পূর্ণতার দিকে, তাকেই বলে দেব। পরমপুরুষের যা কিছু ক্রিয়াগত অভিব্যক্তি তা সবই দেব। এই দেবের সংখ্যা অনেক–অগুণতি। কিন্তু এদের মধ্যে সর্বোচ্চ হলেন পরমপুরুষ। তিনি ছাড়া আর যে সমস্ত ছোটখাট কর্মগত অভিব্যক্তি রয়েছে তারা হ'ল দেবতা। অর্থাৎ দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন দেবেরা।

এই দেবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মহাদেব যিনি অণু ও ভূমার ভেতরের ও বাইরের যাবতীয় ক্রিয়াগত সংবেদনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছেন। বলতে পার, সব কিছুই তো ভূমার ভেতরে। এখানে 'ভূমার বাইরে' বলতে গিয়ে এইটাই বলতে চাইছি, ভূমার সেই অংশটুকু যা অপরিবর্তিত, যা কস্মিনকালেও কোন পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে যায় না। তিনি হলেন মহেশ্বর বা মহাদেব। মহেশ্বর তাঁকেই বলব যিনি সমস্ত দেব-দেবতাদের অভিপ্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি-সামর্থ্য রাখেন, অধিকার রাখেন, ও ধৈর্য্য ও প্রতাপ রাখেন অর্থাৎ তিনি চাইলে তাদের সমস্ত শক্তিকে ছিনিয়ে নিতে পারেন। যখন পৃথিবী থেকে তিনি কাউকে প্রত্যাহার করে নেন আমরা চীৎকার করে কাঁদি, ভাবি আর বলি যে অমুক লোকটা, অমুক জীবটা মারা পড়ল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঘটল কী? তিনি সেই সত্তাটা পৃথিবী থেকে সংহরণ করে নিলেন, নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিলেন। এই ভাবে আপন শক্তিবলে তিনি কত শত দেব-দেবতার কর্মগত স্পন্দনকে সংহরণ করে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। তাই তিনি মহেশ্বর। এই মহেশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোহসি মহেশ্বর।
যাদৃশোহসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।।"

"হে মহেশ্বর, তুমি কেমনটি আমি জানি না। তুমি কীভাবে বহু সংখ্যক দেব-দেবতার কর্মগত সংবেদনকে মুহূর্তের মধ্যে সংহরণ করে নাও, তাও জানি না। শুধু জানি, তুমি আছ। আর সেই যে তোমার অস্তিত্বজ্ঞাপক রূপটি-কোন একটা রূপ তো নিশ্চয়ই তোমার আছে, তোমার সেই রূপটা আমরা না জানতে পারি কিন্তু যে রূপেই তুমি থাক না কেন, তোমার সেই রূপটিকেই নমস্কার জানাই।

"গুরুরেব পরম ব্রহ্ম"। ব্রহ্মের যে রূপটা ব্যক্ত তার নাম 'অপর', আর তার দৃক্ ভাবটা হ'ল 'পর'। যখন 'পর' অংশটা দর্শন-অংশে এসে যায় তখন দৃক্ ভাবের নাম 'পরাপর', পরের পর। এই ভাবে সকল 'পর' সত্তার যে সর্বোচ্চ 'পর' তিনি হলেন 'পরম'। সেই যে গুরু, পরম ব্রহ্মের সেই যে অভিব্যক্তি যা সাধকের যাবতীয় আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করে দেন, তিনিই হলেন পরম ব্রহ্ম। পরম ব্রহ্ম গুরু রূপ ধরে তোমার কাছে আসেন ও সেই সঙ্গে যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার ও আধ্যাত্মিক স্থবিরতা দূর করে দেন। 'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'- সেই গুরুকে প্রণাম করি।

(পটনা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৪

প্রণাম মন্ত্র

গতকাল গুরুপূজা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছি। গতকাল রাত্রিতে একটি ছেলে আমাকে প্রণাম মন্ত্রের মানে জিজ্ঞেস করেছিল তক্ষুণি ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছিলুন। সবাইকার অবগতির জন্যে সেটাই আজ আবার বলছি।

প্রণাম মন্ত্রে আছে: "তব দ্রব্যং জগদগুরো তুভ্যমেব সমর্পরে"। এখানে 'তব' মানে তোমার, 'দ্রবা' মানে যার একটা সুনির্দিষ্ট রুপ আকার আছে। সাধক বলছেন, "তর প্রবাং জগদগুরো তুভ্যমেব সমর্পয়ে" তোমার জিনিস তোমাকেই দেওয়া হ'ল, তোমার বেদীমূলেই রেখে দেওয়া হ'ল।

এই তব দ্রব্যং' বলা হচ্ছে কেন? ধর, কোন সাধকের হাতে একটা লাল ফুল আছে। তিনি সেটা দান করছেন। তাহলে তিনি বলবেন কেন "তব দ্রব্যং"? 'দ্রব্যং' বা জিনিসটা সাধক দিচ্ছেন। তাহলে 'তব' বলা হচ্ছে কেন। বলা হচ্ছে এই জন্যে যে জিনিসটা আসলে পরমপুরুষেরই, কেন না এই বিশ্বে মানুষ কোন মৌলিক জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না। মৌলিক কোন

কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা বা দক্ষতা মানুষের নেই। তারা বড় জোর ভৌতিক মিশ্রণ বা রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে কিন্তু মৌলিক কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রশ্ন হ'লঃ মানুষ মৌলিক পদার্থ তৈরী করতে পারে না কেন? কারণ কেউ যখন কোন কিছু তৈরী করে সে করে তার চিত্তাণবিক ধাতু দিয়ে। এই যে মানব মনের চিভাণুপুঞ্জ তা কিন্তু ভূমা মনের ভেতরেই রয়েছে। তাই দিয়ে মানুষ ভাবে, কাজ করে, নানান রূপে ভাবে প্রবাহিত হয়। তাই মানুষ যা কিছু তৈরী করে সে করে তার অনুমানসের চতুঃসীমার মধ্যেই, তার বাইরে নয়। যদি তুমি মনের ভেতরে একটা ঘোড়া তৈরী কর তোমার চিন্তাপুর সাহায্যে, সেই ঘোড়াটা তো তোমার মনের মধ্যেই রয়ে গেল। অন্য কেউ সেটা দেখবে না, কেবল তুমিই সেটা দেখবে। কিন্তু ভূমামানসের ব্যাপারে সব কিছুই তাঁর ভেতরে, বাইরে কিছুই নেই। এই বিশাল ভুমা জগতের তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। যখন তিনি মনের ভেতর কিছু তৈরী করেন, সেটা তাঁর বিরাট মানস দেহেই থেকে যায়। আর সেই ভূমামানস অণুমানসের ভেতরে বাইরে সর্বত্রই থাকতে পারে, কাজ করে যেতে পারে। কাজেই বাইরে থেকে তুমি যা কিছুই নাও না কেন তা তাঁরই সৃষ্টি থেকে।

তুমি মনের ঘোড়াটা দেখিয়ে বলতে পার, "আমার মনের ঘোড়াটা আমিই সৃষ্টি করেছি, তাই ওটার মালিক আমি"। কিন্তু মজার কথা হ'ল, তোমার মনটা তো পরমপুরুষই সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমার মনের চিত্তাণু দিয়ে তুমি যা কিছুই সৃষ্টি কর না কেন, সেটা তো সেই ভূমা মনেরই সৃষ্টি। তোমার অণুমন তো কোন অনস্তিত্ব বা শূন্য থেকে উঠে আসেনি, সে তো বিরাট ভূমামনের অংশ সম্ভূত–বিরাট ভূমা মানস সমুদ্রের একটা ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্র। কাজেই তুমি যা কিছু ভাব সেটা তো সেই বিরাটেরই ক্ষুদ্র অংশ। কাজেই যা তুমি পরমপুরুষকে দেবে বা দিয়ে থাক সেটা ভৌতিক বা মানসিক যাই হোক না কেন, তা তোমার নয়, কারণ তুমি তো সেগুলো সৃষ্টি কর নি।

তুমি যেমন বস্তুগুলোর স্রষ্টাও নয়, তেমনই ওগুলোর মালিকও নও। তোমার বাড়ীটা দেখিয়ে তুমি দাবী কর, "এই বাড়ীটা আমার"। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন বাড়ী যেমনকার তেমনি পড়ে থাকবে। কিন্তু তুমি থাকবে না, আর দাবী করে বলবেও না, বাড়ীটা আমার। তাই বলা হচ্ছে 'তব দ্রব্যং”– বস্তুর প্রকৃত মালিক তো তিনিই।

"তব দ্রব্যং জগদগুরো”। জগদগুরু মানে কী? সংস্কৃত 'গম্' ধাতুর উত্তর 'কিপ্' প্রত্যয় করে 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। কোন বস্তুর স্বভাব বা গুণগত বৈশিষ্ট্য বোঝাতে সংস্কৃতে 'কিপ্' প্রত্যয়

ব্যবহৃত হয়। তাহলে 'গম্' মানে যাওয়া, 'কিপ্' প্রত্যয়ের দ্বারা বোঝাচ্ছে বস্তুর স্বভাবধর্ম; কাজেই 'জগৎ' মানে চলা বা সরে যাওয়াই যার স্বভাবধর্ম বা মৌল বৈশিষ্ট্য। স্থির হয়ে এক জায়গায় থেমে থাকাটাই যার বৈশিষ্ট্য নয়। চলে চলাটাই যার মৌলিক স্বভাব, তাকে বলি জগৎ। এই বিশ্বের কোন কিছুই থেমে নেই, সবাই চলছে...... চলতেই থাকবে।

আর যা কিছু চলে চলে, যা কিছু স্থান থেকে স্থানান্তরে সরে সরে যায়, তা সবই পরমপুরুষের সৃষ্টি। এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তু বা জীবিত সত্তাসমূহ, বিশ্বের এই চলমান ঘটনাপুঞ্জ বা আলেখ্যরাজিকে পরমপুরুষ সর্বদা সাহায্য করে চলেছেন! সবাই যাতে মুক্তি-মোক্ষ পেতে পারে তাই পরমপুরুষ সবাইকে সাহায্য করে থাকেন। তাই বিশ্বে সবাইকার, সব কিছুর গুরু তিনি। আব্রহ্মস্তম্ব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্তম্ব বা তৃণকণা পর্যন্ত সবাই তাঁর সাহায্য পেয়ে চলেছে, তিনি সবাইকার গুরু। তাই তিনি জগৎগুরু।

বলা হচ্ছে, "হে জগৎগুরু, আমি তোমাকে অর্পণ করছি।” কী অর্পণ করছি? না, তব দ্রব্য। তোমারই জিনিস তোমাকে দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি। তোমারই জিনিস তোমাকে দিলুম কারণ আমি তো নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পারি না। আমি তোমাকে কিছু দিয়ে আনন্দ দিতে চাই, আর এই যে

কিছু দেব তাতে সমস্যা হ'ল, আমার নিজের বলতে তো কিছুই নেই, আমি তো কিছু মৌলিক জিনিস তৈরী করতে পারি না। তাই তোমারই তৈরী জিনিস তোমাকে দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করছি।

জ্ঞানীরা বলেন, যখন সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি তখন তাঁকে তাঁরই জিনিস দেবার যৌক্তিকতা কোথায়, যা দেওয়া হচ্ছে তা তো তাঁরই জিনিস। তাহলে মানুষ তাঁকে দেবেটা কী? মানুষ কী করে বলতে পারে, "আমি এই জিনিসটা তোমাকে দিলুম"। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল, ভক্ত বরাবর জ্ঞানীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। তাঁদের বক্তব্য–হ্যাঁ, বলতে পার সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি, সব কিছুর মালিকও তিনি; যদিও সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি তবুও যেহেতু আমার মনে এই যে আমার, আমার বলে একটা জবরদস্ত অহংকার শিকড় গেড়ে বসে আছে, যার দরুণ সদা সর্বদাই ভুল করে আমি ভাবছি এটা আমার, ওটা আমার, যে অহংকারের দরুণ আমি মাঝে মাঝে ভগবানকে ভুলে যাই বা অস্বীকার করে বসি....বলে ফেলি, "কে ভগবান জানি না", তাই ভগবানের জিনিস ভগবানকে দেবার দরকার আছে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ধর, তুমি মনের ভেতরে একটা মানুষ তৈরী করলে। ধর, তোমার নাম মিষ্টার 'ক'। তুমি মনের ভেতরে যে একটা ছোট্ট মানুষ কল্পনা

করেছ সে হয়তো বললে, "আমি মিষ্টার 'ক'-কে চিনি না"। সেক্ষেত্রে তুমি তো মিষ্টার 'ক'-ই থাকছ, তোমার মনের কল্পিত মানুষটা সেখানেই রয়েছে। মানুষের মনের এই অহংবোধের কী দারুণ স্পর্দ্ধা।

তাই ভক্ত বলেন, "হ্যাঁ জ্ঞানী, সন্দেহ নেই যে সব কিছুই তাঁরই সৃষ্টি, কিন্তু আমার অহংৰোধ বলছে, আমার মনের মালিক তো আমি। বাস্তব জগতে এমনটাই হয়ে থাকে। "আমি সুইজারল্যান্ড থেকে আসছি.... আমাকে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করতে হবে.... আমাকে বিসা (visa) জোগাড় করতে হবে.... আমার বিসার মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে হবে" -এই রকম নানান চিন্তা মনে জাগছে। এই সব চিন্তা সেই ক্ষুদ্র আমিকে কেন্দ্র করেই। আর বোধ হয় মানুষ ভাবেই না যে এই যে অণুমন, 'ক্ষুদ্র আমি', সেটা কিন্তু পরমপুরুষেরই জিনিস। তোমরা ভাব, “এটা আমার মন"। সবাই এমনটাই ভাবে। এসব হ'ল আমি-কেন্দ্রিক ভাবনা, অহং-ৰোধের প্রকাশ। তাই ভক্ত বলেন, আমার যাবতীয় অহংবোধ, আমার অহংকেন্দ্রিক অভিব্যক্তিগুলো মনের এই 'আমি'-ৰোধকে ঘিরেই। বস্তুতঃ সবই তাঁর, কিন্তু তবুও সেই 'আমি', 'আমি'-ভাব।

"রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা।

দেয়ং কিমপি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীরবামনয়নাপহৃতমানসায়।
দত্তং মনঃ যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ।।”

–"হে পরমপুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের স্রষ্টা, সারা বিশ্বে অজস্র মণিমুক্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই আমার মত দীনাতিদীন মানুষের কাছ থেকে তোমার কীই বা প্রয়োজন আছে! কিছুই না। বিশ্বের যত মণিমুক্তা, বিশ্বের যাবতীয় ধন-সম্পদ-সবই তো তোমার। স্বয়ং লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী। তুমি যা চাইবে সবই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ করে দেবেন। নাগপুরে এসে তুমি হয়তো বলে বসলে-মহামায়া, আমার একটা আম চাই। মহামায়া তক্ষুণি আমের বন্দোবস্ত করে দেবেন। যেহেতু স্বয়ং মহামায়া তোমার গৃহিণী তাই তোমার তো কোন অভাব নেই, তোমার ভাণ্ডারে কোন জিনিসের তো ঘাটতি নেই। তাই আমি তোমাকে কীই বা দোব।

হ্যাঁ, একটা জিনিস মনে পড়ছে। তোমার বড় বড় ভক্তরা নাকি ভক্তিবলে, গভীর অনুরাগ বলে তোমার মনটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই তোমার মন জিনিসটার অভাব রয়েছে। আমি তো আর তেমন কোন বড় ভক্ত নই। যেহেতু তোমার মন জিনিসটার অভাব রয়েছে আর আমার কাছে মন আছে, তাই আমি আমার সেই মনটাই তোমাকে দিচ্ছি।

"তব দ্রব্যং জগদ্গুরো তুভ্যমেব সমর্পয়ে"। আমার সব কিছু এমনকি আমার মনটা পর্যন্ত তোমার পাদমূলে সমর্পণ করছি। তুমি তা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করো।

(পটনা, ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৫

অণুজীবের জন্মসিদ্ধ অধিকার

“সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।।”

তোমরা জান বিশ্বের সবাই পরমপুরুষের সন্তান। তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই জগৎকে, সৃষ্টি করেছেন এই সমস্ত জীবিত প্রাণীকুলকে।

এখন যেহেতু তিনি এই জড় জগৎকে, এই অস্থাবর অচেতন জগৎকে, সমগ্র উদ্ভিদ ও মনুষ্যসহ বিশাল প্রাণীজগৎকে সৃষ্টি

করেছেন, তাই সাধারণ বুদ্ধি একথাই বলে যে এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমপুরুষের সমস্ত সন্তানদের যৌথ সম্পত্তি। জাতি-ধর্মমত-জাতীয়তা-শিক্ষা-বিদ্যা-বুদ্ধি অথবা ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি নির্বিশেষে সবাইবার এটা এজমাইলী সম্পত্তি। নীচ ও হীন বৃত্তির প্রেষণায় কায়েমী স্বার্থবাহীরা প্রাণী জগতে, বিশেষ করে মানুষে মানুষে ভেদভাব সৃষ্টি করে। তাই যারা অপরকে শোষণ করে, অনকে ন্যায়সঙ্গ ত পৈতৃক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এই সৃষ্ট জগতের যাবতীয় সম্পদকে কুক্ষিগত করতে চায় তারা অবশ্যই সমাজের শত্রু, মানবতার শত্রু, সংস্কৃতিপরায়ণ ও সভ্য জগতের শত্রু।

"সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে"। তাঁর সৃষ্ট জীবেরা, তাঁর স্নেহের পুত্র-কন্যারা তাঁর চারপাশে ঘুরে চলেছে। তারা পরমপুরুষ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে থাকতে পারে না। কেন না পরমপুরুষ হলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম চক্রনাভি, অন্যেরা তার চার দিকে শুধু ঘুরে চলেছে। যেমন ক্ষুদ্র আণবিক সংরচনায় অসংখ্য ইলেক্ট্রন তাদের কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে অবিরাম ঘুরে চলে তেমনি পুরুষোত্তম বা পরমপুরুষ রয়েছেন কেন্দ্রবিন্দুতে আর তাঁর সৃষ্ট অন্য সবাই তাঁর চারপাশে ঘিরে তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, নেচে চলেছে। এই যে অজস্র সত্তা চক্রনাভি পরমপুরুষের চারদিকে ঘুরে চলেছে, তাদের

প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক ও মানসিক আজীব ও আভোগ।

সকলের ভৌতিক চাহিদা সমান নয়, তাই বলেছি যে ঘূর্ণমান বস্তুসমূহ, সত্তাসমূহ তাদের নিজের নিজের আভোগ (pabulum) নিয়ে ঘুরে চলেছে। তেমনি সবাইকার মানসিক এষণা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃত্তি এক নয়। শ্লোকটিতে 'আজীব' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। আজীব মানে occupation বা জীবিকা। এই আজীব সত্তার মানসিক ও ভৌতিক দুইই হতে পারে। এটা একটা তথ্য যে বিভিন্ন সত্তা তাদের পৃথক পৃথক ভৌতিক ও মানসিক আভোগ নিয়ে বেঁচে থাকে। এর মানে এই নয় যে একের জাগতিক বা মানসিক আভোগ অন্যে কেড়ে নেবে। যারা তা করে বা করবার চেষ্টা করে, আমার মতে তারা মানব সভ্যতার শত্রু, বিশ্বস্রষ্টার অভিশপ্ত সন্তান।

"সর্বাজীবে সর্বসংস্থে”। আপন মনের বৃত্তি-এষণা-আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা- কামনা অনুযায়ী বিভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক আধার পেয়ে থাকে। এই আধার তাদের দরকার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-কামনার পরিতৃপ্তির জন্যে। তাই জীবিত প্রাণীদের কেউ কেউ পেয়েছে জন্তুদেহ, কেউ বা কীট-পতঙ্গের শরীর, কেউ বা জন্মেছে গাছপালা হয়ে, আবার কেউ

বা পেয়েছে মানবদেহ। আবার যারা মানব সংরচনা পেয়েছে তারাও তাদের অন্তর্নিহিত সংস্কারের পার্থক্যের দরুণ একে অন্যের থেকে পৃথক পৃথক। এই সংস্কারগত পার্থক্যের দরুণ বিশ্বের চক্রনাভি থেকে বিভিন্ন জীবিত সত্তার ব্যাসার্ধগত দূরত্বেও তারতম্য রয়েছে। কেউ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, কেউ বা কয়েক ফুট দূরে, কেউ বা কয়েক মাইল দূরে। তবে কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরে চলেছে সবাই, তাদের ব্যাসার্ধের দূরত্বটা কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশী। পরম পিতার চারদিকে কেউ বা ঘুরে চলেছে একভাবে, কেউ বা অন্য ভাবে, কেউ বা আরও অন্য ভাবে কিন্তু ঘুরে চলেছে সবাই–ওই আপন আপন সংস্কারের দরুণ নিজের নিজের ব্যাসার্ধগত দূরত্ব বজায় রেখে। ঘুরতে সবাইকে হবেই। আর ঘুরে চলবে যেমন ইলেক্ট্র, নগুলো তাদের নিজস্ব নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতেই থাকে।

"সর্বাজীবে সর্বসংস্থে"। তাহলে দেখছি সবাই, সকল জীবিত সত্তাই নিজের নিজের ভৌতিক ও মানসিক আভোগ নিয়ে, শারীরিক সংরচনা নিয়ে আপন আপন ভাবে ঘুরে চলেছে।

মানুষ যখন স্থূল থেকে স্থূলতর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে তখন ভূমাকেন্দ্র থেকে তার দূরত্বটা অর্থাৎ ব্যাসার্ধের দূরত্বটা বেড়ে যায়। অর্থাৎ সে কেন্দ্রবিন্দু থেকে আগের তুলনায় বেশী

দূরে সরে যায়। এর কারণ তার চিন্তা ও কর্মের স্থূলতা। মন যখন ক্রমশঃ স্থূল থেকে স্থূলতর চিন্তা ও কর্ম করতে থাকে তখন তার ব্যাসার্ধের দূরত্ব বেড়ে যায়। আবার উল্টো দিকে মানুষের চিন্তা ও কর্ম যখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পথে এগিয়ে চলে তার ব্যাসার্ধের দূরত্বও কমতেথাকে। আর কমতে কমতে একদিন এমন একটা সময় আসে, এমন এক শুভ মুহূর্ত্ত আসে যখন সেই ঘূর্ণমান সত্তাটা তার পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ভূমা কেন্দ্রের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এই অবস্থাটাকে বলা হয় মোক্ষ।

"তস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে"। এখানে 'হংসো' মানে মানুষ, জীবিত সত্তা। জীবের ৰীজমন্ত্র হ'ল 'হংসো'।

প্রতিটি সত্তার একটি করে ৰীজমন্ত্র থাকে। যেমন এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টির ৰীজমন্ত্র হ'ল 'অ' ধ্বনিটি। জ্ঞান বা বিদ্যার ৰীজমন্ত্র হ'ল 'ঐ' আর এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের ৰীজমন্ত্র হ'ল 'ক', নভোমণ্ডল বা আকাশের ৰীজমন্ত্র হ'ল 'খ', এনার্জি বা রজোগুণী শক্তির ৰীজমন্ত্র হ'ল 'র', তেমনি 'হংসো' জীবের ৰীজমন্ত্র।

"তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্র"। এই হংস বা জীব ভ-চক্রে বা ভূমামানসে আপন ধারায় ঘুরে চলেছে। সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম চক্র হ'ল অণুচক্র বা আণবিক চক্র। আণবিক চক্রের

চেয়ে বড় হ'ল ব্যোমচক্র। আণবিক চক্রে থাকে একটি ছোট্ট কেন্দ্রবিন্দু আর সেই কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরে চলে বহুসংখ্যক ইলেক্ট্রন। ব্যোম চক্রের কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহ আর তার চারদিকে ঘুরে চলেছে চন্দ্র উপগ্রহ। তেমনি ব্রহ্মচক্রের কেন্দ্রবিন্দু হলেন পুরুষোত্তম আর জড়-চেতন নির্বিশেষে সব সত্তাই তার চারপাশে ঘুরে চলেছে।

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা"। সকল সত্তাই পুরুষোত্তমের চারদিকে ঘুরে চলবে ততদিনই যতদিন তারা ভাববে যে তারা ও তাদের কেন্দ্রবিন্দু (সৃষ্টি ও স্রষ্টা) একে অন্যের থেকে পৃথক। যেদিন তারা অনুভব করবে যে, "আমি আমার পরম পিতার এক অভিন্ন অংশ, আমাকে তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হতে হবে”, সেদিনই তারা এই অতল অপার দিব্য অমৃত স্রোতে পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাবে।

সে অবস্থায় হয় কী? 'জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি”। সৃষ্ট জীবেরা অমৃতত্ব লাভ করে। তোমরা জান, অমৃতত্ব লাভ ব্যাপারটা জীবের সীমিত সামর্থ্যের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ জন্যে পরমপুরুষের কৃপা হ'ল একটা অত্যাবশ্যক প্রাকৃশর্ত আর এই যে পরমপুরুষের কৃপা এটা সর্বদাই সকলের ওপরেই সমান ভাবে বর্ষিত হয়ে চলেছে, এতে কোন অধিকার-অনধিকারের ভেদরেখা নেই।

অতএব অমৃতত্ব লাভের অধিকার মানুষ মাত্রেরই জন্মসিদ্ধ অধিকার। যারা মানুষকে সেই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় তারা মানব জাতির শত্রু, মানব রূপী দানব। আমি চাই, তোমরা এই সব নররূপী দানবদের মুখোস খুলে দাও ও সর্বপ্রকার শোষণরহিত একটা বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে তোল। লক্ষ্য রেখো, যাতে মানুষকে, জীবজন্তুকে শোষণ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না থাকে।

(পটনা, ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৬

পরমপুরুষের ভয়ে

তোমরা জান বেদের স্বীকৃত ছন্দের সংখ্যা সাতটি–গায়ত্রী, উষ্ণীক্, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, বৃহতি, জগতী ও পঙক্তি। তোমরা তথাকথিত গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত আছ। সত্যি কথা বলতে কি গায়ত্রী মন্ত্র কোন মন্ত্র নয়, এটি একটি ঋক্।

গায়ত্রী মন্ত্র কথাটা একটা বহুজনকৃত ভ্রান্তি। আসলে সবিতৃ ঋক্’টি রচিত হয়েছিল গায়ত্রী ছন্দে।

অনুষ্টুপ নামে আর একটি ছন্দ আছে। গায়ত্রী ছন্দ ও অনুষ্টুপ ছন্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, গায়ত্রী ছন্দে থাকবে তিনটি পঙ্ক্তি আর প্রত্যেক পঙ্ক্তিতে থাকবে সাতটি করে মাত্রা। অনুষ্টুপ ছন্দে থাকবে চারটি করে পঙক্তি আর প্রত্যেক পঙ্ক্তিতে থাকবে সাতটি করে মাত্রা অর্থাৎ একটি ঋকে থাকবে মোট ২৮টি মাত্রা।

অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র হচ্ছে–

"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং বিশ্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।।"

'উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং'–প্রথম পঙ্ক্তি;
'জ্বলন্তং বিশ্বতোমুখম্'–দ্বিতীয় পঙ্ক্তি;
'নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং'–তৃতীয় পঙ্ক্তি;

'মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্'–চতুর্থ পঙক্তি;

তারক ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ঋক্'টি রচিত। তারক ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হ'ল নির্গুণ ভূমিতে যদিও তিনি এই পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগতের ওপর বিশেষ নজর রেখে চলেছেন।

তাঁর সম্বন্ধে প্রথম বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে 'উগ্রং'। এখানে 'উগ্রং' মানে ভয়ংকর (ferocious) নয়, যেমন লৌকিক সংস্কৃতে 'উগ্র' শব্দের মানে ধরা হয় –উৎ + গ্র = উগ্র। এই 'উগ্র' শব্দের মানে বিন্দুস্থ (pointed/pinnacled)। তিনি হলেন এই বিশ্বের যাবতীয় গৌরবোজ্জ্বলতার প্রতীক স্বরূপ। অর্থাৎ এই ব্যক্ত জগতে যা কিছু সুমহান, যা কিছু গৌরবোজ্জ্বল তা সবই তিনি–এই অর্থে 'উগ্রং' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

"বীরং"। তোমরা জান 'বীর' বলতে আমরা বুঝি hero আর হিন্দী ভাষায় 'বীর' বানানটি লেখা হয় বর্গীয় 'ৰ' দিয়ে–অন্তঃস্থ 'ব' দিয়ে নয়। পুরুষোত্তমকে 'বীর' বলা হয়েছে কেননা তিনি একক ভাবেই আপন বীর্যবলে বিপদ বিঘ্নসঙ্কুল প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন ও একক ভাবেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেন–এই জন্যেই তাঁর উদ্দেশ্যে 'বীর' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

"মহাবিষ্ণুং"। যে সত্তার অন্য সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য আছে সেই সত্তাকে বলা হয় বিষ্ণু। শ্লোকটিতে তারক ব্রহ্মকে বলা হয়েছে মহাবিষ্ণু। কারণ, এই বিশাল বিশ্বে প্রতিটি সৃষ্ট জীবের মধ্যে, চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সকল সত্তার সকল অংশে, সকল অণু-পরমাণুতে তিনি প্রবেশ করতে পারেন। তিনি তোমার শরীরে ছিদ্রপথ দিয়ে, প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে, তোমার মনের সকল রন্ধ্রপথে ঢুকে যেতে পারেন। তুমি তোমার দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যা কিছু কর, তুমি তোমার মনের যে কোন অংশ দিয়ে যা কিছু ভাব, তিনি সব কিছু জেনে ফেলেন। এই জন্যে সেই তারক ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে 'মহাবিষ্ণু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

"জ্বলন্তং"। তাঁকে দেখে মনে হয় এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড.... ভয়াল অফুরন্ত শক্তির চিরন্তন উৎস। যেহেতু এই বিশ্বের সকল সত্তাই তার কাছ থেকে শক্তি পেয়ে থাকে তাই তিনি হলেন সকল শক্তির চরম ও পরম উৎস।

আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটা ও সেই সঙ্গে এই সৌরচক্রের অন্যান্য গ্রহ- উপগ্রহগুলো সূর্যের কাছ থেকে এনার্জি পেয়ে থাকে। সূর্যই হ'ল তাদের শক্তির উৎস আর পরমপুরুষ হলেন সূর্যের যাবতীয় শক্তির উৎস। এই জন্যে সেই পরম সত্তার উদ্দেশ্যে 'জ্বলন্ত' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই কারণেই আমি বলেছি যে, এই বিশ্বের সামগ্রিক ভাবে কখনো তাপগত মৃত্যু হবে না। কেননা, এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষ হলেন জ্বলন্ত সত্তা। তিনি আছেন আর চিরকাল তিনি থাকবেনও। তাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কখনো সামগ্রিক ভাবে শক্তি বা এনার্জির ঘাটতি দেখা দেবে না। হতে পারে এই পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশে বা সৌরচক্রের বা ব্রহ্মচক্রের বিশেষ বিশেষ অংশে এনার্জির সাময়িক ঘাটতি দেখা দিলেও দিতে পারে।

"বিশ্বতোমুখম্”। প্রতিটি সৃষ্ট জীবেরই থাকে একটি করে মুখ। তাই দিয়ে তারা কোন বিশেষ দিকে বা বিশেষ কোণে বা কোন বিশেষ পার্শ্বকোণে থাকা জিনিস দেখতে পায় কিন্তু কখনো কোণাকুণি থাকা বা পাশে থাকা জিনিস দেখতে পায় না। যেমন মানুষ একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে নজর দিতে পারেনা। একথা অণুর ক্ষেত্রে খাটে কিন্তু পুরুষোত্তম বা তারক ব্রহ্মের ক্ষেত্রে খাটে না। তিনি একই সঙ্গে সব কিছু দেখে নেন কেননা সব কিছুই তো তাঁর মনের ভেতরে, আর মনের ভেতরকার কোন কিছু দেখতে গেলে বাইরের চোখের দরকার পড়ে না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে তারক ব্রহ্ম সব কিছুই এক সঙ্গে দেখতে পান। এই জন্যেই তাঁর উদ্দেশ্যে 'বিশ্বতোমুখম্' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

"নৃসিংহং”। 'নৃ' মানে মানুষ বা পুরুষ, 'সিংহ' মানে প্রধান বা সর্দার, নেতা বা মাথা। যেহেতু 'সিংহ' বনের জীবজন্তুদের রাজা বা সর্বপ্রধান জন্তু তাই তাকে বলা হয় 'সিংহ'। Lion বা সিংহ হ'ল 'পশুসিংহ' অর্থাৎ বনের জীবজন্তুদের রাজা। আর পরমপুরুষ হলেন 'পুরুষসিংহ' অর্থাৎ পুরুষোত্তম। তাহলে 'নৃসিংহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পুরুষোত্তম'। 'নরাণাং সিংহঃ, নরাণাং নেতা, ইত্যর্থে নৃসিংহঃ'। পরমপুরুষ হলেন 'পুরুষোত্তম'। তারক ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তমের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁরা উভয়েই হলেন নেতৃস্থানীয় সত্তা ও তাঁদের গুণগত অধিক্ষেত্রও এক ও অভিন্ন।

"নৃসিংহং ভীষণম্”। পুরুষোত্তমকে বলা হচ্ছে 'ভীষণং' (horrible, horrifying, dangerous), কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তিনি 'ভীষণ' কাদের কাছে? যারা নিয়ম–শৃঙ্খলা মানে না, যারা অপরকে শোষণ করে, যারা মানব আধার পেয়েও নৈতিক অধঃপতনের পথে চলে, যারা অসাধু, যারা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের পথে চলতে বাধ্য করে তাদের কাছেই তিনি 'ভীষণ'।

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্”। মানুষ সর্বদাই ভয়ঙ্কর বস্তুকে সযত্নে এড়িয়ে চলে, কিন্তু পরমপুরুষ তো ভয়ের পক্ষেও ভয়ঙ্কর কারণ মানুষ নানান ভীষণ বস্তুকে, ভয়াল জিনিসকে ভয় পায়। কিন্তু পরমপুরুষ তো নিজেই সেই সব ভয়ঙ্কর ও

ভয়াল বস্তু তথা সত্তাকে অবহেলা করে চলেন। "ভীষণং ভীষণানাম্”। তাঁর এই ভীষণ ভূমিকার জন্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট থাকে। তাঁর ভয়ে যথারীতি বায়ু বয়ে চলে। সে বলতে পারে না, "না, আজ আর চলব না, আজ স্থির হয়ে বসে থাকব”। না, বায়ু সে কথা বলতে পারে না কারণ বায়ু সেই পুরুষোত্তমকে ভয় করে। তাই স্বীকৃত বিধিবিধানকে মেনে নিয়ে বায়ুকে চলতেই হয়, সে যথারীতি নিজের কর্ত্তব্য করে যায়।

সংকৃতে দু'টি শব্দ আছে-'নীল' ও 'নিল'। 'নীল' মানে নীল রঙ (blue), আর 'নিল' মানে যা স্থির যা থেমে থাকে। এই অর্থে 'অনিল' মানে যা স্থির নয়, যা থেমে নেই, যা স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে, যোগারূঢ়ার্থে 'অনিল' মানে বায়ু। "ভীষাহস্মাদ বায়ুঃ পবতে'। 'পবতে' মানে প্রবাহিত হয় বা বয়ে চলে। 'ভীষোদেতি সূর্যঃ' -ভয়ে সূর্য যথাসময়ে উদিত হয়। সূর্য বলতে পারে না, "আজ শয্যা-চা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা যাক অথবা আজ তো রবিবার, তাই মিনিট পনের বা আধ ঘন্টার মত সময় শুয়ে বসে বিশ্রাম নিয়ে কাটানো যাক"। না, পরমপুরুষের নির্দিষ্ট বিধান এই যে সূর্যকে যথাসময়ে উঠতেই হবে। তাই পরমপুরুষের ভয়ে সেই বিধান মেনে সূর্যকে যথাসময়ে উদিত হতে হয়। যদি তিনি 'ভীষণ' না হতেন তাহলে বিশ্বের স্থিতাবস্থাই নষ্ট হয়ে যেত।

মানুষ তাঁকে ভালবাসে, ভক্তি করে কিন্তু সেই ভক্তি–ভালবাসার মধ্যে হয়তো নিরানববই ভাগই ভক্তি–ভালবাসা কিন্তু অন্ততঃ এক ভাগ ভয় তাতে মিশে রয়েছে।

"ভীষোদেতি সূর্যঃ ভীষাহস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ"। আগুনের কাছে কেউ গেলেই সে তাকে জ্বালিয়ে দেয়। কেন? না, আগুনের ধর্মই হ'ল জ্বালানো আর এই স্বভাবটা সে পেয়েছে নির্দিষ্ট বিধানের দরুণই। আর সেই বিধানটা কী? হ্যাঁ, ইংরেজীতে discipline শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে অনুশাসন। এই 'অনুশাসন' জিনিসটা কী রকম? 'হিতার্থে শাসনম্ ইত্যর্থে অনুশাসনম্'। যখন একটা কল্যাণের ভাবনা নিয়ে কোন বিধিবিধান প্রচলিত হয় তাকে সংস্কৃতে বলে 'অনুশাসন'। ইংরেজীতে 'অনুশাসন' শব্দের ঠিক সমার্থক শব্দ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরমপুরুষের ভয়েই আগুন তার কর্তব্য করে যায়। যদি আগুন তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী না জ্বালায় তাহলে পরমপুরুষ অসন্তুষ্ট হবেন কারণ সেক্ষেত্রে অগ্নি তার স্বীকৃত নিয়ম–শৃঙ্খলার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

"ইন্দ্র"। শব্দটির মানে হ'ল এনার্জি। বিদ্যুৎ বা electricity, চৌম্বক শক্তি বা magnetisim, আলোক বা light-এরা সবই শক্তি বা energy। প্রাচীন সংস্কৃতে এনার্জি অর্থে চলত 'ইন্দ্র' শব্দটি। বস্তুতঃ সংস্কৃতে 'ইন্দ্র' শব্দের কয়েকটিই মানে হয়–

যেমন একটি মানে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি সব চেয়ে বড় সব চেয়ে ভাল। 'দেবতানাং রাজা ইন্দ্রঃ ইতি কথ্যতে' অর্থাৎ দেবতাদের রাজাকে বলা হয় 'ইন্দ্র'। 'ইন্দ্র' মানে বড়। সংস্কৃতে কূয়োকে বলে 'কূপম্'। আর বড় কূয়োকে বলে 'ইন্দ্রকূপম্'। 'ইন্দ্রকূপ' থেকে প্রাকৃতে এল 'ইন্দরউঅ', তাই থেকে অর্ধপ্রাকৃতে ইন্দারা, পুরানো হিন্দীতে 'ইন্দারা', বর্তমান হিন্দীতে 'ইনারা', বর্তমান বাংলায় 'ইন্দারা'। 'ইন্দ্র' শব্দের আর একটি মানে হ'ল শালগাছ। কেননা, শাল হ'ল খুব বড় ও বলিষ্ঠ গাছ।

"ভীষোদেতি সূর্যঃ ভীষাহস্মাদ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ"। এই যে ইন্দ্র অর্থাৎ শক্তির দেবতা, এও পরমপুরুষের ভয়ে অনুশাসন মেনে কাজ করে যায়। এই যে ঘরের মধ্যে পাখাটি চলছে বৈদ্যুতিক শক্তির নিয়ম মেনে, কেন? না, এটাই পরমপুরুষের ইচ্ছা। বৈদ্যুতিক শক্তি অন্য বস্তুকে চালাবে। এই অনুশাসনকে উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ বলতে পারেনা, "না, আমি তা করব না"।

"মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ”। মৃত্যুর দেবতা যমরাজ (Pluto) পরমপুরুষের ভয়ে যথাসময়ে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে হাজির হয়ে যান। কেননা মৃত্যুর দেবতা– জানেন, যদি যথাসময়ে না যাই পরমপুরুষ অসন্তুষ্ট হবেন। তাই পরমপুরুষের বিধান মেনে তাঁকে যথাসময়ে সেখানে পৌঁছতেই হবে। যমরাজ বলতে পারেন না–না, আজ যাব না কারণ আজ দুর্গাপুজার ছুটি, ছুটি

কাটিয়ে পরে যাব। না, তাঁকে এক্ষুণি যেতে হবে। নির্দিষ্ট মুহূর্তেই যেতে হবে। বিনা নোটিশেই যেতে হবে।

বাড়ীর মালিক ভাড়াটের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেন? আমি যতদূর জানি, বাড়ীর মালিক ভাড়াটেকে বাড়ী ছাড়ার জন্যে আগাম নোটিশ দেন। সেই নোটিশ পেলে ভাড়াটেকে বাড়ী ছাড়তে হয়, অথবা ভাড়াটের ইচ্ছে গেলে বাড়ীর মালিকের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা করতে পারেন। ভাড়াটে তা করতে পারেন কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারে কোন নোটিশ জারি করা যায় না। কোন দিনক্ষণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় না। যমরাজ সরাসরি মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে পৌঁছে গিয়ে বলেন, "তৈরী হয়ে নাও, আমার সঙ্গে চলো"। যমরাজের এই ধরনের বলার অধিকার আছে কিন্তু কী করে, কেন, কার কাছে থেকে তিনি এই অধিকার পেয়েছেন? পরমপুরুষ যমরাজকে এই ধরনের কর্তব্য দিয়েছেন। তাই যমরাজকে যথাসময়ে নির্দিষ্ট মুহূর্তে সেই কর্ত্তব্য করতেই হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ঢিলেমি বা দেরী করা চলবে না। 'মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'–মৃত্যুকে তড়িঘড়ি নির্দিষ্ট কর্তব্যে ছুটে যেতেই হবে। তাঁকে যেতেই হবে, কোন প্রকার অন্যথাচরণ চলবে না।

"ভদ্রং"। সংস্কৃতে 'ভদ্র' মানে 'ভাল'। এই 'ভদ্র' থেকেই প্রাকৃতে 'ভল্লা', 'ভল্লা' থেকে অর্ধপ্রাকৃতে 'ভাল্লা', তাই থেকে

বর্তমান ৰাংলায় 'ভাল' এসেছে। 'ভাল' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল good; কোন gentleman-কে বাংলায় বলা হয় ভদ্রলোক (a good man)।

"নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং"। পরমপুরুষকে 'ভীষণ', আবার সেই সঙ্গে 'ভদ্র'ও বলা হয়েছে। ভদ্র কেন? কারণ তিনি যাই করুন, তাঁর তৈরী বিধান যাই হোক, ভেতরের ইচ্ছাটা হ'ল মানুষের কল্যাণ করা, মানুষের সেবা করা, মানুষকে সাহায্য করা। তাই ইচ্ছাটা যেখানে ভাল সেখানে তিনি অবশ্যই ভাল, অবশ্যই তিনি ভদ্র। এই জন্যে পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে 'ভদ্রং' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

"মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্”–'মৃত্যুমৃত্যু' মানে মৃত্যুর কাছে যিনি মৃত্যুস্বরূপ (death of death)। এর দু'টো মানে হতে পারে। একটা হ'ল বিশ্বের প্রতিটি সত্তা, প্রতিটি জীবিত প্রাণী মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু সেই মৃত্যুই আবার পরমপুরুষকে ভয় করে। তাই পরমপুরুষকে বলা হয় তিনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ। দ্বিতীয় মানে হ'ল যখন কোন মানুষ মারা যায় সে রূপ পাল্টে আবার পুনর্জন্ম নেয়। আবার তাকে মরতে হয়। আবার তার পুনর্জন্ম হয়। এই জন্ম–মৃত্যুর চক্র চলতেই থাকে। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম চক্রবৎ চলতে থাকে। কিন্তু একবার যদি সে পরমপুরুষে মিশে যায়, তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়

তখন কী হয়? না, তাতে তার মৃত্যু হ'ল ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর পর তার আর পুনর্জন্ম হবে না।বিতে দিত তাড়া

তাহলে পরমপুরুষের প্রতি যখন মানুষের গভীর অনুরাগ জন্মে ও সেই সময় তার মৃত্যু ঘটে, সেই মৃত্যু হ'ল মহামৃত্যু। এই ধরনের মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম হয় না। মহামৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যায়। তাই বলা হচ্ছে "মৃত্যুমৃত্যুং"।

এই জগতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের, এমনকি যার মধ্যে কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে তারও উচিত সমস্ত শক্তি–সামর্থ্যকে, সমস্ত চিত্ত বৃত্তিকে পরমপুরুষের দিকে পরিচালিত করা। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

(পটনা, ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৭

মানসিক উন্নতি ও কর্ম

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।।"

জন্মগত বিচারে সবাই শূদ্র। জৈবী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই শূদ্রের মুখ্য কাজ। তাদের পক্ষে অন্নই ব্রহ্ম। "অন্নং ব্রহ্মেতি”। মানুষ যখন আরও উন্নত হয়, তখন তারা শুধু অন্নকে ব্রহ্মের বিকাশ হিসেবেই দেখে না, তারা ব্রহ্মকে অন্য ভাবেও উপলব্ধি করে। কাজেই মানুষের কাছে ব্রহ্ম নিজেকে অভিব্যক্ত করেন অন্ন বা শস্যকণা হিসেবে। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ” বলতে এটাই বোঝায়।

পরবর্ত্তীকালে মানুষ বোঝে যে কেবল ভৌতিক অন্নই মানুষের ক্ষুধা দূর করে না। তখন কী হয়? "সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে"। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক এষণা জাগে। প্রাচীনকালে একে বলা হত বৈদিকী দীক্ষা। বৈদিকী দীক্ষায় মানুষের অতিজাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বেড়ে যায়। যখন অতিজাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগে তখন মানুষ করে কী? না, মনের সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যে তারা উপায় খুঁজতে থাকে। এ অবস্থায় তাদের বলা হয় দ্বিজ (যার দু'বার জন্ম হয়)। তাদের জীবনে প্রথম বার জেগেছিল অন্নের ক্ষুধা, দ্বিতীয় বার পরমাত্মার কৃপায় জাগে আর এক ধরনের ক্ষুধা। শুধু মাত্র স্থূল অন্ন দিয়ে এই দ্বিতীয় প্রকার ক্ষুধার উপশম হবে না।

"বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্রঃ”। বৌদ্ধিক ক্ষুধা সম্বন্ধে আমরা কী বলতে পারি? যাঁরা ধর্মশাস্ত্র বা ওই ধরনের মূল্যবান শাস্ত্র

অধ্যয়ন করেন জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে তাঁদের আমরা বলি বিপ্র (intellectuals)।

যখন পরমাত্মার কৃপায় মানুষ তান্ত্রিকী দীক্ষা পায় ও সাধনার দ্বারা তাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয় তাদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।

প্রথম স্তরে মানুষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে অন্ন হিসেবে....'অন্নং ব্রহ্মেতি'। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে কর্ম হিসেবে.... "কর্ম ব্রহ্মেতি কর্ম বহু কুর্বীত”।

কর্ম কী? বস্তুর স্থান পরিবর্তনকে বলে কর্ম। স্থান কী? প্রাথমিক আপেক্ষিক তত্ত্বসমূহের অন্যতম হ'ল স্থান–স্থান–কাল–পাত্র নিয়ে এই

আপেক্ষিক জগৎ। যেখানে কর্ম সেখানে স্থান–কাল–পাত্র তিনটে তত্ত্বকে থাকতেই হবে। পরমপুরুষ ইচ্ছে গেলে মনের ভেতরে কোন কিছু সৃষ্টি করে তাকেই আবার মনের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেন। কোন কিছু সৃষ্টিকালে সেখানে চলমানতা থাকবেই, আর যেখানে চলমানতা আছে সেখানে কর্মও আছে। আর যেখানে কর্ম আছে সেখানে স্থানিক, কালিক ও পাত্রিক এই আপেক্ষিক তত্ত্বসমূহের ৰন্ধনও আছে।

"কর্ম ব্রহ্মেতি কর্ম বহু কুর্বীত।” আমরা দেখতে পাই, জনসেবার জন্যে বা আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্যে যে কর্ম করা হয় তাতে বস্তুর স্থান পরিবর্তন হয় বৈ কি। জৈবী প্রগতির আদিম অধ্যায়ে সব মানুষের আমিত্ব-বোধটা ছিল কিছুটা পশুর মত। পরবর্তী কালে উন্নতির ধারা বেয়ে সেটা হ'ল মানুষের মত, আরও পরে একদিন হবে দেবতার মত-দেব-মানবের মত, শেষ ধাপে একদিন সে পরমাত্মায় গিয়ে মিশে যাবে। তাহলে চলার পথে রয়েছে চলমানতা, রয়েছে কর্ম....তাই "কর্ম বহু কুর্বীত”।

তাহলে বুদ্ধিমান লোকেরা কী করবেন? না, তাঁরা অধিক থেকে অধিকতর কর্মের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখবেন। নিজের প্রগতির জন্যে, সেই সঙ্গে অন্যের প্রগতির জন্যেও মানুষকে কর্ম করে যেতেই হবে।

এখন ধর, কোন মানুষ কর্ম করে যাচ্ছে কিন্তু সামনে কোন উপযুক্ত লক্ষ্য নেই। এই যে লক্ষ্যহীন চলমানতা, হতে পারে, মানুষ এতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। যেমন ধর, কেউ চুরি-ডাকাতি করল, সেটা কি কর্ম নয়? তাই ভাল কর্ম করতে গেলে উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির করতে হবে, খাঁটি পথে থেকে কর্ম করে যেতে হবে। "কর্ম ব্রহ্মেতি কর্ম বহু কুর্বীত”। কাজেই

কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ এগোয় বা পেছোয়। তাই কর্মমার্গে বিপত্তির সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কর্মকে ফলপ্রসূ হতে গেলে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্বাচন করতেই হবে।

কেউ কেউ জ্ঞানের ওপর জোর দেন। তাঁদের মতে জ্ঞান হ'ল, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”। সত্য কী? যার কোন পরিবর্তন হয়না, যা অপরিণামী তা–ই সত্য। আর জ্ঞানটা কী? সেই যে অনন্ত সত্তা, সেই যে সত্য অথবা ব্রহ্ম, সেই সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। তিনিই সত্য.... অনন্ত ব্রহ্ম।

এই ভাবেই মানুষ একদিন পরমপুরুষের কাছটিতে এসে যায়। সে অনুভব করে এই আসাটাও শেষ কথা নয়। অনুভব করতে হবে, "অহং ব্রহ্মাস্মি"...."সোহহম্”। পরমপুরুষের কাছটিতে আসাটাই যথেষ্ট নয়। তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'–কে পরমপুরুষে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দিতে হবে, ধ্যানের

সহায়তায় "আমিই ব্রহ্ম” এই ৰোধটাকে বাস্তব ঈশ্বরোপলব্ধিতে রূপান্তরিত করতে হবে আর এই ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে মানুষকে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণা অভ্যাস করতে হবে।

ধ্যানের স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল সমাধি। সমাধি কী? "আমিই সেই ব্রহ্ম”, **'সো হহং'–এই ঈশ্বরোপলব্ধির সর্বোচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই সমাধি।**

(পটনা ৮ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৮

গুরুপ্রণাম

আমার ধারণা, তোমরা সবাই একটা শ্লোকের সঙ্গে পরিচিত আছ। এখানে গুরুপ্রণামের শ্লোকটির কথা বলছি। কিন্তু শ্লোকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোধ হয় এর আগে কখনও খুঁটিয়ে বলা হয়নি।

"নিত্যানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।
বিশ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।”

প্রতিটি পংক্তির ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। 'নিত্যানন্দং' – নিত্যানন্দ মানে কী? পরমপুরুষকে নিত্যানন্দ বলা হয়েছে কেন?

জীব নিত্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ দুই–ই উপভোগ করে। মানুষ ভৌতিক বা জাগতিক বস্তু পেয়ে গেলে তা থেকে কিছুটা আপাতঃ সুখ বা আনন্দ উপভোগ করে। এটা হ'ল বিষয়ানন্দ। আর সাধনার দ্বারা ও পরমপুরুষের কৃপায় মানুষ যখন আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করে সেটা হ'ল নিত্যানন্দ।

এই যে বিশ্বজগৎ পরমপুরুষ এটা সৃষ্টি করলেন কেন? সৃষ্ট জীবকুলের জন্যে তিনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? অবশ্যই আনন্দের জন্যে। পরমপুরুষ স্বয়ং এক আনন্দঘন সত্তা। তাই পরমপুরুষের যে আনন্দ তা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। সেটা তাঁর মনেই উদয় হয়, মনেই স্থিত থাকে, মনেই তিনি তা উপভোগ করেন।

পরমপুরুষের আনন্দ দু' ধরনের–নিত্যানন্দ ও লীলানন্দ। নিত্যানন্দ জিনিসটা কী রকম? নিত্যানন্দ হ'ল পরমপুরুষের আত্মসন্তোষ (self-satisfaction)। তিনি নিজ অভ্যন্তরে যে আনন্দ উপভোগ করেন তা–ই নিত্যানন্দ। তিনি নিত্যানন্দে স্থিত ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। যখন এই বিশ্বসংসার ছিল

না তখনও নিত্যানন্দ ছিল, যখন বিশ্বসংসার থাকবে না (সৈদ্ধান্তিক স্তরের কথা) তখনও নিত্যানন্দ থাকবে।

আর লীলানন্দ ব্যাপারটা কী? পরমপুরুষ যখন নির্গুণ থেকে সগুণ (attributional or attributed conciousness) হলেন, এই লীলানন্দের সৃষ্টি হ'ল, তিনি লীলানন্দ উপভোগ করতে চাইলেন। তাহলে লীলানন্দ ব্যাপারটা কী? পরমপুরুষ এই সংসারে কত লক্ষ কোটি জড়-চেতন বস্তুর সৃষ্টি করেছেন, কত পুত্র-কন্যার সৃষ্টি করেছেন। তাদের নিয়ে তিনি খেলাধূলা করতে ভালবাসেন, তাতে আনন্দ পান। এইটাই পরমপুরুষের লীলানন্দ রূপ।

যাঁরা নিয়মিত সাধনা করেন ও সেই সঙ্গে যথেষ্ট বুদ্ধিও রাখেন, তাঁরা এই ব্যাপারটা বোঝেন। তাঁরা জানেন, এই বিশ্বচরাচরের সবটাই পরমপুরুষের লীলানন্দ রূপ। তিনি লীলানন্দ আস্বাদনের জন্যে তাঁর অজস্র সন্তানদের সঙ্গে খেলা করে চলেছেন। তাই পৃথিবীতে মানুষের চরম দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই সবই তাঁর লীলানন্দের ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা পর্যায়মাত্র।

শ্লোকের শুরুতেই 'নিত্যানন্দং' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। "হে পরমপুরুষ, তুমি সর্বদাই নিত্যানন্দে স্থিত রয়েছ”। 'নিত্য'

মানে স্থায়ী, শাশ্বত, চিরন্তন। কাজেই যা স্থায়ী বা শাশ্বত আনন্দ তা–ই নিত্যানন্দ।

পরবর্তী শব্দটা হচ্ছে 'পরমসুখদং”। ভৌতিক বা জাগতিক বস্তু থেকে মানুষ যে happiness বা অনুকূল মানসতরঙ্গ অনুভব করে তাকে বলে সুখ। আর এই যে সুখ এটা আসে সেই নিত্যানন্দ থেকে। তাই জীবের পক্ষে পরমপুরুষ হলেন 'পরমসুখদং'। এখানে শব্দটা শুধু 'সুখদং' নয়, শব্দটা হচ্ছে 'পরমসুখদং'। অর্থাৎ সেটা চরম ও পরম স্তরের সুখ, যত অধিক পরিমাণ সুখ কল্পনা করা যায় ততটা।

'কেবলং জ্ঞানমূর্তিং'। 'কেবল' মানে কী?' কেবল' মানে এক মাত্র সত্তা, অদ্বিতীয় সত্তা। অর্থাৎ পরমপুরুষের রাজত্বে, তাঁর অধিক্ষেত্রের মধ্যে পরমপুরুষের বাইরে আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। পরমপুরুষের অধিক্ষেত্রে শয়তানের কোন স্থান নেই, তার মানে শয়তান বলে কোন সত্তাও নেই। পরমপুরুষই সব কিছু। তাঁরই বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া নিয়ে লীলাময় লীলা করে চলেছেন। একমাত্র তিনিই আছেন। শুধু তাঁর অস্তিত্বই স্বীকৃত, অন্য কারো নয়। মানুষ যখন তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়, বলা হয় তাঁর কৈবল্যসিদ্ধি ঘটেছে। কৈবল্য মানে নির্বিকল্প সমাধি।

তোমরা মনে রেখো, শয়তানের ধারণা অদ্বৈতবাদী দর্শনের বিরোধী। যদি শয়তানকে মেনে নিই তাহলে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হচ্ছে দুই পরমপুরুষ আছেন। একজন উত্তম বা কল্যাণকৃৎ পরমপুরুষ, অপর জন অকল্যাণকৃৎ পরমপুরুষ–সম্পূর্ণতই যা একটা বাজে ধারণা। তাই শয়তান বলে কোথাও কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, অবিদ্যামায়ার প্রভাবে জগতে অনেক অকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বৈকি। আর অবিদ্যামায়া হিসেবে শয়তান সেই মায়ারই এক অংশ– মায়ার বাঁ হাত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতায় বলেছেন:–

"দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

বলছেন, এই যে দৈবী মায়া এ আমার মায়া। আমারই মায়িক শক্তি– "শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ।" যারা আমার আশ্রয় নেবে তারা আমারই শক্তিতে অতি সহজে এই মায়াকে অতিক্রম করে যাবে। দৈবী শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে এই মায়াকে অতিক্রম করা সুদুষ্কর। তাই এই মায়াকে অতিক্রম করতে গেলে মানুষকে পরমপুরুষের অর্থাৎ কৃষ্ণের সাহায্য নিতেই হবে।

'কেবলং জ্ঞানমূর্তিং'। 'জ্ঞানমূর্তি' মানে চিতিশক্তি যেখানে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছেন (Cognitive faculty personified / personified cognition).

"বিশ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্”। 'বিশ্বাতীত' মানে কী? যখন ভূমাচৈতন্যের কর্মভাবাত্মক কোন কিছু সৃষ্ট হয়, যখন প্রকৃতির তমোগুণী শক্তির কঠোর তত্ত্বাবধান ও ৰন্ধনের প্রভাবে স্থূল বস্তুগত কিছু সৃষ্ট হয়, দার্শনিক পরিভাষায় তাকেই বলা হয় বিশ্ব। বিশ্ব হ'ল পরমপুরুষের কর্মভাবাত্মক অভিব্যক্তি (Objective counterpart)। আর যেহেতু বিশ্ব তাঁর কর্মভাবাত্মক রূপান্তরণ তিনি বিশ্বের অধিক্ষেত্রের বাইরে–তাই তিনি 'বিশ্বাতীত'। এখন, তাই গগন বা আকাশ মানে যেখানে কোন দৈশিক সীমারেখা অঙ্কন করা যায় না, তেমনি ভূমা আধারকেও কোন সীমার ৰন্ধনে বাঁধা যায় না। তাই তাঁকে বলা হয় 'গগনসদৃশং'।

'তত্ত্বমসি'। কোন সাধক পরমপুরুষের সান্নিধ্যে এসে তাঁকে যদি প্রশ্ন করেন, "আমি কী, আমি কে? Who am I, কোহহম্?” যখন পরমপুরুষের কাছে মানুষ এই চিরন্তন প্রশ্নটা উত্থাপন করে, সে ক্ষেত্রে পরমপুরুষের উত্তর হ'ল: "তত্ত্বমসি".... তুমিই সেই ব্রহ্ম; Thou art that; Thou art Supreme Entity"। আমি ইতোপূর্বে কয়েক বারই বলেছি, মানুষের সাধনা হ'ল ইলেক্ট্রনিক

ইম্পারফেকশন থেকে নিউক্লিয়ার পারফেকশন লাভ। এই ইলেক্ট্রনিক ইম্পারফেকশন হলে তুমি মানুষটা, আর নিউক্লিয়ার পারফেকশন মানে সেই পরমপুরুষ। তুমিই সেই ব্রহ্ম। আর এই যে তুমি তিনি হবেন–এই হওয়াটাই হ'ল সাধনা। এই যে ফাঁকটা–"হওয়াটা", এই ফাঁকটাকে পূরণ করতে হবে সাধনার দ্বারা।

গুরুর বক্তব্য, গুরুর গোপন শিক্ষা, গোপন সংকেত হ'ল, "দেখ খোকা/খুকু, তুমিই হলে সেই পরম ব্রহ্ম"। যে সত্তা এই তত্ত্বটা, এই গূঢ় তত্ত্বটা তোমাকে বলে দিলেন, "তুমিই হচ্ছ সেই পরম ব্রহ্মা," সেই সত্তাটাই হলেন গুরু। মনে হয়, এবার তোমরা জিনিসটা ভালভাবে বুঝে নিয়েছ।

(পটনা, ১০ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৬৯

"সদ্গুরুং তং নমামি"

গতকাল যে বিষয়টার অবতারণা করেছিলুম আজ তার শেষ অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব।

"একং নিত্যং বিমলচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।।"

"একং নিত্যং"। মানসাতীত কোন সত্তা সম্পর্কে, সগুণ অথবা নির্গুণ কোন সত্তা সম্বন্ধেই আমরা বলতে পারি না, তিনি এক বা একাধিক। কারণ, তিনি তো ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসেন না যে তাঁকে কোন প্রকারে দেখিয়ে দেব। সেই বৃহৎ সত্তা সম্বন্ধে বলতে পারব না যে তিনি এই ধরনের বা ওই ধরনের। কাজেই তাঁর সম্পর্কে 'এক', 'দুই', 'তিন', 'চার' এই ধরনের সংখ্যাবাচক উক্তি করা বৃথা।

তবে কেউ যদি সেই পরম সত্তায় নিজেকে সমাহিত করতে চায় তাহলে তার মনকে সূচ্যগ্র করতে হবে, এক বিশেষ বিন্দুতে মনকে নিৰদ্ধ করতে হবে।তাই পরম ব্রহ্মের জন্যে যদি কখনো সংখ্যাবাচক কোন বিশেষণ বা আর্টিকল ব্যবহার করতেই হয় তাহলে সেটা হবে 'এক'। এই কারণেই বর্তমান শ্লোকটিতে 'এক' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। পরম ব্রহ্ম হলেন অদ্বিতীয় সত্তা (singular entity)। 'একং' বলতে এখানে এক সত্তা বিশেষকে বোঝাচ্ছে না–বোঝাচ্ছে এই যে, মনকে যখন

তাঁর সান্নিধ্যে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন তাকে একটা সূক্ষ্ম বিন্দুতে একাগ্র করার প্রয়াস করা হচ্ছে।

"নিত্যং”। এই বিশ্বের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই ফ্ল্যো (flow) বা রসপ্রবাহ রয়েছে (বাস্তবে এই 'ফ্ল্যো' জিনিসটা সর্বত্রই আছে), আর তা' ভূমা অথবা অণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তার ব্যক্তীকরণ থাকবেই। আর যখন সেই রসপ্রবাহ বা ফ্ল্যো অণু–ভূমা কারো সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়, তার বাহ্যিক অভিব্যক্তি থাকে না কিন্তু ফ্ল্যো থাকবেই। যার ফ্ল্যো আছে কিন্তু তা' অণুমানস বা ভূমামানসের সঙ্গে সম্বন্ধিত হচ্ছে না, এমন সত্তাকে বলা হয় 'নিত্যং'। তাই শুধু সগুণ অথবা তারক ব্রহ্মই নন, নির্গুণ ব্রহ্মও নিত্য সত্তা।

সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে 'নিত্যং' মানে যা অপরিণামী (non-metamorphic)। যা কখনও পরিবর্তিত হয় না, যা বিবর্তনের আওতায় আসে

না, যার কখনো রূপান্তরণ ঘটে না তা–ই 'নিত্যং' অর্থাৎ যা ছিল, আছে, থাকবে। 'অনিত্যং' মানে দেশ–কাল–পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যার রূপ- বিবর্তন ঘটে। যে পরম সত্তা ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা দেন তিনি অবশ্যই 'একং নিত্যং'।

"বিমলচলং”। 'অচলম্' মানে যা সুদৃঢ় (strong), সরলভাবে দণ্ডায়মান (erect), পর্বতসদৃশ (mountain-like)। 'বিমলং' মানে নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ (spotless)। তাই উত্তুঙ্গ পর্বতসদৃশ সু–উন্নত নিষ্কলুষ ব্যষ্টিত্বকে বলা হয় 'বিমলচলং'। এখানে তুলনা করা হয়েছে 'অচলম্'–এর সঙ্গে। এই আপেক্ষিক জগতে স্থান ত্যাগ করে না, নড়াচড়া করে না কেবল পাহাড়–পর্বতেরা আর অবস্থান পাল্টায় না মৌল অধ্যাত্মনীতিগুলি। ওই মৌল অধ্যাত্মনীতির যিনি বিশ্বস্ত প্রতিভূ তাঁকেও পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেন? না, নাগ বা পর্বত কখনও আপন অবস্থান থেকে নড়েচড়ে না, নীতি থেকে মূল বৈশিষ্ট্য বা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না।

"সর্বধীসাক্ষীভূতম্”। ব্রহ্মচক্রের প্রতিসঞ্চর ধারায় আমরা কী লক্ষ্য করি? স্থূল জড় চূর্ণীভূত হয়ে সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে জড় থেকে চিত্ত, চিত্ত থেকে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এই ভাবেই বিবর্তনের ধারা বেয়ে মাইক্রোকজম্ বা অণুমনের সামগ্রিক বিকাশ ঘটে থাকে।

এখন, তথাকথিত স্থূল জড়েও তো মন রয়েছে যদিও তা রয়েছে প্রসুপ্ত অবস্থায়। আর যেহেতু সেই মনটা থাকে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, তাই তার ক্রিয়াশীলতা আমাদের নজরে পড়ে না। জড়ের মধ্যে

আমরা মনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি না। তাই তা স্বীকারও করি না। তার মানে এই নয় যে মন নেই। মন অবশ্যই আছে কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করি না, খুঁজে পাই না। এই যে জ্ঞানভৌমিক অনুপপত্তি বা অপূর্ণতা, এই যে ত্রুটি –এই ত্রুটিটা তো আমাদের খণ্ড খণ্ড জড় সত্তাগুলোর নয়। আর যেখানে মন আছে তা উন্নত বা অনুন্নত যাই হোক, প্রত্যাগাত্মার প্রতিফলন তাতে থাকবেই। আর এই প্রতিফলিত চৈতন্যই হ'ল জীবাত্মা। যেখানে জীবাত্মিক প্রতিফলন পর্যাপ্ত নয় বা স্ফুটতর নয় সেক্ষেত্রে কী হয়? –না, প্রত্যাগাত্মা স্বয়ং জীবাত্মার কাজগুলো করে দেন। আর যেখানে জীবাত্মিক প্রতিফলন স্পষ্টতর সেখানে জীবাত্মার কাজ প্রত্যক্ষভাবে জীবাত্মা তো করেই, পরোক্ষভাবে প্রত্যাগাত্মাও কিছুটা করে দেন। মানুষের ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে থাকে।

অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের মধ্যে জীবাত্মার প্রকাশ ব্যাপকতর কারণ মানুষের মন অন্যান্য জীবের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। এই কারণেই তো তাকে বলা হয় 'মনুষ্য' (মনু + ষ্য) অথবা 'মানব' (মনু + ষ্ণ)। মনুষ্য বা মানব মানেই মননশীল জীব.... মনপ্রধান জীব–জড়প্রধান নয়।

"সর্বধীসাক্ষীভূতম্'। বিকশিত, অবিকশিত অথবা অর্ধবিকশিত যাই হোক না কেন, সকল জীবের সকল মনের

সাক্ষীসত্তা পরমপুরুষ। স্থূল–সূক্ষ্ম, উন্নত–অর্ধোন্নত–অনুন্নত মন যা–ই হোক না কেন, সে যা কিছু করে বা ভাবে পরমপুরুষ তা জেনে নেন। বৃক্ষ–লতা–গুল্ম–ঔষধীয় উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি অবিকশিত সত্তারা, গোরু–বানর–কুকুর প্রভৃতি অবনত জীবজন্তুরা, অথবা মানুষের মত উন্নত মননশীল প্রাণীরা মনে মনে যাই করুক বা ভাবুক, সাক্ষীসত্তা পরমপুরুষ তা বিলক্ষণ জেনে যান। তাঁকে লুকিয়ে কোন কিছু করবার জো নেই। যে যা করবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে নেন। কারও কোন কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

পরমপুরুষ “সর্বধীসাক্ষীভূতং', আর যেহেতু তিনি সর্বজীবের সকল মনের সাক্ষীসত্তা, তাই এতে মানুষের পক্ষে যেমন সুবিধা আছে তেমনি একটা অসুবিধাও আছে। অসুবিধা এই কারণে যে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কেউ কখনো কোন কিছু করতে পারবে না। যে যা করবে বা ভাববে তিনি তৎক্ষণাৎ তা জেনে নেবেন। মানুষের পক্ষে সেটা একটা মস্ত অসুবিধা বৈ কি! সেক্ষেত্রে সে তো নিজের একটা অকর্ম ঢাকতে পারছে না। আর সুবিধাগুলো কী কী? যেহেতু তিনি সব কিছু দেখছেন, তাই তিনি সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকছেন। তুমি কখনও কোন অবস্থাতেই একলা নও। মানুষের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় সুবিধা নিশ্চয়ই।

এখন, 'ভাবাতীত' বলতে কী বোঝায়?

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।"

ভাব জিনিসটার দু'টো তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে–১) অণুজীবের ভাবপ্রবণতার বহমানতা (sentimental flow of the microcosm); ২) আধ্যাত্মিকতার সাততিক প্রবহমানতা (Perennial flow of spirituality)। ইংরেজীতে আধ্যাত্মিকতা বোঝাতে গিয়ে spiritualism শব্দের পরিবর্তে spirituality শব্দের ব্যবহার করাই ভাল কেননা spiritualism মানে প্রেততত্ত্ব.... ভূত–প্রেত সম্পর্কিত বিদ্যা। এর জন্যে যথার্থ শব্দ হচ্ছে spirituality। অণুমানসের যে বৈয়স্টিক চেতনাপ্রবাহ ও আধ্যাত্মিক এক সাততিক প্রবহমানতা–এ দু'য়ের মধ্যে যে একটা সুন্দর সমান্তরালতা, তাকেই বলে 'ভাব'।

'ভাবাতীত'। পরমপুরুষের অধিষ্ঠানস্থল হ'ল ভাবেরও উর্ধ্বে... ভাবাতীত ভূমিতে। ভাব জিনিসটা বড় জোর তাঁর একান্ত কাছটিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে.... তাঁর দরজায় করাঘাত করতে পারে কিন্তু অন্দরমহলে ঢুকতে পারে না। এটাই আসল কথা। দরজায় কড়া নাড়তে পারে কিন্তু ভেতরে ঠিক জায়গাটিতে ঢুকতে পারে না।

'ত্রিগুণরহিতং'। তোমরা জান যে শক্তিত্রিকোণে যতক্ষণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বজায় থাকছে ততক্ষণ কোন প্রকার অভিব্যক্তিই (manifestation) হয় না। সৃষ্টির আদি কারণ (noumenal cause) আপন স্বরূপে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু যে মুহূর্তে শক্তিত্রিকোণের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অমনি এক কৌণিক বিন্দু থেকে সৃষ্টিমাতৃকা শক্তি বহির্গত হয়ে যাচ্ছে, সৃষ্টির ধারাবাহিকতার প্রাথমিক স্ফুরণ শুরু হচ্ছে। সুতরাং পরমশিব, সদ্গুরু ও তারক ব্রহ্ম গুণত্রিকোণের অধিক্ষেত্রে পড়েন না। তাঁদের ক্ষেত্রে গুণত্রিকোণের সাম্যাবস্থা পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে "ত্রিগুণরহিতং”।'

"প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্
গুনহীনমহেশগণাভরণম্।।”

–হে পরমেশ্বর, তুমি সৃষ্টির সব কিছুর চরম নিয়ন্ত্রক। কিন্তু তোমার কোন নিয়ন্ত্রক নেই। তোমার গুণেরও কোন আদি–অন্ত নেই। তোমার অনন্ত গুণরাশির পরিমাণ কেউ কখনো গুণে শেষ করতে পারবে না।

তোমাদের বলেছিলুম যে একবার অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হয়ে কবি পদ্মদন্তকে অনুরোধ করেছিলেন ঈশ্বরের অনন্ত গুণরাজি

সম্পর্কে একটা কাব্য রচনা করতে। প্রভু কেমন, তাঁর গুণরাশিই বা কত ইত্যাদি নিয়ে গুছিয়ে কাব্য রচনার অনুরোধ পেয়ে কবি লিখেছিলেন–

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালম্।
তথাপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখানে 'কবি' মানে আধুনিক কাব্য–কবিতা রচয়িতা বা পোয়েট নয়, প্রাচীন সংস্কৃতে 'কবি বলতে বোঝাত তত্ত্ব–দ্রষ্টা....সত্যদ্রষ্টা (seer of truth)।

এখন, লিখতে গেলে কী কী জিনিসের দরকার? কালি, দোয়াত, কলম, কাগজ, লেখক ইত্যাদি। কবি পদ্মদন্ত লিখলেন– কালির বড়িটা যদি হয় প্রকাণ্ড হিমালয় পর্বতের মত, যদি বিশাল পৃথিবীর সব কটি মহাসাগর মিলে হয় দোয়াত, যদি স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষের শাখা হয় লেখবার কলম, আর এই সমগ্র ধরাপৃষ্ঠ যদি হয় কাগজ, আর যদি স্বয়ং বিদ্যাদেবী সরস্বতী এই ধরনের কালি, কলম, কাগজ ও দোয়াত নিয়ে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের গুণরাজির কথা লিখতে থাকেন তবুও, হে ঈশ্বর, তোমার গুণপনা লিখে শেষ করা যাবে না।

"গুণহীনমহেশ গণভরণম্"। তোমরা লক্ষ্য করেছ, প্রায় সকল দেবী-দেবতার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, মাথায়, কপালে, গলদেশে, কোমরে, হাতে, পায়ে কত আভরণ-আভূষণ শোভা পায়। কিন্তু আমার পরমপুরুষের অত শত নয়, কেবল একটিই তাঁর অলংকার-তাঁর ভক্ত শিষ্যবৃন্দ।

"সদ্গুরুং তং নমামি"। সদগুরু বলতে ঠিক কী বোঝায়? 'গু' মানে- অন্ধকার, 'রু' মানে বিদূরক। তাহলে 'গুরু' শব্দের মানে দাঁড়াচ্ছে যিনি মানুষের মনের যাবতীয় অন্ধকার দূর করে দেন। যে মানুষটি যত্ন করে তোমাকে আলিফ-বে-পে-তে অথবা অ-আ-ক-খ শিখিয়েছেন তিনি অবশ্যই তোমার গুরু। যিনি মানুষকে সংগ্রামের কলাকৌশল শিখিয়েছেন তিনিও গুরু। যিনি অন্যকে রন্ধন পদ্ধতি শেখান তিনিও গুরু। যিনি মানুষকে বৈদিকী দীক্ষা দেন তিনিও গুরু। তাহলে দেখছ, মানুষের একাধিক গুরু থাকতে পারেন।

এখন প্রশ্ন, বৈদিকী দীক্ষা ব্যাপারটা কী? প্রাচীন ভারতে দীক্ষা ছিল মুখ্যতঃ দু' ধরনের-বৈদিকী দীক্ষা ও তান্ত্রিকী দীক্ষা। খুব কম বয়সে মানুষকে বৈদিকী দীক্ষা দেওয়া হত। এই দীক্ষায় মূলতঃ পরমপুরুষের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলা হত, "হে পরমপুরুষ, তুমি আমাকে খাঁটি পথ দেখাও"। এতে যদি

পরমপুরুষ সন্তুষ্ট হতেন তবে পরে তাঁর কৃপায় মানুষ তান্ত্রিকী দীক্ষা পেত। প্রসঙ্গতঃ বলি, আনন্দমার্গ দীক্ষা হ'ল তান্ত্রিকী দীক্ষা। যিনি মানুষকে এই তান্ত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত করেন তিনিও গুরু।

এঁরা সবাই গুরু কিন্তু সদগুরু কে? 'সৎ' মানে অপরিণামী.... যার কোন রূপবিবর্তন ঘটে না.... যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। আধুনিক সংস্কৃতে 'সৎ' মানে ধরা হয় 'honest', 'অসৎ' মানে ধরা হয় 'dishonest'। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে 'সৎ' মানে বোঝাত অপরিণামী সত্তা।

"নাসদাসীন্নো সদাসীওদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নন্তঃ কিমাসীদাহনং গভীরম্।।"

'সৎ'। যে সত্তার কৃপায় মানুষ সেই সদ্বস্তুর (এখানে 'সৎ' মানে অপরিণামী, অবিকারী সত্তা যার চারিপাশে অজস্র বিদ্যুতণু ঘুরে চলেছে) সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পায় সেই সংরচনা (যার মাধ্যমে পরমপুরুষ তথা তারকব্রহ্ম কাজ করে যান) হলেন সদগুরু। "সদগুরুং তং নমামি"–সেই সদগুরুর চরণতলে আমি লক্ষ কোটি প্রণাম নিবেদন করি।

(পটনা, ১১ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭০

'সংগচ্ছধ্বম্'

আজ আর একটা জনপ্রিয় বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করব। শ্লোকটা হচ্ছে–

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবাভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে। সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্ত বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি”।

'সংগচ্ছধ্বং'। এখানে উপসর্গ 'সং' মানে হচ্ছে সম্যক্ রূপে, সম্যক্ পদ্ধতিতে, সম্যভাবে, সম্যক্ ছন্দে। এই বিশ্বের সব কিছুই একক ভাবেও এগিয়ে চলেছে, আবার সামগ্রিক ভাবেও এগিয়ে চলেছে। এখন এই এগিয়ে চলা বা চলমানতা ৰলতে ঠিক কী বোঝায়? চলা মানে বস্তুর স্থান পরিবর্তন। চলামনতা মানেই গতি। সংস্কৃতে 'গম্' ধাতুর অর্থ হ'ল চলা। এই চলাটা জীবনেরই দ্যোতক। সুতরাং প্রত্যেক জীবিত সত্তাকে এগিয়ে চলতেই হবে। এর অন্যথা হতে পারে না।

কিন্তু সকল চলাই তো আর 'সংগচ্ছধ্বং' নয়। 'সমাজটা কী? সমাজ তৈরীই বা হয় কী করে? "সমানম্ এজতি ইতি সমাজঃ।” 'এজতি' মানে 'গচ্ছতি' অর্থাৎ যা চলছে। গতির জন্যে বা চলার জন্যে সংস্কৃতে কয়েকটিই ক্রিয়া রয়েছে–'গচ্ছতি', 'চলতি', 'চরতি', 'ব্রজতি', 'এজতি' ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্নিহিত অর্থও রয়েছে।

সমাজে রয়েছে অনেক মানুষ যারা এক সঙ্গে এগিয়ে চলছে। এখানে 'এক সঙ্গে চলছে' অর্থে কেবল এগিয়ে চলা বা দ্রুত তালে এগিয়ে যাওয়াই নয়। 'এক সঙ্গে চলছে' মানে হচ্ছে সমাজের সকল অংশের মানুষই সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক সঙ্গে এগিয়ে চলার ভাব নিয়ে চলে চলেছে। ধর, তুমি অনেক টাকা সঞ্চয় করেছ। তোমার বাড়ীতে কোন খাদ্যাভাব নেই। কিন্তু সমাজের বাকী লোকেরা অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশীরা, ৰন্ধুৰান্ধবেরা অর্থাভাবে, খাদ্যাভাবে, বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। তার মানে তুমি 'সংগচ্ছধ্বং'-এর প্রকৃত তাৎপর্য মেনে চলছ না। 'সংগচ্ছধ্বং' মানেই হচ্ছে একটা মজবুৎ, দৃঢ়নিৰদ্ধ সমাজ তৈরী করা যেখানে কোন শোষণ নেই, কোন মহামন্যতা বা হীনম্মন্যতা ৰোধ নেই।

'সংগচ্ছধ্বং'–এর প্রকৃত তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই আমি 'প্রাউট' তত্ত্ব দিয়েছি। সত্যি বলতে কি এই পুরো 'প্রাউট' তত্ত্বটাই এই বৈদিক 'সংগচ্ছধ্বং' মন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

'সংবদধ্বং'। সংস্কৃত 'বদ' ধাতুর অর্থ হচ্ছে বলা। কথা তো সবাই ৰলে, তাহলে 'সংবদধ্বং'–এর মূল ভাবটা কী?
'সংবদধ্বং' মানে তুমি সেই পরম ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হবে যা তোমাকে দ্ব্যর্থহীন–ভাবে কথা বলতে শেখাবে। অর্থাৎ তোমার ভাষা কোন মতেই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হবে না। তোমার ভাষা অবশ্যই স্পষ্ট, চূড়ান্ত ও নিশ্চিত হতে হবে।

'সং বো মনাংসি জানতাম্'। বহুবচনাত্মক 'বঃ' শব্দের মানে হচ্ছে 'তোমাদের'। বহু পুরোনো বৈদিক সংস্কৃত হ'ল 'বঃ'। লৌকিক সংস্কৃতে অর্থাৎ অর্বাচীন সংস্কৃতে 'তোমাদের' জন্যে শব্দ হচ্ছে 'যুষ্মাকম্' কিন্তু পুরোনো বৈদিক সংস্কৃতে 'বঃ' চলত। মূল শব্দ হচ্ছে 'বঃ'; যেমন 'অস্', 'অহ্', 'অঃ' এই ধ্বনি তিনটি সমার্থক অর্থাৎ একই পর্যায়ভুক্ত। সেই রকম শব্দটি হচ্ছে 'বঃ'। 'সং বো মনাংসি জানতাম্”। –একে গদ্যে রূপান্তরিত করলে দাঁড়াবে "বো মনাংসি সংজানতাম্”।

তোমাদের জানা উচিত যে সমগ্র সৃষ্টির উৎস ও সমস্ত অণুজীবের উৎস হচ্ছেন পরমপুরুষ। সেই পরমপুরুষ থেকেই

সমস্ত অণুজীব এসেছে। তোমাদের কখনই এই মূল সত্যকে ভোলা উচিত নয়। বিভিন্ন অণুজীবের মধ্যে যে পার্থক্য তার কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যেকার সংস্কারগত তারতম্য। কিন্তু তোমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে সমস্ত অণুসত্তারই উৎস হচ্ছে এক চরম সত্তা–এক ও অদ্বিতীয় ভূমা সত্তা। এরূপ চেতনা থেকেই মানুষে মানুষে সম্পর্কটা আরও নিৰিড় ভাবে গড়ে উঠবে। "সং বো মনাংসি জানতাম্” –এই সত্যকে তোমাদের জানা উচিত, এ তথ্যকে তোমারা কখনো ভুলো না।

"দেবাভাগং যথা পূর্বে সংজনানা উপাসতে"। এখানে 'দেব' শব্দ সংস্কৃতে 'দিক্' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। 'দিক্' ধাতুর মানে হচ্ছে দৈবী অস্তিত্ব। সুতরাং 'দেব' মানেও তাই দৈব অস্তিত্বকেই বোঝায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন–

"দ্যোততে ক্রীড়তে যস্মাদুদ্যতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ সূয়তে সর্বদেবতৈঃ।।”

পরমপুরুষ থেকে উৎসারিত সমস্ত তরঙ্গরাজি, সমস্ত স্পন্দনধারাই 'দেব' নামে আখ্যাত। 'দেবাভাগং যথা পূর্বে'–অর্থ হচ্ছে অতীতের সমস্ত রকম দৈবী তরঙ্গরাজি। এখানে 'অতীত' শব্দটা ব্যবহার করলুম কেন? কারণ, মানব সভ্যতার সেই

সুপ্রাচীন ঊষাকাল থেকে অজস্র তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে চলেছে। কর্মগত ক্ষেত্রে এই তরঙ্গরাজির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সাম্য ও ঐক্য সব সময়ই বজায় থেকেছে। আলো–জল–হাওয়া–শ্বাস–প্রশ্বাস বা অন্য যে কোন জিনিসের কথা নিই না কেন। এগুলির প্রয়োজন প্রত্যেকটি জীবের ক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য। এসব ব্যাপারে কোন তারতম্যই ছিল না বা নেই। যে তারতম্য বা বৈষম্য আজকের সমাজে আমরা দেখছি তা সুবিধাবাদীদের সৃষ্টি–যারা নীচ, হীন, দুর্নীতিপরায়ণ এসব তাদের সৃষ্টি। সুতরাং দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদের এই ধরনের কর্মগত ত্রুটিগুলিকে তোমাদের সমর্থন করা উচিত নয়। তোমাদের সব সময় দৈবী স্পন্দনাত্মক ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা উচিত। মানুষে মানুষে এই যে আপাতঃ পার্থক্য এগুলোকে তোমরা বড় করে দেখবার চেষ্টা করো না।

"দেবাভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে"। দিব্য দ্যোতনার স্বভাব হচ্ছে এই যে তাতে কোন ভেদভাব থাকে না। কোন শোষক–শোষিতের সীমারেখা থাকে না। কাজেই এই ধরনের কোন ভেদভাব সৃষ্টি না করাটাই ছিল তাদের কর্ত্তব্য, তাদের উপাসনা, তাদের আস্তিত্বিক প্রগতির মূল লক্ষ্য।

"সমানী ব আকৃতিঃ”। এই বিশ্বের সব কিছু যখন একই উৎস থেকে, একই সৃষ্টিকর্তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে আর শেষ

পর্যন্ত যখন সব কিছুই সেই চরম বিন্দুতেই ফিরে যাচ্ছে তখন সকল ব্যষ্টিসত্তার অন্তরের আশা-আকাঙক্ষা, এষণা- আকৃতি এক হতেই হবে। কিন্তু কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের হীন অকর্মের ফলে যারা শোষিত, যারা অবহেলিত তারা সেই মূল লক্ষ্যকে ভুলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছে। এটা হতে দেওয়া ঠিক নয়। পরমপুরুষের জন্যে প্রত্যেকের আশা-আকাঙক্ষার পরিপূর্ত্তির পূর্ণ সুযোগ থাকা উচিত।

"সমানা হৃদয়ানি বঃ"। এই বিশ্বের সব কিছুই যখন এক পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়ে একই পথ ধরে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তখন মানুষে মানুষে কি কোন প্রকার ভেদভাব থাকা উচিত? না, তা থাকা কখনও উচিত নয়। সকলকেই যেমন সুযোগ দিতে হবে, সকলের জন্যেই এমন অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে হবে যাতে কেউ কখনো ভাববার সুযোগ না পায় যে তার ভাগ্যের দ্বার চিরকালের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তাই সকলেই যেন অনুভব করে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সবাই এক বৃহত্তর মানব পরিবারের সদস্য।"এক চৌকা, এক চুল্হা, এক হ্যায় মানব সমাজ"।

"সমানমস্ত বো মনঃ"। এক ভূমা সত্তা থেকে সব অণু সত্তা উদ্ভুত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সবাই সেই এক ও অদ্বিতীয় ভূমা

সত্তাতেই মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। তাই অণুসত্তাসমূহ যতদিন সমাজের মধ্যে রয়েছে, বা খণ্ড ব্যক্ত জগতে রয়েছে ততদিন তাদের এই চরম সত্যটা মনে রাখা উচিত যে স্বরূপতঃ তারা এক ও অভিন্ন, তবে সেই এক সত্তা ভিন্ন ভিন্ন আধারে নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছে। আর যখন এটা মনে থাকবে, আর এই মনে রাখাটা এমন কোন শক্ত ব্যাপার নয়, তখন হবে কী? – না, তখন একটা সত্যিকারের মানুষের সমাজ তৈরী হবে। সকল মানুষের জন্যে সার্থক সমাজ তৈরী হবে। মানুষ মাত্রেরই এটা হ'ল মহত্তম কর্তব্য, জীবনের সব চেয়ে বড় ব্রত। যারা এই তত্ত্বটাকে মানতে চায় না, যারা এই তত্ত্বটাকে ভুলে থাকতে চায় তারা আসলে মানব সমাজের শত্রু। যারা জাতপাত, জাতিবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, সঙ্কীর্ণতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এমনকি আন্তর্জাতিকতাবাদকে সমর্থন জানায় তারা বৃহত্তর মানব সমাজের শত্রু। মানুষের সমাজ কেবলমাত্র একটি 'ইজম্'–এর ওপরেই আধারিত হওয়া উচিত আর সেই 'ইজম্' হ'ল ইয়ূনিবার্য্যালিজম্ বা বিশ্বৈকতাবাদ।

(পটনা, ১২ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭১

সাধকের ন্যূনতম যোগ্যতা

পার্বতী শিবকে জিজ্ঞেস করলেন, সাধক হবার ন্যূনতম যোগ্যতা কী? উত্তরে শিব বললেন, "সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপুয়াৎ"। জীব যখন নিজের কর্মফলের দরুণ মানুষের শরীর পায় কেবল তখনই সে সাধক হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

পার্বতী এর পরই জিজ্ঞেস করলেন, "সাধনা করবার জন্যে আর কী কী গুণ থাকা দরকার, যেমন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি?" বয়স সম্বন্ধে ৰোধ হয় একথা বলা সঙ্গত হবে যে মানুষের জীবনে মূলতঃ চারটে পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বিদ্যার্জন করা ও সেই সঙ্গে ধর্মাচরণ করা; দ্বিতীয় পর্যায়ে সাংসারিক কর্ত্তব্য করা ও সেই সঙ্গে ধর্মাচরণ করা; তৃতীয় পর্যায়ে সংসারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা ও সেই সঙ্গে ধর্মাচরণ করা। আর শেষ পর্যায়ে এসে যখন শরীরটা জাগতিক কর্মের পক্ষে অযোগ্য অক্ষম হয়ে পড়ে তখন কেবল ধর্মাচরণ করা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাধকের পক্ষে ধর্মাচরণের ব্যাপারে বয়স কোন কালেই বাধা নয়।

এ প্রসঙ্গে একটা পুরোনো গল্প প্রচলিত আছে। ধ্রুব নামে পাঁচ বছরের একটি ছোট শিশু ওই অতটুকু বয়সেই খুব করে সাধন-ভজন শুরু করল। বড় বড় মুনি-ঋষিরা তা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর ভাবলেন, ছেলেটি নিশ্চয় আধ্যাত্মিক সাধনায় ওঁদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। ওঁরা নারায়ণকে গিয়ে ধরলেন একটা কিছু করতে যাতে ধ্রুবর কাছে ওদের পরাজিত ও হেয় হতে না হয়। নারায়ণ সমস্যাটার সমাধানের জন্যে নারদকে পাঠালেন। 'নারদ' নামের মানে যিনি জনসাধারণের মধ্যে ভক্তি বিতরণ করেন।

যাই হোক, নারদ ধ্রুবর কাছে এসে নানান ভাবে তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন। তাকে খেলনা দিয়ে, মিষ্টি দিয়ে, তাতেও না ভুললে রাজত্ব বা ওই ধরনের বহু লোভনীয় জিনিস দিয়ে ধ্রুবর মন জয় করতে চেষ্টা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ধ্রুব, তুমি এতটুকু ছেলে, এত কম বয়সে সাধন-ভজনের দিকে তুমি এত বেশী ঝুঁকলে কেন? সাধনা করবার জন্যে তোমার সামনে দীর্ঘ জীবনটাই তো পড়ে রয়েছে"। ধ্রুব উত্তরে বললেন:

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্মান ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।”

–বললেন, “হে দেবর্ষি নারদ, আপনি ঋষি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। তবু ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে বলছি। আপনি জানেন অনেক পশুজীবনের পর আমরা মানুষের শরীর পেয়ে থাকি। "সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা”: নানান ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, সংঘর্ষ–সমিতির মধ্য দিয়ে জীব মানব জীবন লাভ করে। অন্যান্য জীবনের চেয়ে মানব জীবন বড় দুর্লভ। আবার সাধনাসার্থক মানব জীবন আরও দুর্লভ।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তো হপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলো হস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।”

মানব জীবন পেয়েও খুব কম মানুষই আধ্যাত্মিক প্রবচন শোনার সুযোগ পায়। আবার যারা শোণে তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই অধ্যাত্ম সাধনার ইচ্ছা পোষণ করে। আবার তাদের মধ্যেও খুব কম লোকই সাধনার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে। এই যে মুষ্টিমেয় কতিপয় মানুষ যারা সাধনা জিনিসটা বোঝে, অনুশীলন করে ও শেষ পর্যন্ত চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা সত্যিই বড় ভাগ্যবান। নিজেকে সত্যিকার গড়ে তোলার ব্যাপারে যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ও শ্রদ্ধেয়

গুরুজনেরাও বাধা সৃষ্টি করেন তাকেও উপেক্ষা করে এগিয়ে চলতে হয়। তা করাটা অপরাধও নয়, পাপ নয়।

নারদকে ধ্রুব আরও বললেন–হে দেবর্ষি নারদ, কে জানে জীবনে কাল কী ঘটবে? আপনার বয়স হয়েছে, আপনি সাধনা করার সুযোগ পেয়েছেন, ভজন- কীর্ত্তন করেছেন, কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমার জীবনে কালকের সূর্যোদয় নাও আসতে পারে। ধরুন, আজই রাত্রিতে যদি আমার জীবনাবসান ঘটে তাহলে? তাই সাধনার ব্যাপারে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত অপেক্ষা করব কেন?

নারদ নীরবে প্রস্থান করলেন। "ধর্মাণ ভাগবতানিহ"। ধ্রুবর বক্তব্য –মানুষ মাত্রেরই উচিত বাল্যকাল থেকেই ভাগবত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করা। তাহলে সে হাতে অনেক সময় পাবে।

ভাগবত ধর্ম জিনিসটা কী? এই ধর্মের অনুশীলনের জন্যে কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার? ভাগবত ধর্মানুশীলনের অন্যতম যোগ্যতা হ'ল প্রপত্তি। অর্থাৎ আমি পরমপুরুষকে আমার সব কিছু সমর্পণ করছি। তিনি যেমনি চাইবেন আমি তেমনটিই করব। যারা অল্প বয়সেই এই ধরনের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তারাই খাঁটি মানুষ।

ভাগবত ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে তিনটি মূল তত্ত্বের ওপর–বিস্তার (Psychic expansion), রস (flow) ও সেবা (service)। এই ভাগবত ধর্মের জন্যেই মানুষ পশু থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। কতকগুলি এমন অভিন্ন গুণ রয়েছে যা উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ তিনেতেই সমভাবে বিদ্যমান। আবার এমন কতকগুলি গুণ রয়েছে যা কেবল পশু ও মানুষেই রয়েছে; আবার এমনও কতকগুলি গুণ আছে যা কেবল মানুষেই আছে, মনুষ্য ব্যতীত অন্য আর কিছুতে নেই।

কেউ কেউ বলে থাকেন, "মানুষ বিচারশীল পশু”। আমি একথার যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। আমার মতে মানুষ পশু নয়, মানুষ বিচারশীল জীব। মানব অস্তিত্ব এক আদর্শের ধারাপ্রবাহ। আর তাই মানুষকে কোন মতেই পশু বলা চলে না। যেমন উদ্ভিদ ও পশু দুই–ই জীবিত সত্তা কিন্তু এক নয়, তেমনি মানুষ ও পশু জীবিত প্রাণী কিন্তু তারা হুবহু এক নয়।

পশু নড়াচড়া করে কিন্তু উদ্ভিদ করে না। তাহলে পশুর থেকে মানুষের তফাৎ কোথায়? না, তফাৎটা হ'ল এই ভাগবত ধর্মে–বিস্তার, রস ও সেবাতত্ত্বে। ভাগবত ধর্মের শিরোপা পেতে

গেলে এই তিনটে তত্ত্ব অপরিহার্য আর এই ভাগবত ধর্মের জন্যেই মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য।

সবাই জীবনে বিস্তৃত হতে চায়। এই বড় হবার ইচ্ছা, বিস্তৃত হবার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি.... স্বাভাবিক ধর্ম। কেউ ছোট হয়ে, ক্ষুদ্র হয়ে বাঁচতে ভালবাসে না। সবাই চায় আপন আপন মনের বিস্তৃতি ঘটাতে। এই বিস্তারের ইচ্ছার পূর্তির জন্যে মানুষকে নিয়মিত সাধনা করে যেতে হবে। এই ভাবে চলতে চলতে এমন একদিন আসবে যখন অণুমন বিস্তৃত হতে হতে ভূমামনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব হ'ল রস, তৃতীয় হ'ল সেবা। স্মরণাতীত কাল থেকে ভূমাচৈতন্যের এক অনন্ত প্রবাহ ধারাকারে বয়ে চলেছে। মানুষ চায় তার ব্যষ্টিগত ইচ্ছা পরমপুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যাক। যদি কারো এমনটা হয়, বুঝতে হবে তার জীবন সফল ও পূর্ণ হয়েছে। এই হ'ল রসতত্ত্ব। এই ধরনের মানুষের জীবন পরমপুরুষের কৃপাধন্য। শাস্ত্রের এদের বলা হয়েছে 'আপ্তকাম'। পরমপুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া–এই ইচ্ছাটা কেবল মানুষের মধ্যেই রয়েছে, অন্য কোন জীবিত প্রাণীর মধ্যে নেই। পশুর মধ্যেও নেই, উদ্ভিদের মধ্যেও নেই।

ভাগবত ধর্মের তৃতীয় অপরিহার্য তত্ত্ব হ'ল সেবা। কেবল মানুষই নিজের অস্তিত্ববোধ সম্বন্ধে সজাগ। উদ্ভিদ, পশু ও জড় বস্তুর এ ধরনের আমিত্ববোধ নেই। একটা টাকা জানে না যে সে টাকা। একটা আম গাছ জানে না সে আমগাছ। একটা শৃগাল জানে না সে শৃগাল। কিন্তু মানুষ জানে যে সে মানুষ।

মানুষ এও জানে যে পরমপুরুষই তাদের যাবতীয় প্রেরণা–প্রেষণার উৎস। পরমপুরুষ তাদের পিতা, তারা সবাই সেই পরম পিতার সন্তান। পরম পিতার সন্তান হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য জীবের সঙ্গে তাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আর এই সৌভ্রাত্রবোধের জন্যেই মনুষ্যেতর জীবের থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। সংসারে বাপ–মায়েরা খুব খুশী হন যখন তাঁরা দেখেন অন্যে তার ছেলে– মেয়েদের ভালবাসছে, তাদের যত্ন করছে। তেমনি পরমপুরুষও অবশ্য খুশী হন যখন তুমি বা তোমরা পরমপুরুষের সৃষ্ট জীবজগতের সেবা করতে উদ্যত হও। এখানে জীব মানে কেবল মানুষই নয়, উদ্ভিদ, জীবজন্তুও, মায় মানুষ পর্যন্ত সবাই। অর্থাৎ ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও নৃ–যজ্ঞ এই তিন ধরনের অর্থ নিতে হবে। যাদের এই ধরনের অনুভূতি আছে কেবল তারাই মনুষ্য নামের যোগ্য। কেবল মানুষের শরীর থাকলেই কেউ প্রকৃত মানুষ বলে, বিচারশীল মানুষ বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়। যাদের মধ্যে এই অনুভূতিটা জেগেছে কেবল

তারাই ভাগবত ধর্মের অনুগামী বলে গণ্য হবে। বুঝে নিতে হবে, তারাই ঠিক ঠিক ভাগবত ধর্ম পালন করছে। তাই–

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম।।"

একেবারে শৈশবকাল থেকেই বুদ্ধিমান মানুষ ভাগবত ধর্মের অনুশীলন শুরু করবে। ভাগবত ধর্মাচরণের একমাত্র প্রাক্–সর্ত্ত হ'ল পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

ধ্রুবের উত্তর দেবার পর কী হ'ল? গল্পে আছে, তারপর ধ্রুবের সামনে নারায়ণ এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "ধ্রুব, ওঠো, তোমার বয়স নিতান্তই অল্প, এত অল্প বয়সে সাধনার কী প্রয়োজন?" ধ্রুবের উত্তর, আপনার জন্যেই তো সাধনা। আপনিই যখন এসে গেলেন তখন আর সাধনার প্রয়োজন নেই। এবার উঠে যাচ্ছি।

তাই মনে রেখো, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে গেলে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা এই ধরনের বাহ্যিক জিনিসের কোন প্রয়োজন নেই। তাৰড় তাৰড় পণ্ডিত, প্রবীণ মানুষ বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের দল বহু পিছনে পড়ে থাকবে, আর

নিরক্ষর সাধারণ মানুষ দৌড়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। তাই কে পুরুষ বা কে নারী, কার কত বয়স, কার কতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে এসব নিয়ে কারও হীনম্মন্যতায় ভুগবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আসল ব্যাপার হ'ল, তুমি পরম পিতার সন্তান। তোমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা–দীক্ষা, বয়স–যাই হোক না কেন, তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া তোমার জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই অধিকারের পুরো সদ্ব্যবহার করো।

(পটনা, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭২

"নিত্যং শুদ্ধং”

তন্ত্রে একটি শ্লোক আছে:

"নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্।।”

'নিত্যং' মানে যা অপরিণামী, যা স্থায়ী, শাশ্বত, যা পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হয় না। যা নিত্য তাকে দেবও বলা

হয়। পরামাত্মার যে সর্বদ্যোতনাত্মক অখণ্ড চিদৈকরস অভিব্যক্তি তা–ই দেব। অর্থাৎ দেব মানে যা বিশ্বের জড়–চেতন নির্বিশেষে সবাইকে সব কিছুকে স্পন্দিত.... ছন্দিত.... নন্দিত করে চলেছে। অখণ্ড মানে যা খণ্ড খণ্ড অংশে বিভাজিত বা বিশ্লিষ্ট নয়। 'চিদৈকরসঃ' মানে যা চিতিজ্ঞানের বিমূর্ত রূপ (personified cognition), যা অনাদি থেকে অনন্তের পানে বয়ে চলেছে। এই হ'ল 'নিত্য' শব্দের মানে।

'শুদ্ধং'। যে বস্তু যা বা যেমন উচিত স্বভাবে থাকে তা–ই হয়ে থাকা বা তেমনি স্বভাবে থাকাকে বলা হয় শুদ্ধ। এই 'শুদ্ধ' শব্দটা একটা আপেক্ষিক শব্দ। ধর, যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বিশুদ্ধ ঘি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু ধর, দশ বছর পরেও কি আজকের এই শুদ্ধ ঘি–টা তেমনি শুদ্ধ থাকবে? না, থাকবে না। তাহলে সেই ঘি–টাকে শুদ্ধ ঘি বলা যাবে না। ভেজাল না মেশালেও সেই শুদ্ধ ঘি–টা আর শুদ্ধ থাকে না যদিও যখন প্রথম ঘি–টা তৈরী হয়েছিল তখন শুদ্ধ ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘি–টার মধ্যেও পরিবর্তন এসে গেছে। তাই একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, এই ভৌতিক জগতের কোন বস্তুই চিরকাল শুদ্ধ থাকতে পারে না। সবাই পাল্টে যায়, পরিবর্তিত হয়। কেবল পরমাত্মারই কোন পরিবর্তন হয় না, কোন অশুদ্ধতা বা মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই কেবল তাঁকেই শুদ্ধ বা pure বলা যেতে পারে।

তিনি চিরকালই শুদ্ধ, পবিত্র, অপাপবিদ্ধ, আর কেউই তাঁর মত হতে পারে না।

'নিরাভাসং'। 'আভাস' শব্দের দু'টি মানে। একটি মানে হ'ল: অনেক সময় হয় কি, প্রতিফলন বা প্রতিসরণের দরুণ কোন জিনিস দেখতে বাঁকা মনে হয়, আকৃতিটা পাল্টে যায়। এই ব্যাখ্যাটা নিলে 'নিরাভাস' মানে দাঁড়াবে যে বস্তুটার প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হয় না। দ্বিতীয় মানে হ'ল: যার আভাস নেই। অনেক সময় দেখা যায়, কোন বস্তুর আভাস বা প্রতিরূপ অন্য বস্তুতে গিয়ে পড়ে, যা দেখে সংশ্লিষ্ট বস্তুটা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। সে অর্থে 'নিরাভাস' মানে দাঁড়াবে যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই গড়ে তোলা যায় না। আলোচ্য শ্লোকটিতে দ্বিতীয় মানেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। পরমপুরুষের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অণুমানসে তাঁর প্রতিফলন হবেই। আর সেই প্রতিফলনের নামই জীবাত্মা। মনে হচ্ছে প্রতিফলন নেই কিন্তু বাস্তবে প্রতিফলন আছে। এর আর একটি অর্থ আছে। হয়তো কেউ পরমাত্মার সম্বন্ধে কোন প্রকার একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারে। হতে পারে, সেই ধারণাটা খুবই স্বচ্ছ, তবু কেউই তা বলে দাবী করতে পারে না যে সে এক দ্বিতীয় পরমপুরুষ বা উপ-পরমপুরুষ। এই অর্থেও 'নিরাভাস' শব্দটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

'নিরাকারং'। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়। যা কিছু দেখি বা অনুভব করি, যা কিছু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের গোচরীভূত হয় তা জড় বা matter বা দ্রব্য। বলা হয়ে থাকেঃ "তব দ্রব্যং জগদগুরো তুভ্যমেব সমর্পয়ে"। ধর, হিমালয়ের কথা। হিমালয় যদিও খুবই বিশাল তবুও তার একটা সীমা আছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, যা সীমার ৰন্ধনে বাঁধা পড়েছে তার একটা আকার বা আয়তন থাকবেই। আর সেই বস্তুটাকেই বলি দ্রব্য অর্থাৎ 'দ্রব্য' বলব তাকে যার একটা form বা অবয়ব আছে। কিন্তু যা বা যে সত্তা স্থান–কাল–পাত্রের ৰন্ধনে আবদ্ধ নয় তার তো কোন আকার বা আয়তন থাকতে পারে না! 'নিরাকার' মানে সেই ধরনের আকার–আয়তনের ৰন্ধনমুক্ত সত্তা।

'নিরঞ্জনং'। অঞ্জন মানে কাল দাগ। এই অর্থে যে সত্তায় কোনও অঞ্জন বা কাল দাগ নেই, যা পুরোপুরি নিষ্কলঙ্ক তাই নিরঞ্জন।

"নিত্যৰোধং”। অভিজ্ঞতার পেছনে যদি বুদ্ধির সমর্থন থাকে সেটাকে বলি ৰোধ। ধর, তুমি কোথাও একটা চমৎকার জিনিস দেখলে। সেটা তোমার পক্ষে হ'ল একটা অভিজ্ঞতা। এই যে অভিজ্ঞতা হ'ল এর পেছনে তোমার কোন ধারণা ছিল না।

তাই এটাকে ৰোধ বলব না। আবার ধর, কেউ হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা রামধনু দেখল। এটা হ'ল একটা প্রত্যক্ষ বা perception। মানুষটার হয়তো রামধনুর সাতটা রঙ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তাই এটাকে ৰোধ বলা যাবে না। কোন কারিগরের একটা মেশিনকে দেখে সেই মেশিন সম্বন্ধে বোধ থাকতে পারে। কিন্তু যে মানুষটা কারিগর বা ইঞ্জিনিয়ার নয় তার তো মেশিন সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মাবে না। বুধ+ ঘঞ প্রত্যয় করে 'বোধ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যে সত্তা প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে, প্রতিটি মন ও জীবাত্মা সম্বন্ধে বা এই সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে অত্যন্ত ভালভাবে জানেন বোঝেন তিনি হলেন 'নিত্যৰোধং'। তাঁকে লুকিয়ে কোন কিছু করা যায় না।

"চিদানন্দং”। পরমপুরুষ মুখ্যতঃ সত্য বা অপরিণামী হিসেবে চিহ্নিত। 'চিৎ' মানে চৈতন্য বা cognition, এই জন্যে শিবকে বলা হয় চিতিশক্তি ও অপর শক্তি হলেন পরাপ্রকৃতি (Supreme creative principle)। এই অর্থে চিদানন্দ হলেন সেই চিতিশক্তি যিনি সর্বদাই আনন্দঘন সত্তা। কোন উৎস থেকে সুখ বা আনন্দ উৎসারিত হচ্ছে তার সন্ধানে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় না। তাঁর অস্তিত্বই হ'ল আনন্দঘন আর এই আনন্দটাই হ'ল চিদানন্দ।

পরমপুরুষের এই একটি বিরাট গুণ যে তিনিই সমস্ত জীবকুলকে সৃষ্টি করেছেন। আবার তাঁরই একটা ষড়যন্ত্র বা নাটক হ'ল এই যে তিনিই সেই জীবকুলকে নানান ৰন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। নাট্যকার তাঁর নাটকের এক একজন পাত্রের জন্যে এক একটি ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেন। ঠিক তেমনি বিশ্বনাট্যের এই মহান পরিচালক তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি পাত্রকে এক একটি নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এতে তিনি সুখ পান, তাই এমন করেন। হয়তো বিশ্বসৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে সব কিছুকে আকর্ষক করে তোলবার জন্যে তিনি এমনটি করে থাকেন।

আসলে এই যে নানান পাত্রকে তিনি নানান ভূমিকা দিয়েছেন এতে তিনি কারো ক্ষতি করতে চান না। আরও বলা যেতে পারে যে তিনি যেমন এক একটি পাত্রকে এক এক ধরনের ভূমিকা দিয়েছেন, তেমনি নিজের জন্যেও একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এই নাটকেরই অংশ হিসেবে তিনি জীবাত্মাকে ৰন্ধনমুক্ত করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেন বা মুক্তি-মোক্ষ দেন। এই ভাবে কাউকে ৰন্ধন-রজ্জুতে বাঁধা ও পর মুহূর্তে ৰন্ধন মুক্ত করাটাই তাঁর লীলা। আর এই দিব্যলীলায় তিনি নিরন্তর মগ্ন রয়েছেন।

তাই বলব, কোন মানুষেরই কোন বিষয়ে হতাশ বা নিরুৎসাহ হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সকলেরই এ কথাটা জেনে রাখা উচিত যে পরমপুরুষ সবাইকার কল্যাণের জন্যেই সমান ভাবে উৎসুক। বাপ-মায়ের যেমন তাঁদের সন্তানদের সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন, পরমপুরুষও তেমনি তাঁর সন্তানদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেন। তাই কোন অবস্থাতেই ভয় পেও না বা ঘাবড়ে যেও না। আগেই বলেছি, এই পৃথিবীতে তোমরা কেউই একাকী নও। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-নক্ষত্রকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি তোমাদেরও চালাচ্ছেন।

(পটনা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন-৭৩

সবাই তাঁকে মানে

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "এই যে আমার দৈবী মায়া, ইনি বড়ই শক্তিশালিনী। কোন জীবিত প্রাণীর পক্ষে এই মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। তবে যে মানুষ আমার শরণ নেয় সে আমার কৃপায় খুব সহজেই এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করতে পারে"। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে মায়া হ'ল পরমপুরুষেরই শক্তি–'শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ'।

এক মায়ার মধ্যে রয়েছে দু' ধরনের প্রকাশ–একটি, বিদ্যা মায়া (Centripetal Force) ও অপরটি অবিদ্যামায়া (Centrifugal Force)। প্রথমটি অর্থাৎ বিদ্যামায়া সাধককে বিশ্বের চক্রনাভি পুরুষোত্তমের দিকে চলতে সাহায্য করে। আর অপরটি অর্থাৎ অবিদ্যামায়া মানুষকে সেই পুরুষোত্তম থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় অর্থাৎ বিশ্বের চক্রনাভি থেকে জীবের ব্যাসার্ধগত দূবত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেয়।

আবার এই বিদ্যামায়ার ও অবিদ্যামায়ার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্মগত অভিপ্রকাশ রয়েছে। যখন এই মায়িক শক্তি দ্বিবিধ তখন এটা ভাবাও যুক্তিসঙ্গ ত নয় যে কেবল বিদ্যামায়াই কাজ করে যাবে, অবিদ্যামায়া চুপ করে বসে থাকবে। হ্যাঁ, অবিদ্যামায়ারও কিছু নিজস্ব ধরনের কাজ আছে। এই জন্যেই পরমপুরুষের কর্মধারায় পরস্পর বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধর, এই যে ঝড়–ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বন্যার

তাণ্ডব–এগুলো হ'ল অবিদ্যামায়ার অভিপ্রকাশ। আবার যেহেতু সৃষ্টির বুকে সমতা বজায় রাখতে হবে তাই বিদ্যামায়ার অভিব্যক্তিগুলি দিয়ে সৃষ্টির ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। বেদে পরমপুরুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পরমপুরুষ বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তির সহায়তায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাজ করে যান। তাঁর এই কাজগুলোর মধ্যে কতকগুলি খুবই কল্যাণপ্রদ; আবার কিছু কিছু কাজ দেখে মনে হয় অকল্যাণকর।

অর্থাৎ আপাতঃ দৃষ্টি_@তে অকল্যাণকর, আসলে পরিণামে ওই কাজগুলোও কল্যাণকর। কারণ, যে অবিদ্যা মায়ার সাহায্যে ওই আপাতঃ অকল্যাণকর কাজগুলো নিষ্পন্ন হয় সেই অবিদ্যা শক্তিও তো পরমপুরুষেরই শক্তি। পরমপুরুষ যখন কাউকে শাস্তি দেন সেই শাস্তিদানের ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় অবিদ্যামায়ার সাহায্যে কিন্তু এই শাস্তিদানের পেছনে যে ভাবটি লুকিয়ে থাকে তা তো কল্যাণমূলক।

বেদে বলা হয়েছে–

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপুবন্ পূর্বমষৎ।
তদ্ধাবতো হন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ

তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।"

'অনেজৎ' মানে যা 'এজৎ' নয় অর্থাৎ যা চলছে না, এক জায়গায় স্থির হয়ে থেমে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল কেন তিনি স্থির, অনেজৎসত্তা। উত্তর হ'ল, পরমপুরুষ হলেন স্থান, কাল ও পাত্রের বহির্ভূত সত্তা। আর স্থান–কাল–পাত্রের বাইরে চলমানতা বা গতিশীলতার অবকাশ কোথায়, দ্রুতির কথা তো না বলাই ভাল। ঠিক এই জন্যেই তাঁর সম্বন্ধে 'অনেজৎ' বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে, সংস্কৃত 'এজতি' ক্রিয়ার মানে যা চলছে। 'সমানম্ এজতি ইতি সমাজঃ' অর্থাৎ একটা জনগোষ্ঠী যখন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে তাকে বলা হয় সমাজ।

'একং'। পরমপুরুষের জন্যে 'একং' শব্দটি স্ববিরোধী কারণ পরমপুরুষের সম্পর্কে কোন সংখ্যাবাচক বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত নয়। যা কিছুই তুমি ভাব না কেন তা সবই মানসসৃষ্ট, মনেতেই তার উদয় ও বিলয়। কাজেই যে জিনিসটা তোমার মনেই সৃষ্ট হয়, মনেতেই লুপ্ত হয় তা দিয়ে তুমি পরমপুরুষকে বাঁধবে কী করে? কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব যে পরমপুরুষ হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। এর কারণ কী? না, সাধকের মন যখন বিন্দুস্থ হয় কেবল তখনই সেই সাধক পরমপুরুষকে উপলব্ধি করতে পারে। এই জন্যে যদি পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে কোন

সংখ্যাবাচক বিশেষণ ব্যবহার করতেই হয় তবে সেই সংখ্যা হচ্ছে 'এক'–'দুই' বা 'তিন' নয়।

একটু আগেই বললুম, পরমাত্মা হলেন 'অনেজৎ' অর্থাৎ চলছেন না। এখন অন্য ভাবে বলা হচ্ছে তিনি অত্যন্ত দ্রুত চলেন। এ দু'য়ের মধ্যে সংগতি কোথায়? এই আপাতঃ বিপরীত দু'টো কাজ কি একই সঙ্গে চলতে পারে? 'মনসো জবীয়ো'। এর মানে হ'ল ইনি মনের চেয়ে দ্রুততর (faster than the mind), ইনি মানুষের মনকেও চলার দ্রুতিতে হারিয়ে দেন, পরাজিত করেন। যেখানে চলমানতার প্রশ্ন সেখানে পরমপুরুষই চ্যাম্পিয়ন। অণুমনের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গতিবিধি রয়েছে। আর তার এই গতিবিধিগুলো অন্যান্য জাগতিক পশু ও ভৌতিক সত্তার গতিবিধি থেকে দ্রুততর। মানুষকে যদি চাঁদ থেকে পৃথিবী গ্রহে পৌঁছতে হয় তাতে তার কিছুটা সময় অবশ্যই লাগবে কিন্তু মনের ক্ষেত্রে কোন সময় লাগে না। অন্য যে কোন পাঞ্চভৌতিক সত্তার চেয়ে মন অধিকতর গতিশীল।

মনের চলমানতা মানেই অণুজীবের চলমানতা। আর অণুজীব যেহেতু ভূমাসত্তারই ভগ্নাংশগত অভিব্যক্তি তাই ভূমামন অনুমনের চেয়ে অধিকতর গতিশীল। আর ভূমামন যেহেতু ভূমাচৈতন্যেরই স্থূল রূপ তাই স্বাভাবিক ভাবে অবশ্যই চিতিশক্তি

ভূমামনের চেয়ে অধিকতর গতিশীল। 'মনসো জবীয়ো' কথাটার তাৎপর্য এখানেই।

"নৈনদ্দেবা আপুবন্ পূর্বমর্ষৎ"। 'দেব' মানে দিব্য দ্যোতনাত্মক অভিস্পন্দন। কিন্তু এখানে 'দেব' মানে ইন্দ্রিয়সমূহ–জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোর চেয়ে মন হ'ল অধিকতর গতিশীল, তাই ইন্দ্রিয় পরমপুরুষকে ধরতে ছুঁতে পারে না। ধর, এক মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা হবে; আর সেই প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছে এই দশটি ইন্দ্রিয়, আর রয়েছে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ যাদের প্রত্যেকের দশটি করে ইন্দ্রিয় রয়েছে, আর প্রতিযোগী রয়েছে অনেকগুলি–মাইক্রোকজম্ বা অনুমন ও ভূমামন। এখন অনুমান করো, এই দৌড় প্রতিযোগিতায় কে চ্যাম্পিয়ন হবে? অবশ্যই বলে দেওয়া যায় ভূমামন চ্যাম্পিয়ন হবে। তাই তুমি তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই পরম সত্তাকে ধরবে কী করে?

কেউ কেউ বলেন, আমি পরমপুরুষকে দেখতে চাই। এখন প্রশ্ন হ'ল, তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই পরম দ্রুতিশীল সত্তাকে কী করে ধরবে, কী করে দেখবে, কেন না তাদের ধারণ–ক্ষমতা বা দৃষ্টিশক্তি যে অত্যন্ত সীমিত।

'নৈনদ্দেবা আপ্লুবন পূর্বমর্ষৎ'। কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কোন কর্মেন্দ্রিয় পরমপুরুষকে ধরতে ছুঁতে পারে না। পারস্পরিক দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পরমপুরুষ আর সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান। তাই মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যে ন্যায়শাস্ত্র (Logic), দর্শনশাস্ত্র (Philosophy), ভৌতিক বিজ্ঞান (Science) কিংবা আরও যা যা উদ্ভাবন করেছে তা দিয়ে সেই পরমপুরুষকে ধরবে কী করে? –না, ধরতে পারে না। তুমি তোমার বন্ধনরজ্জু দিয়ে বা তোমার মানস সৃষ্ট অন্য কোন কিছু দিয়ে পরমপুরুষকে ধরে ফেলবে–এই ভাবনাটাই ত্রুটিপূর্ণ। এটা মূর্খতারই নামান্তর।

"তদ্ধাবতো হন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি”–বিশ্বের সবাই তাঁকে মেনে চলে। সবাইকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর তৈরী বিধান অনুসারে, সমস্ত বিশ্বসংসারের কল্যাণের ভাবনা নিয়ে তিনি যে সব বিধিনিষেধ তৈরী করেছেন সে সব মেনেই মানুষকে চলতে হবে। তাই দেখবে এই যে বায়ু, জল, আলো ও অন্যান্য অজস্র সত্তা, এরা নিজের নিজের নির্ধারিত কর্ত্তব্য করে চলেছে। এই কর্ত্তব্য এদের করে যেতেই হবে। এর অন্য কোন বিকল্প নেই।

(পটনা, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭৪

মৃত্যু সম্বন্ধে কুসংস্কার

মানুষ এক বিচারশীল জীব–বিচারশীল পশু নয়। কিছু লোকে বলে থাকে, মানুষকে একদিন রোজ কেয়ামৎ বা পরম বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। দেখা যাক, কথাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত।

যুক্তির বিচারে দেখতে গেলে, কথাটার কোন মানে হয় কি? এই যে মৃত মানুষদের শরীরগুলো, এগুলো থাকবে কোথায়? কবরে? মাটির নীচে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে সেগুলো পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে যাবে না? কেবল হাঁটুর কাছের হাড়গুলো ও আরও কয়েকটি অংশের হাড় বড় জোর আট–দশ বছর অক্ষত থাকে। বাকী অংশটা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটিই হয়ে যায়। তাহলে মৃত্যুর পর ওই মৃতদেহগুলো থাকবে কোথায়? কবরখানায়? এমনও তো হতে পারে চাষীরা তার ওপর দিয়ে হাল চালিয়ে দিল। সেই অবস্থায় যখন স্নায়ুতন্ত্র, স্নায়ুকোষ, শরীর থাকছে না তখন মৃতের মন, আত্মা কোথায় থাকবে?

এবার দেখা যাক, মৃত্যু জিনিসটা কী? মৃত্যুর পর মুহূর্তে মনের ক্রিয়াশীলতা রুদ্ধ হয়ে যায়, আর মন ও আত্মা পচনশীল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই পরম বিচারের দিনে কবর থেকে উঠে আসবেটা কে? শরীরটা উঠে আসবে না কেননা সে তো পচে গলে মাটির সঙ্গে আগেই মিশে গেছে। আর সেই বিদেহী মনটাই বা যাবে কোথায়? আর মনটাই যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাহলে জীবাত্মাও তো কাজ করতে পারে না।

আরও একটা যুক্তি আছে। মানুষকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে না, তার কর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিচারও হয়ে গেছে। যেখানে ক্রিয়াশীলতা আছে সেখানে ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, অবশ্য যদি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রও অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিতে পারি, স্থান অপরিবর্তিত আছে কিন্তু কাল সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

তাহলে দেখেছি, শেষ বিচারের যুক্তিটা ধোপে টিকছে না। এমনকি প্রাচীন কালের মানুষও তথাকথিত এই শেষ বিচারের তত্ত্বটায় বিশ্বাস করতেন না। যারা বিশ্বাস করত, তারা বিশ্বাস করত তাদের অজ্ঞতা ও ভয়ের দরুণ। কিন্তু আজকের যুক্তিবাদী মানুষ এ সব ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করবেন না। যাঁরা

পরম্পরাগত ভাবে মেনে আসছেন তাঁরা কিন্তু মনে প্রাণে মানেন না। কেবল সাহস করে মুখ ফুটে তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন না। তাই তাঁরা কিছু বলেন না।

প্রতিটি কর্মেই প্রতিকর্মের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে যা সুযোগ-সুবিধা পেলেই অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি কর্মের প্রতিকর্ম তৎক্ষণাৎ কালপক্ক হয় না। তাই প্রতিকর্মের অভিস্ফুরণের জন্যে অনুকূল পরিবেশের অপেক্ষা করতেই হয়। প্রতিটি পরিবেশ মানুষের কোন-না-কোন প্রতিক্রিয়ার ভোগের অবশ্যই অনুকূল কিন্তু এটাও সত্য যে সব পরিবেশই সব ধরনের প্রতিক্রিয়ার অভিস্ফুরণের অনুকূল নয়। যাই হোক, মানুষ অনন্তকাল ধরে প্রতিকর্মের ভোগের জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। কারণ, অনির্দিষ্ট কাল ধরে তা করতে থাকলে বিদেহী মনকেও অনন্তকাল ধরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে যা সম্ভব নয়। এমনকি এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কালের জন্যেও মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে না। নিষ্ক্রিয় অবস্থা মানেই বিদ্রোহের বীজকে অঙ্কুরিত করা যা পরিণামে মানসিক বিস্ফোরণ ঘটাবে।

ধর, কোন মানুষকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই বরখাস্ত মানুষটির মনে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। দেখবে সেই লোকটা ওপরওয়ালার বিরুদ্ধে আদালতে

মামলা করছে। বহু সংখ্যক সমর্থক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, প্রতিবাদ সভা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মনকে যদি মুহূর্ত্ত কালের জন্যেও নিষ্ক্রিয় বা নিরুদ্ধ করা হয় তাহলে সে বাঁচতে পারে না।

কোন জীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই তার নূতন আধারের সন্ধান শুরু হয়ে যায়। এটা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। যেখানে সে অনুকূল পরিবেশ পাবে সেখানেই সে নূতন শরীর পেয়ে যাবে। তবে কি যতদিন নূতন শরীর সে না পাচ্ছে ততদিন কি তার মন সত্যিই নিষ্ক্রিয় থাকে? উত্তরে বলব, না, তখনও সে কোন-না-কোন কাজে লিপ্ত থাকে। তার নূতন শরীর, নূতন আধার খোঁজার চেষ্টা চলতেই থাকে।

মানুষ যখন মারা যায় তার মনটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মৃত্যুরও নানান রকমফের আছে। যখন মুমূর্ষুর স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্ত্ব কাজ করা বন্ধ করে দেয়, হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দেয়, ধরে নেওয়া হয় তার পুরোপুরি মৃত্যু হয়েছে। কখনও এমনও হয় যে স্নায়ুতন্ত্ব, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, স্নায়ুকোষগুলো তখনো কাজ করে চলেছে। সেক্ষেত্রে তাকে ঠিক মৃত্যু বলা যায় না।

সে অবস্থায় ডাক্তাররা হয়তো মানুষটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। তবু দেখা যায়, আরও দু–তিন ঘন্টা, এমনকি দু' তিন দিন পরেও সেই মানুষটির প্রাণ ফিরে এসেছে। প্রায় প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রেই বলা যায়, তথাকথিত মৃত্যুর পর অন্ততঃ বেশ কিছুক্ষণ মৃতের স্নায়ুকোষ সক্রিয় থাকে। তোমরা দেখেছ এ রকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি কয়েকজনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর পরেও মৃতের স্নায়ুকোষগুলো সক্রিয় থাকে। যখন এই স্নায়ুকোষগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়, ধরে নিতে হবে সে তখন নূতন আধারের সন্ধান শুরু করে দিয়েছে। তক্ষুণি সে নূতন শরীর পেতেও পারে, নাও পেতে পারে। সঞ্চিত সংস্কার সহ বিদেহী মানস পুরোনো আধার ছেড়ে নূতন আধারের খোঁজ করে চলেছে। আর সেই বিদেহী মানস খোঁজ করতে করতে এমন একটা উপযুক্ত আধার গ্রহণ করে বা পায় যা তার সঞ্চিত সংস্কারের স্ফুরণের পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল হয়।

ধর, একজন মদ্যপ ও এক জন সাধু পটনা থেকে বারাণসী গেছেন। সাধুটি গঙ্গার তীরে অন্যান্য সাধুদের মণ্ডলীতে যোগ দেবেন, আর সেই মদ্যপ পানশালা খুঁজে বেড়াবে। তেমনি মানুষ তার সংস্কার অনুযায়ী নূতন শরীরের খোঁজ করে ও তদনুযায়ী

পায়ও। মানুষ যদি সর্বদাই কেবল খাই–খাই করে ঘুরে বেড়ায় তাহলে সে দেহান্তে হয়তো শূকরদেহ পাবে। ঠিক তেমনি কেউ যদি শুধু অর্থের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেক্ষেত্রে হয়তো সে একেবারে স্থূল জড়ে পরিণত হয়ে কোন ব্যাঙ্কের বা কোন ধনী মানুষের বাড়ীতে সিন্দুক হয়ে জন্মাবে।

মানুষের মন কখনো স্থির নিশ্চল হয়ে থেমে থাকতে পারে না অথবা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কবরের মাটির তলায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। এসব যুক্তিতর্কের বিরোধী ভাবনা। মানুষ যখন মন ও আত্মার মধ্যেকার পার্থক্যটা ভালভাবে বুঝতে পারে না কেবল তখনই এই সব অযৌক্তিক ভাবনার উদ্ভব হয়। বিশ্বের সব কিছুই চলে চলেছে। চলমানতাই জগতের শাশ্বত নিয়ম। বস্তুতঃ 'জগৎ' শব্দটির মানেই হচ্ছে যা অবিরাম চলে চলেছে, যা কোথাও স্থির হয়ে অচল হয়ে থেমে নেই। তাই কোন মানুষ মৃত্যুর পর অনন্তকাল পর্যন্ত কবরখানায় মাটির নীচে শেষ বিচারের দিন গুনছে–এ ধরনের ধারণা নিতান্তই অবান্তর। আজ যেখানে কবরখানা কাল সেখানে হয়তো ধানক্ষেত দেখতে পাব।

মানুষ যখন অতিমানসিক সত্তাকে আত্মা (soul বা spirit) বলে ভেবে বসে সেখানে এই ধরনের ভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। এই ধরনের মানুষের দর্শন বিষয়ে খাঁটি জ্ঞানের অভাব

রয়েছে বলতে হবে। যাঁরা উষ্চতর দর্শনের চর্চা করেন তাঁদের বলার চেষ্টা করা উচিত ছিল। এই পৃথিবীর কিছু সংখ্যক মানুষ কেন সুখী হয়? আবার অন্যেরা কেনই বা দুঃখী হয়? পরমাত্মা তো কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তবু তাঁর সৃষ্ট জগতে কেন এমনটা হয়? উষ্চতর দর্শনের সাহায্যে মানুষের তা তলিয়ে ভেবে দেখা উচিত।

আসল ব্যাপারটা হ'ল মানুষ মাত্রেই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী এগিয়ে চলে। মানসিক বিস্তার ঘটাতে চাওয়া সবাইকার এক স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। কোন মানুষই ধার্মিক বা অধার্মিক হয়ে, সৎ বা অসৎ হয়ে জন্মায় না। মৃত্যুর পরেও কোন মানুষই নরকের লেলিহান অগ্নিশিখায় অনন্তকাল দগ্ধ হবে না।

আমাদের আনন্দমার্গ দর্শনে স্বর্গ–নরকের কল্পনা অবাস্তব। পরমপুরুষ কাউকে সৎ শিক্ষা দেন, আবার কাউকে অসৎ শিক্ষা দেন– কথাটা পরমপুরুষের পক্ষে শোভন নয়। আর যদি সেই কারণে কেউ স্বর্গে যেতে পারল, কেউ পারল না সেটা কি তাঁর পক্ষে শোভন হবে? এটা তো পরিষ্কার পক্ষপাতিত্ব। আসলে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের এই চিন্তাটাই ত্রুটিপূর্ণ। এটা বড় ধরনের একটা ভাবনাগত ত্রুটি। মানুষ এই ধরনের কথা বলে থাকে নিছক অজ্ঞতার দরুণ, খাঁটি দর্শনের সম্যকজ্ঞানের

অভাবের দরুণ। আজকের প্রগতিশীল মানুষের সমাজ এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ ধ্যান-ধারণাকে সম্মান জানাতে পারে না।

তোমরা হয়তো বলতে পার যে ভূর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক, তপর্লোক ও সত্যলোক-এরা তো ভূমামনের সাতটি স্তর। মানুষ এককালে বলত যে কেউ এই স্বর্লোক বা স্বর্গে গিয়ে স্বচ্ছল শান্তিময় জীবন লাভ করবে। যদি সে এ জীবনে ভাল ভাল কাজ না করে থাকে অথবা তার কাজ-কর্ম যদি মন্দ হয়ে থাকে তাহলে তাকে দুর্ভোগ পেতে হবে। চিরন্তন স্বর্গ, চিরন্তন নরকের ধারণার চেয়ে এই ধারণাটা হয়তো কিছুটা ভাল। কেননা কর্মফলের একটা শুরুও আছে, শেষও আছে। যতদিন মানুষের সংস্কার শেষ না হচ্ছে ততদিন তাকে স্বর্গ বা নরকে থেকে যেতে হবে। সংস্কার ভোগের পর আবার তাকে পুনর্জন্ম নিতে হবে। এটাও ত্রুটিমুক্ত ধারণা নয়। অথবা এখানে যে মানুষের লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে তাও ত্রুটিমুক্ত নয়। মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আবার বলছি অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকের ধারণা সম্পূর্ণতই একটা ত্রুটিপূর্ণ ধারণা। আবার নরকের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে যে বলা হয়-তল, অতল, তলাতল, পাতাল, অতিপাতাল, বিতল ও রসাতল-এটাও ভ্রান্ত ধারণা। নরক সম্বন্ধীয় কাল্পনিক ভাবনাকে আমাদের উৎসাহ যোগানো উচিত

নয়। স্বর্গ–নরক বলে কিছু নেই। মৃত্যুর পর মানুষ অনন্তকালের জন্যে স্বর্গে বা নরকে যায় না। আবার শেষ বিচারের দিন বা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত তাকে প্রতীক্ষাও করতে হয় না।

সাধনার মাধ্যমে নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা, ব্রাহ্মী ভাবের অধ্যারোপ ও পরমপুরুষের বেদীমূলে পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা ও সেই সঙ্গে বিশ্ব–চরাচরের নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে মানুষ তার প্রতিকর্মকে, প্রতিকর্মের বীজকে দগ্ধ করে সেই পরমপুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারে। কেবল এই ভাবেই মানুষ অনন্তকালের জন্যে পরমপুরুষের কৃপালাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। এটাই হ'ল যথার্থ পথ– অনুসরণীয় মার্গ।

(পটনা, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৭৮

সূচীপত্র

প্রবচন–৭৫

শ্রাদ্ধ

পৃথিবীর সকল দেশেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মৃতের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে কোন–না–কোন প্রথা প্রচলিত আছে। হতায়ু মানুষটির প্রতি সশ্রদ্ধ কর্ত্তব্য সম্পাদনের এই যে বিধি

সংস্কৃতে একে বলা হয় 'শ্রাদ্ধ'। নানান স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের রকমফের আছে অবশ্য ঠিকই, কিন্তু তা' সবই একটা সাধারণ নামে পরিচিত– তা হ'ল 'শ্রাদ্ধ'।

'শ্রাদ্ধ' শব্দের মানে কী? "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্ত ইত্যর্থে শ্রাদ্ধঃ”–শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দেওয়া হচ্ছে তা–ই শ্রাদ্ধ। আর 'শ্রদ্ধা' জিনিসটা কী? 'শ্রৎ সত্যম্ তস্মিন্ ধীয়তে ইত্যর্থে শ্রদ্ধা'। যখন একটা ধারণা বা লক্ষ্যকে চরম ও পরম বলে মানা হচ্ছে তখন সেই ধারণা বা লক্ষ্যের নাম 'শ্রৎ' বা 'সত্য'; যখন যাবতীয় বৃত্তি সহ মন সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে সেই চলাটাকেই বলি শ্রদ্ধা। শ্রৎ + ধা = শ্রদ্ধা।

এখন দেখা যাক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই শ্রদ্ধানিবেদন বা শ্রাদ্ধ ব্যাপারটা কীভাবে পালন করা হয়। আগেই বলেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে যা কিছু দেওয়া হয় তা– ই শ্রাদ্ধ। পুরোহিত যজমানকে বুঝিয়ে বললেন–দেখ, তোমার বাবার তো একবারই মৃত্যু হবে, বার বার তো আর হবে না। তাই তাঁর মৃত্যুর পর ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করো, দান–দক্ষিণার ব্যবস্থা করো, নোতুন বস্ত্র বিতরণের বন্দোবস্ত করো ইত্যাদি ইত্যাদি। গত ৫০০০ বছর ধরে সেই অথর্ববেদের সময় থেকে ভারতবর্ষে তাই করা হয়ে এসেছে। মানুষ সাধারণতঃ তণ্ডুল, তিল, সেই সঙ্গে

মধু, ঘৃতও দিয়েছে যাতে মৃতের প্রেতাত্মা তা ভক্ষণ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি চার্বাক (*আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে তিনি ভারতে জন্মেছিলেন। বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন তিনি–বুদ্ধের চেয়ে বয়সে একটু ৰড় ছিলেন। তাঁরই শিষ্য অজিত কেশকম্বলী ছিলেন বুদ্ধের সামসাময়িক।) বলেছিলেন, "ধর, তুমি একটা ঘরের ভেতরে রয়েছ আর একজন ঘর থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদি তুমি সেই ঘরের ভেতর থেকে বাইরের উঠোনে দাঁড়ানো মানুষটিকে তিল–তণ্ডুল খেতে দাও, সে খেতে পাবে? তার পেট ভরবে? তেমনি যে মৃত মানুষটি

ইহলোক ছেড়ে পরলোক চলে গেছে তাকে যদি ইহলোকে তিল–তণ্ডুল খেতে দাও, সে খাবে কী করে? এসব কী যুক্তিসঙ্গত? মোটেই না। আসলে এসব হচ্ছে সুবিধাবাদী কিছু মানুষের শোষণের ফন্দিমাত্র।

এই যে প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে তিল–তন্ডুল–বস্ত্র ইত্যাদি দান করছ, তাতে কার কী লাভ হচ্ছে? তন্ডুলগুলো পুরোহিত বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভোগ করছে, তাঁর রন্ধনশালায় গিয়ে দেখে এসো, তাঁর পরিবারের লোকেরা সে সব সানন্দে আহার করছে।

তোমার পরলোকগত পিতার উদ্দেশ্যে যে নোতুন ধুতি দান করেছ, দেখবে পুরোহিত নিজে সেই ধুতিখানা ব্যবহার করছেন, শাড়ীখানা ব্যবহার করছেন পুরোহিত-পত্নী, গামছাটা উদ্বৃত্ত মনে হওয়ায় বাজারে বেচে দিয়েছেন পুরোহিত। দানে থালা-বাটি দিলে সেগুলোও পুরোহিত বাজারে বেচে দেন। তাহলে তোমার পরলোকগত পিতা-মাতা তো কিছুই পাচ্ছেন না।

দ্বিতীয়তঃ তাঁদের তো এ সবের কোন প্রয়োজনও নেই। অণুমন বা জীবাত্মার আহার্য, বস্ত্র, তিল-তন্ডুল, থালা-বাটি কোন কিছুরই দরকার নেই। এসব তো বদমায়েসদের বুজরুকি দর্শন। আর ভাব তো, গত ৫০০০ বছর ধরে সেই অথর্ব বেদের সময় থেকে এই রকম শোষণ চলে আসছে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে কোথাও কোথাও দেখা যায়, মৃতের আত্মীয়রা চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে, চল্লিশ দিন পর তারা এক বিশেষ ধরনের প্রার্থনা জানায়। আর তাদের সেই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হ'ল মৃতের অবস্থাকে আরও উন্নত করা। এটা কি যুক্তিসঙ্গত হ'ল? নিশ্চয়ই নয়। শ্রাদ্ধের নামে এসব তো নিছক ধোঁকাবাজি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেও অল্পবুদ্ধি মানুষ একই ভাবে ভাবত যে মৃত্যুর পরেও মানুষের ভৌতিক বস্তুর দরকার পড়ে। তাই

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃতের কবর খুঁড়ে দেখা গেছে যে প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্যে মৃতের আত্মীয়রা যব, মদ্য, মধু ও অন্যান্য জিনিস (তখনও গম জনপ্রিয় হয়নি) রেখে দিয়ে আসত। ভারতবর্ষে আজও এই সব জিনিসই ব্যবহার করা হয় যব, মধু, মদ, পশম কাপড় ইত্যাদি। লোকের বিশ্বাস, মৃত মানুষটি পশমের চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে নেবে।

পৃথিবীর নানান দেশে এখনও এই ধরনের শোষণ চলছে। মানুষ এই ভাবে এখনও শোষিত হচ্ছে তার কারণ, তারা আজও কুসংস্কারের কুহেলিকায় পড়ে আছে। হ্যাঁ, তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ....তারা অবশ্যই স্বল্পবুদ্ধি মানুষ।

এ প্রসঙ্গে আমার একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ে গেল। আমাদের শহরে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ধর, তাঁর নাম ডোমন সাহু। তাঁর বাপও ছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী। দিনের বেলায় সে ব্যবসা করত, রাত্রিতে ডাকাতি করতে বেরোত। ধর, ডোমন সাহুর বাপের নাম মোহন সাহু। একবার কশ্মীর থেকে এক মস্ত বড় পন্ডিত এলেন আমাদের শহরে। বললেন, তিনি মন্ত্রবলে একটা স্বর্গ রচনা করে দিতে পারবেন। আর দেশের যত পাপী-তাপী সেই স্বর্গে স্থান পাবে। ডোমন ভাবলে, আমার বাবা তো ডাকাত ছিলেন। এই সুযোগে পন্ডিতের সাহায্য নিয়ে আমার ডাকু বাপের জন্যে স্বর্গে একটা

স্থান সংরক্ষিত করে নেওয়া যাক। পণ্ডিত বললেন–হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে দেব কিন্তু এই ব্যাপারে ফী বাবদ আমাকে ৫০ গিনি দিতে হবে। ডোমন তাতেই রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু ডোমনের এক বন্ধু ছিল–রবি ঘোষ, খুব চালাক–চতুর মানুষ। রবি ঘোষ ডোমনকে বললেন, দেখ ডোমন, পণ্ডিতজী তো ব্যবসা করছেন। তাই না তিনি ৫০ গিনি ফী চাইছেন। এক কাজ করো। দর কষাকষি করো। পণ্ডিজীকে বলো–দেখুন পণ্ডিতজী, আমি পঞ্চাশটি রজতমুদ্রা দিতে পারব। আপনি এতেই
সম্মত হয়ে যান।

পন্ডিতজী বললেন হ্যাঁ, তা করে দিতে পারি, তবে পঞ্চাশ গিনি দিলে আপনার পিতাকে সোজা স্বর্গের নন্দনকাননে পারিজাত বৃক্ষের ঠিক নীচে পৌঁছে দেব। আর যদি পঞ্চাশ রজতমুদ্রা দেন তাহলে আপনার পিতা স্বর্গের বড় ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন কিন্তু পারিজাত বৃক্ষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না।

ডোমন ভেবে দেখল, তার বাবা স্বর্গের বড় ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। সেখান থেকে বাকী পথটুকু পাঁয়ে হেঁটেই চলে যাবেন। তাহলে পঞ্চাশ টাকাই খরচ করা যাক।

ডোমন আবার সেই চতুর বুদ্ধিমান রবি ঘোষের কাছে গেল। রবি ঘোষ বললেন-দেখ ডোমন, আমাদের প্রথম প্রয়াস সফল হয়েছে। এবার গিয়ে পণ্ডিতজীকে বলো, "পন্ডিতজী, আমি ভেবে দেখলুম, পঞ্চাশ নয়, গোটা চল্লিশেক টাকা আমি খরচ করতে পারব"।

ডোমন গিয়ে পন্ডিতজীকে তা-ই বললে। পন্ডিতজী বললেন-তাহলে স্বর্গের ৰড় ফটক থেকে বেশ কিছুটা দূরে পৌঁছবেন। পরের দিন ডোমন এসে বললে, "পন্ডিতজী, চল্লিশ টাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। এই তিরিশ টাকার মত খরচ করতে পারব।"

এই ভাবে ডোমন ও পন্ডিতজীর মধ্যে দর কষাকষি চলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত দশ টাকায় রফা হ'ল।

এই হ'ল শ্রাদ্ধের ব্যাপার। শ্রাদ্ধের নামে ব্যবসা.... দর কষাকষি। এতে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিন্দু-বিসর্গও নেই।

তাহলে মানুষ করবেটা কী! মৃতের উদ্দেশ্যে তাহলে আমাদের কি কিছু করণীয় নেই? প্রয়োজন পড়লে আমাদের অবশ্যই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হবে। তবে তাতে তিল-তন্ডুল-গম-যব-ঘি-

পশমের চাদর দান করার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এজন্যে কী করতে পারি? যতদিন তাঁরা আমাদের সমাজে রয়েছেন ততদিন তাঁদের প্রতি আমাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব, তাই তাঁদের প্রতি সামাজিক দায়–দায়িত্ব আছে বৈ কি! আর যখন তাঁরা ইহলোক ছেড়ে অন্য লোকে যাত্রা করেন, তাঁরা আমাদের দায়িত্বের বাইরে চলে যান। সেক্ষেত্রে আমরা তাঁদের কোন সেবা বা উপকারই করতে পারি না। দাহ সংস্কার বা কবরস্থ করার পর পরলোকগত মানুষটির প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়।

তাহলে আমরা কী করতে পারি? আমরা বলতে পারি, "হে পরমপুরুষ, যতদিন মানুষটি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন আমরা যথাসাধ্য তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন তিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছেন। হে করুণাময় ব্রহ্ম, তুমি তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে ওঁকে স্থান দিও।”

পরমপুরুষের কাছে গতায়ুঃ মানুষটির জন্যে আমরা এই প্রার্থনাই করতে পারি। তার বেশী আর কী করতে পারি? আনন্দমার্গীয় শ্রাদ্ধবিধি এই রকমই। এই বিধিতে মৃতের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যসামগ্রী, নব বস্ত্র অথবা কোন প্রকার বাহ্যিক উপকরণের প্রয়োজন নেই। আমরা অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে

আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। এর বেশী কিছু আমরা করিও না, করতে পারিও না।

(পটনা, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭৬

ভূত–প্রেত

আজকের আলোচ্য বিষয় 'ভূত–প্রেত'। এখন দেখা যাক, মানুষ মারা যাবার পর কী হয়? মৃত্যুর পর স্নায়ুতন্ত্ব ও স্নায়ুকোষ সহ মানুষের শরীরটা থেকে যায় পৃথিবীতে আর শেষ পর্যন্ত পঞ্চমহাভূতে বিলীন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর মানুষের কর্মাশয় ও অতিস্নায়ুকৌষিক স্মৃতি সহ মন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও রজোগুণী প্রকৃতির সহায়তায় বিশ্বের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। সে প্রতীক্ষা করতে থাকে একটা উপযুক্ত আধারের জন্যে যার মাধ্যমে তার অতৃপ্ত বাসনার পূর্তি হতে পারে, অভুক্ত সংস্কারের ভোগ হতে পারে।

দ্বিতীয় আধারে আলয়ীভূত কর্মাশয়কে বলা হয় 'সংস্কার'। এই যে কর্মাশয় ও অতিস্নায়ুকৌষিক স্মৃতি, এদের চোখে দেখা

যায় না। আর যেহেতু স্থূল চোখে দেখা যায় না তাই কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়, "আমি অমুক বিদেহী মনটা দেখেছি, অমুক বিদেহী আত্মাটা দেখেছি”। সেই সঙ্গে আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে সেই বিদেহী মনটা একাকী নেই। সেই মনের সঙ্গে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মৃতের অভুক্ত সংস্কার ও অতিস্নায়ুকৌষিক স্মৃতি। প্রকৃতির রজোগুণের সাহায্য নিয়ে সেই বিদেহী মনটা বিশ্বের এখানে–ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে খালি চোখে দেখা যায় না ও সেই সঙ্গে মনের কোন কেন্দ্রবিন্দু না থাকায় আর স্নায়ুকোষ না থাকায় সেই বিদেহী মন ঠিক ভাবে কাজও করতে পারে না। ঠিক ভাবে কাজ করতে গেলে চিত্তাণুপুঞ্জের সাহায্য দরকার। কাজেই চিত্তাণবিক অভিব্যক্তির জন্যে তার একটা নোতুন শরীর দরকার।

যথাকালে অণ্ডাণু ও শুক্রাণুর মিলনের পর হয় কী? মন একটা নোতুন দেহাধারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে আর অণ্ডাণু ও শুক্রাণুর মন ও প্রাণ কাজ করা বন্ধ হয়ে পড়ে। এই যে অণ্ডাণু ও শুক্রাণু বাছা হ'ল তার পেছনে উদ্দেশ্য এই থাকে যে তার দ্বারা কর্মাশয় সহ বিদেহী মানসের অভুক্ত সংস্কারের ক্ষয় হবে।

এই যে মন যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল আর এই যে বিদেহী মানস, এই বিদেহী মানস নূতন শরীর পাবার আগে কী

করে? এই বিদেহী মন বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে থাকে। কেউ তাকে দেখেও না, কেউ শোণেও না। কিন্তু মনে রেখো মানুষ তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে তার চিত্তাণুর সংরচনাকে বিকশিত বা মজবুত করে তুলতে পারে। সংশ্লিষ্ট সাধক বিদ্যাতান্ত্রিকও হতে পারেন, আবার অবিদ্যাতান্ত্রিকও হতে পারেন। যাই হোক না কেন, তার চিত্তাণবিক প্রগতি কিছুটা হয়ে থাকে বৈ কি। সেক্ষেত্রে সেই তান্ত্রিকেরা তাঁদের চিত্তাণুপুঞ্জের সহায়তায় সেই বিদেহী মানসকে সাময়িক চিত্তাণবিক সংরচনা পেতে সাহায্য করেন। সাময়িক ভাবে তান্ত্রিক সহায়তায় মানুষ যখন এক্টোপ্লাজমিক শরীর পায় আর সেই চিত্তাণুপুঞ্জ যখন কিছুটা সংহত হয় তখন তাকে চোখে দেখা যায়। কখনও কখনও স্পান্দনিক ফ্রিকোয়েন্সীর দরুণ এই বিদেহী মানসের শব্দও শোনা যায়।

তোমরা শুণেছ নিশ্চয়, কারো কারো বাড়ীতে মাঝে মাঝে হাড়গোড় ফেলা হচ্ছে, ইট-পাটকেল পড়ছে, কোথাও বা কারো চৌকি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভূতুড়ে বাড়ীর এই সব ভৌতিক কাণ্ড হয়তো তোমরা অনেক শুণেছ। এ জিনিসগুলো কী? খোঁজ নিয়ে দেখবে, কোন অবিদ্যাতান্ত্রিক (বিদ্যাতান্ত্রিক এসব করে না), কোথাও চুপটি করে আসন মেরে বসে আছে। তারই চিত্তাণুপুঞ্জের একাংশ দিয়ে সেই বিদেহী

মানসের জন্যে একটা জড়াধার তৈরী করে। তারই সহায়তায় সে এই ধরনের ভৌতিক কাণ্ড করে থাকে।

এই সময় সেই সব অবিদ্যাতান্ত্রিকের শরীর বিন্দু মাত্র নড়াসরা করবে না। এই যে তথাকথিত ভৌতিক কাণ্ড, এ সব কোন ভূত–প্রেত করছে না। করছে সেই অবিদ্যাতান্ত্রিকটা বিদেহী মানসের সহায়তায়। কেউ কেউ হয়তো বলবেন –না ও সব ভূত–প্রেতের কাজ, আসলে কিন্তু তা নয়।

আর এক ধরনের সত্তা (being) আছে। তাদের জন্যে আমি ইংরেজী being শব্দটা ব্যবহার করছি কারণ সেগুলোকে আবার জীবিত প্রাণী অথবা মৃত প্রাণী বলে চিহ্নিত করাও দুষ্কর। এদের ব্যাপারটা কী রকম? এরা হ'ল সাত রকমের দেবযোনি। এদের জন্যে divine entity বা দেবযোনি শব্দ ব্যবহার করা হয় যদিও আসলে এরা divine নয়। তবুও divine শব্দটা ব্যবহার করা হয় এই জন্যে যে এরা সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চ স্তরের সত্তা।

ধর, কোন মানুষ সাধনা করছে–আর করছে নিয়মিত রূপেই, ঠিক ভাবেই। মনে আধ্যাত্মিক প্রেরণা–নিষ্ঠা এ সবও আছে। কিন্তু তার মনের মধ্যে আধ্যাত্মিক এষণা ছাড়াও হয়তো আরো কিছু সুপ্ত বাসনা–কামনা লুকিয়ে রয়েছে। মানুষটা ভাল,

নিষ্ঠা সহকারে সাধনাও করছে, আবার সেই সঙ্গে মনে মনে এটাও ভাবছে, বাবা যদি আমাকে দশ লাখ বা পাঁচ লাখ, কম পক্ষে দু' লাখ টাকা পাইয়ে দেন তাহলে আমার সব কাজ ঠিক ঠিক চলে যাবে। আবার ভাবছে– দুর ছাই! এ সব কী আজেবাজে চিন্তা আসছে মনে! না, না, এ সব জিনিস চাইব না। এ তো খুব বাজে জিনিস... খারাপ জিনিস।

এখন ওই যে টাকা–পয়সার বাসনা–কামনা তার মনের মধ্যে গোপন ভাবে রয়ে গেছে, যদিও লোকটি ভাল, সাধন-ভজনেও নিষ্ঠা আছে, আন্তরিকতা আছে, উন্নত মানুষই বলতে হবে–এই ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে হয় কী? – না, মৃত্যুর পর এদের শরীরের ক্ষিতিতত্ত্ব ও অস্তত্ত্ব তো ক্ষিতি মহাভূত ও অপ্ মহাভূতে বিলীন হয়ে যায় কিন্তু বাকী তিনটে তত্ত্ব অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও ব্যোমতত্ত্ব থেকে যায় বিদেহী মানসের সঙ্গে। এরাই হ'ল দেবযোনি। প্রকৃতি ভেদে এদের সাত ভাগে ভাগ করা হয়–যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও প্রকৃতিলীন।

যক্ষ: একটু আগে ওপরে যে উদাহরণটা দিলুম, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষটি স্বভাবগত ভাবে ভাল হলেও মনের মধ্যে টাকা–পয়সার প্রতি লোভ বা বাসনা রয়ে গেছে মনের অজ্ঞাতসারে। আর এই যে অপূর্ণ কামনা–বাসনা, এটাই তার

অধঃপতনের মূল কারণ। এই ধরনের দেবযোনির নাম যক্ষ। বিহারে, বিশেষ করে উত্তর বিহারের অধিকাংশ গ্রামের প্রান্তে, সকল গ্রামে নয়, তবে অধিকাংশ গ্রামেই দেখবে একটা করে বিশেষ স্থান আছে লোকে যাকে বলে ব্রহ্মস্থান। গ্রামপ্রান্তের ওই ব্রহ্মস্থানে গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে যক্ষের পূজো করে এসেছে, এখনও অনেকে করে। পৌরাণিক দেব-দেবীর চালচিত্রে দেখা যায়, মূল দেবতা বা দেবীর ডাইনে বা বাঁয়ে যক্ষ-যক্ষিণী দাঁড়িয়ে আছে চামর হাতে। তাহলে যক্ষ হচ্ছে একটা ত্রিভৌতিক সত্তা-পাঞ্চভৌতিক নয়। আর এই ত্রিভূত হচ্ছে তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও ব্যোমতত্ত্ব। এই যে তেজোময় সত্তা একে স্পর্শ করা যায় না কিন্তু কখনও কখনও চোখে দেখা যায়।

রক্ষ: আবার দেখবে কিছু লোক থাকে যারা মানুষ হিসেবে ভাল, আধ্যাত্মিক এষণাও আছে, শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাও আছে কিন্তু উপাসনা করতে বসে মনে মনে ভাবে, আমি যদি একবার দেবীর কৃপা পাই তাহলে ওই সব অসামাজিক তত্ত্বগুলোকে পিটিয়ে সাবাড় করে দোব। পরক্ষণেই হয়তো ভাবলে, পূজোয় বসে এ সব কী আবার উল্টোপাল্টা ভাবছি। এ তো ঠিক নয়। সাধনায় বসে এই সব অসাধকোচিত চিন্তা-ভাবনার দরুণ মানুষের আধ্যাত্মিক অধোগতি হয়। মৃত্যুর পর এরা ক্ষিতিভৌতিক বা অপ্'তাত্ত্বিক শরীর পায় না কিন্তু তেজস্তাত্ত্বিক ও ব্যোমতাত্ত্বিক শরীর পেয়ে থাকে। এরা হ'ল রক্ষ!

কিন্নর: বাবা আমাকে সব কিছু দিয়েছেন কিন্তু একটা জিনিসের অভাব রয়ে গেছে–আমি দেখতে আদৌ সুন্দর নই। আমি দেখতে সুশ্রী হতে চাই যাতে লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে না বলে না, না, না, দেখতে খুবই খারাপ। এরা মানুষ হিসেবে ভাল। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ভাল, তবুও মনের মধ্যে এই যে সুপ্ত কামনা–বাসনা এই জন্যে মৃত্যুর পর এরা ত্রিতাত্ত্বিক শরীর পায়। এরা হ'ল কিন্নর।

বিদ্যাধর: আমি নিশ্চয়ই ভাল সাধক কিন্তু আমার বাকশক্তি তেমন নেই। আমি ভাল করে গান গাইতে পারি না, নাচতে পারি না, আমার বাকযন্ত্র তেমন ভাল ভাবে কাজ করে না। আমাকে আরও গুণ অর্জন করতে হবে। আর আমার যদি এই সমস্ত যোগ্যতা বা গুণ এসে যায় তাহলে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হবে, চাকুরিতে প্রমোশন হবে। আবার পরক্ষণেই হয়তো ভাবছে–এ কি! আমার মনের মধ্যে এসব বাসনা–কামনা কিলবিল করছে কেন! না, না, না, এ সব খারাপ চিন্তা! এ সব কু–চিন্তা মনে স্থান দেওয়াই অপরাধ। উন্নত মানুষের মনে কামনা–বাসনা থাকা উচিত নয়। এ ধরনের মানুষেরা মৃত্যুর পর ওই ধরনের ত্রিতাত্ত্বিক শরীর পায়। বিদেহী মনের সঙ্গে ওই তিনটে ভূত থেকে যায়। এদের বলা হয় বিদ্যাধর।

গন্ধর্ব: ধর, কোন মানুষ সাধনা করে চলেছে। প্রথম দিকে কোন বাসনা- কামনা নেই। তারপর হয়তো মনে জাগল, "আচ্ছা, এই যে ভজন গাইছি কিন্তু আমার কন্ঠস্বরটা তো তেমন মিষ্টি বা সুরেলা নয়। কন্ঠটা মাঝে মাঝে ঠিক মত কাজ করে না। গলার স্বরটা আর একটু বেশী রকম মিষ্টি আর ছান্দসিক হলে ভাল হত। তার পরই হয়তো মনে ভাবনা জাগল–এ আবার কী বাজে চিন্তা জাগছে মনে, এ তো বাপু ঠিক নয়। এই ধরনের মানুষেরা মৃত্যুর পর যে ধরনের আধার পায় তাদের বলা হয় গন্ধর্ব। সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি এদের বড় বেশী অনুরাগ। এই জন্যে সঙ্গীতের সংস্কৃতে অপর নাম গন্ধর্ববিদ্যা।

সিদ্ধ: সিদ্ধ কাকে বলে? ধর, এক জন ভাল লোক আছেন যার কোন জাগতিক বাসনা–কামনা নেই। কিন্তু সাধনায় বসে মনে মনে ভাবছে–"হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জেগেছে নিঃসন্দেহে; মানুষ আমাকে ভালবাসে, ৰাৰাও আমাকে ভালবাসেন। এ সব তো হ'ল কিন্তু আরও একটা জিনিস চাই। আমার কিছুটা সিদ্ধি দরকার। তাই দেখে না লোকে বলবে–লোকটার আধ্যাত্মিক সিদ্ধি আছে, সাধারণ লোক নয়। ওর মধ্যে অলৌকিক শক্তি, বিভূতি আছে"। আবার পরক্ষণেই ভাবছে–"না, না, না, এ সব কী উদ্ভট চিন্তা আসছে....এ সব তো ঠিক নয়, খারাপ জিনিস।" এই ধরনের লোকেরা যে

মরণোত্তর আধার পায় তাকে বলা হয় সিদ্ধ। দেবযোনিদের মধ্যে সিদ্ধের স্থান সর্বোচ্চ। এই সিদ্ধদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলার ইচ্ছে রইল।

প্রকৃতিলীন: কিছু লোক মূর্তিপূজো করেন। তাঁরা সেই মূর্ত্তিতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করেন, ভাবেন যে সেই মূর্তিটা ভগবান বা ব্রহ্ম। তাঁরা এই ভাবে প্রস্তর–ধাতু–দারু নির্মিত মূর্ত্তির পূজা করেন। তন্ত্রে বলা হয়েছে: “মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদিমূর্যাবীশ্বরৰদ্ধয়ে"। 'মৃৎ' মানে মৃত্তিকা বা মাটি, 'শিলা' মানে প্রস্তর বা পাথর, 'ধাতু' মানে ধাতু বা metal, 'দারু' মানে কাষ্ঠ বা কাঠে (সাধারণতঃ এই সব জিনিস দিয়ে মূর্ত্তি তৈরী করা হয়)। মানুষ তাই এই সব জিনিস দিয়ে তৈরী মূর্তিতে ঐশ্বরীয় ভাব আরোপ করে পূজার্চনা করে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”। যার যেমনটি ভাবনা তার সিদ্ধিও তদনুযায়ী হয়। মানুষ যেমন যেমন লক্ষ্য নিয়ে চলবে তদনুযায়ী সে আধারও পাবে। যারা নানান প্রাকৃত রূপের উপাসনা করে শেষ পর্যন্ত তারা সেই প্রাকৃত সত্তারই রূপ পরিগ্রহ করে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তারা পাথর, কাঠ, ধাতু ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এই সব প্রাকৃত রূপের অনন্য উপাসকের মৃত্যুর পর যে আধার লাভ হয় তাঁদের বলা হয় 'প্রকৃতিলীন'। তারা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তাতেই লীন হয়ে থেকে যায়। মানুষের কী দুর্দৈব!

এই যে সাত রকমের দেবযোনির কথা বলা হ'ল এদের মধ্যে সিদ্ধই সর্বোৎকৃষ্ট। সিদ্ধেরা পূর্ব জীবনে বড় সাধক ছিলেন কিন্তু তাদের সাধনা মাঝপথে থেমে যায়। যখন গায়ক বা নর্তকরা কোথাও একত্রিত হন তখন কী হয়। না, গন্ধর্বরা তাঁদের মানসদেহ, তাঁদের সংস্কার ও অতিস্নায়ুকৌষিক স্মৃতি সহ সেখানে পৌঁছে যান। কোথাও সঙ্গীত অনুষ্ঠান হলেই গন্ধর্ব্বরা সমবেত হন– তবে লোকলোচনের অগোচরে। কখনও কখনও তারা নজরেও পড়ে যান।

তেমনি কোথাও আধ্যাত্মিক সমাবেশ ঘটলে সিদ্ধরা পৌঁছে যান। সঙ্গীতানুষ্ঠানে কোন কুশলী কলাবিদের মন একাগ্র হলে তাঁরা গন্ধর্বদের জ্যোতির্ময় দেহ দেখতে পান। তেমনি সাধনায় মন একাগ্র হলে বা কীর্ত্তন করতে করতে সাধকের মন অন্তর্মুখী হলে তাঁরা সিদ্ধের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারেন। জামালপুর ময়দানে বাঘের কবরটার ধারেকাছে বহু সিদ্ধের সমাগম ঘটত। জনৈক গৃহী আচার্য সেই সব সিদ্ধ মূর্ত্তি দেখতে পেতেন।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে মার্গের দু' জন তান্ত্রিক সাধক সাধনা করবার জন্যে একটা

নদীর ধারে এসে পৌঁছান। নদীটা এমনিতে খুব বড় নয়, কিন্তু গভীরতা আছে। সাধনার জন্যে কী করে নদীর ওপারে যাওয়া যায় সাধক দু' জন এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। নদীর অপর পারেই ছিল শ্মশান ভূমি। সেই নিশীথে তাঁরা মহা ফাঁপরে পড়লেন। হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন, সামনেই একটা জ্যোতিমূর্তি। সেই জ্যোতিমূর্তিটা তাঁদের সামনেই নদীর ওপর দিয়ে চলতে লাগল। সাধক দু' জন সেই মূর্ত্তিটাকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলেন। একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে সেই মূর্ত্তিটা নদীর স্রোত ভেঙ্গে এগোতে লাগল, সাধকেরাও সেই মূর্তিটির পিছনে পিছনে এগিয়ে চললেন। নদীটার সেই জায়গাটা ছিল অগভীর.... মাত্র এক হাঁটু জল। ওরা সহজেই নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেলেন। নদীর ওপারে ছিল একটা গাছ। সেখান থেকে ওঁরা দু'দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু দূরে গিয়ে সাধনায় বসলেন। সাধনা সেরে ওঁরা দু' জনে সেই গাছটার তলায় মিলিত হলেন। সেই জ্যোতিমূর্তিটা আবার দেখা গেল। ওঁরা সেই মূর্ত্তিটাকে অনুসরণ করে তার পিছু পিছু চলে নদীটা পেরিয়ে গেলেন। নদী পেরিয়ে এসে ওঁদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ সাধকটি ৰড়টিকে বললে, "দাদা, চলুন না, জ্যোতিমূর্তিটির কাছে গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। যেই না বলা, অমনি মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। কী বা কে ছিল সেই জ্যোতিমূর্ত্তি? না, সিদ্ধ।

যখন কেউ অপ্রাকৃত ছবি বা অপ্রাকৃত মূর্ত্তি বা অতিপ্রাকৃত সত্তাকে দেখে তখন কী হয়? একটা সম্ভাব্য ব্যাপার নিয়ে আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। হতে পারে, কোন তান্ত্রিক তাঁর চিত্তাণবিক সংরচনার সহায়তায় বিদেহী মানসের জন্যে কোন কৃত্রিম জড়াধার তৈরী করে লোককে ভয় দেখান। কোন বিদ্যাতান্ত্রিক এ কাজ করবেন না। কিন্তু অবিদ্যাতান্ত্রিক লোককে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে এমনটি করলেও করতে পারে যেমন তারা অতীতে করত। কিছু টাকা- পয়সা পেয়ে গেলে ওরা আর এসব করে না।

আবার এও হতে পারে, ধর তুমি কোথাও কারো বাড়ী গেছ। লোক মুখে হয়তো শুণলে যে বাড়ীটা ভুতুড়ে। দেখবে প্রতি শহরেই এ রকম দু' চারটে ভুতুড়ে বাড়ী রয়েছে। আমি তো এ ব্যাপারে তোমাদের ইতোপূর্বেই বলেছি- এ রকম ভুতুড়ে বাড়ী পেলেই তো কিনে নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করবে। ভূতেরা আনন্দমার্গীদের ভয় দেখাতে পারবে না কারণ ভূতেরা আনন্দমার্গীদের ভয় করে। আনন্দমার্গীরা তো শিবের ভক্ত, তাই ভূতেরা শিবের গণেদের ভয় দেখাতে পারবে না।

এতে হয় কী? -না ভয়ের জন্যে, আরোপিত ভীতির জন্যে মানুষের মন একাগ্র হয়ে যায়। আর মানসিক একাগ্রতার জন্যে কী হয়? -না, তার নিজের চিত্তাণুপুঞ্জের একাংশ বিদেহী

মানসের জন্যে আধার তৈরীর কাজে সহায়তা করে। তাই তুমি নিজের মন দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে দেখতে পাও। তোমার নিজের মনের চিত্তাণুপুঞ্জের মধ্যেই একটা সংরচনা তৈরী হয়ে থাকে।'কিন্তু সেই বিদেহী মানসটাও তো রয়েছে। সেটা তো আর ভূত নয়। আর এই যে ব্রহ্মপিশাচ বা কয়েক প্রকারের তথাকথিত ভূত–সে তো তোমার মনেরই সৃষ্টি। তোমার মানসিক একাগ্রতার দরুণ তোমার মনেরই কিয়দংশ সেই বিদেহী মানসের আধার তৈরীর জন্যে সাহায্য করছে যদিও সেই মানসিক একাগ্রতা কিছুটা সাময়িক।

এই যে সাময়িক একাগ্রতা, এটা আসে সাধারণতঃ পাঁচ ধরনের মানসিক অবস্থায়–ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মানুষের মন যখন নানান ঝুটঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, নানান দুর্ভাবনা–দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে মনের সেই অবস্থাটাকে বলা হয় ক্ষিপ্ত মন। সেই অবস্থায় হঠাৎ সাময়িক একাগ্রতার দরুণ এই ধরনের অবস্থা আসে। আর যখন তোমার মস্তিষ্ক স্থিরই করতে পারে না কী করণীয়, কী অকরণীয়, তুমি বিহ্বল হয়ে পড় কী করবে কী না করবে ভেবে, সেটা হ'ল মূঢ় মন। মুহ্ + ক্ত = মূঢ়। বিক্ষিপ্ত মন হ'ল: যখন তুমি মনকে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে একাগ্র করছ না, শেষ পর্যন্ত মনটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তোমরা জান, ছোট ছোট শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্যে এক ধরনের ঘুমপাড়ানী গান গাওয়া হয়। এতে বিক্ষিপ্ত হয়ে

ক্লান্ত হয়ে মন ঘুমিয়ে পড়ে। শিশুদের কাণের কাছে সুর করে আবৃত্তি করে শোনানো হয়, শিশুরা শুণতে শুণতে গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। একাগ্র হ'ল যখন মনটা বিন্দুস্থ হয়ে পড়ে। আর পঞ্চম হ'ল, নিরুদ্ধাবস্থা যখন মনের যাবতীয় বৃত্তির অভিপ্রকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই পাঁচ ধরনের মানসিক অবস্থায় মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাদের নিজ মনের কিছুটা অংশ বিদেহী মনকে ধার দেয় ও ফলতঃ সে ধনাত্মক ভ্রান্তিদর্শনের সৃষ্টি করে (positive hallucination)।

(পটনা, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭৭

জীবাত্মা ও প্রত্যগাত্মা

নানান ছন্দ ও ছড়ায়, নানান ঋক্ ও শ্লোকে বলা হয়েছে পরমপুরুষের কাছ থেকে তুমি কেবল এতটুকুই প্রার্থনা করতে পার যে "হে পরমপুরুষ, তুমি আমার বুদ্ধিকে শুভের পথে

আনন্দের পথে চালাও”। এ ছাড়া পরমপুরুষের কাছ থেকে আর কিছু চাইবার নেই।

"য একো হবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
সঃ নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।।”

'নো বুদ্ধা'। 'নঃ' মানে 'অস্মাকং'.... আমাদের। পরমপুরুষ আমাদের বুদ্ধিকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন। "নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত্ব”: আমাদের বুদ্ধিকে শুভের সঙ্গে সংযুক্ত রাখুন।

সবিতৃ ঋকে এও বলা হয়েছে, "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”। যঃ নঃ ধিয়ো প্রচোদয়াৎ অথবা যঃ অস্মাকং ধিয়ো প্রচোদয়াৎ সদ্বিধানং করোতু। যাতে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে চালিত করেন। 'প্রচোদয়াৎ' মানে 'সদ্বিধানং করোতু, bliss অর্থাৎ কল্যাণের পথে চালান।

আর তাই সর্বাগ্রে যে জিনিসটার উন্নতি ঘটানো দরকার তা হ'ল বুদ্ধি– মানব বুদ্ধি। বুদ্ধিটাকে নির্মল করতে হবে.... পবিত্র করতে হবে। মানুষের বুদ্ধি যদি নির্মূল হয়, সাধারণ বুদ্ধিটা

যখন ধর্মবুদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়, মানুষ সব কিছু পেয়ে যায়। আর সেই অবস্থায় এই বুদ্ধির অন্তিম লক্ষ্য কী থাকে? বুদ্ধিটাকে নির্মল করতে হবে, ভাল কথা কিন্তু নির্মল হবার পর বুদ্ধিটাকে কী ভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে? সেই বুদ্ধিটার শেষ গন্তব্যস্থল কী হবে? সেটা যাবে কোথায়?

"যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীন মেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো
যঃ সঃ নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপে হয়মাত্মা।।"

বুদ্ধি হ'ল যেন দর্পণ বা আয়না, পরমপুরুষ সেই বুদ্ধি রূপী দর্পণে প্রতিফলিত হন। মানস দর্পণে পরমপুরুষের সেই প্রতিফলিত অংশটুকুর নাম জীবাত্মা।

ধর, একটা ঘরে একটা লাল ফুল রয়েছে। আর রয়েছে বিশটা দর্পণ। সেখানে কী দেখবে? একটা মূল ফুল ও বিশটা প্রতিফলিত ফুল। এই মূল ফুলটা হ'ল পরমপুরুষ বা প্রত্যগাত্মা আর প্রতিফলিত ফুলগুলো হ'ল জীবাত্মা। পরমপুরুষের একটা বিশেষ নাম প্রত্যগাত্মা। যে সত্তা পরমপুরুষের প্রতিফলিত অংশগুলির সাক্ষীসত্তা তার নাম প্রত্যক্ + আত্মা = প্রত্যগাত্মা।

যখন প্রতিফলক দর্পণ থেকে সমস্ত মলিনতা দূর হয়ে যায় তখন তাতে স্বচ্ছতর প্রতিফলন ঘটে। মানস দর্পণ যখন সম্পূর্ণ আবিলতামুক্ত থাকে তখন তাতে পরমাত্মার প্রতিফলনও বেশী স্পষ্ট থাকে। আর তা করতে গেলে তোমাকে কী কী করতে হবে? না, সাধনা ও জনসেবার দ্বারা তোমার মনকে নির্মল রাখতে হবে। সাধনা ও জনসেবা এই দুয়ের মাধ্যমে মানস দর্পণ খুবই ভাল অবস্থায় থাকে। এটা হ'ল সবিকল্প সমাধির স্তর। কিন্তু তোমার অন্তিম লক্ষ্য, চরম তথা পরম ধ্যেয় কী? সবিকল্প বা সগুণাস্থিতি তোমার চরম ধ্যেয় নয়। তোমাকে আরও এগোতে হবে। সগুণাস্থিতি কোন মতেই শেষ লক্ষ্য নয়, এটাই তোমার সব কিছু নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, মূল ফুলটা যে সমস্ত আর্শীতে প্রতিফলিত হয়েছিল এখন যদি সেই সব আর্শীগুলোকেই সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? না, মূল ফুলটা অপ্রতিফলিত রয়ে যাবে। তেমনি তুমি যদি মানস দর্পণটা সরিয়ে দাও তাহলে তুমিও পরমপুরুষের সঙ্গে মিশে যাবে। দর্পণটা যদি মূল ফুলটার অত্যন্ত কাছে এসে যায় ও পরে একাত্ম হয়ে যায় তাহলে দর্পণে প্রতিফলনের প্রশ্ন ওঠে না। এটাই হ'ল নির্গুণাস্থিতি।

প্রশ্ন ওঠে, এটা হবে কী করে? ভক্তির পথ ধরে চলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। তাহলে মূল ফুলটা অর্থাৎ পরমপুরুষের দিকে কী ভাবে এগোবে?

তোমরা জান, বিশ্বের সবাই, সব কিছুই বিশ্বের চক্রনাভির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে চলেছে। সেই চক্রনাভির সঙ্গে মিলেমিশে এক হবে কী করে? তোমাকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে চলতে হবে, তাতে ব্যাসার্ধের দূরত্ব কমতে থাকবে। আর এই ব্যাসার্ধের দূরত্ব কী করে কমবে? তোমার আমিত্ব- বোধের মধ্যে ভক্তিভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই ঋষি বলছেন, বুদ্ধি যখন আর মূল সত্তার প্রতিফলন ঘটাতে অক্ষম হয়ে পড়বে অর্থাৎ সেই মানস দর্পণটা যখন মূল সত্তার সঙ্গে মিশে যাবে তখন আর প্রতিফলনই থাকবে না।

এখন প্রশ্ন হ'ল তোমার আমিত্ব-ৰোধকে, তোমার মানস দর্পণকে সরাবে কী করে। মাত্র একটি পথ, মাত্র একটি উপায়ই আছে-তা হ'ল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তুমি পরমপুরুষকে আত্মনিবেদনের ভাষায় বলতে পারঃ “হে পরমপুরুষ, হতে পার তুমি সুমহান; হতে পার তুমি পরিদৃশ্যমান জগতের চক্রনাভি। আমি মানছি, তুমি অসীম, অনন্ত আর আমি একান্তই সীমিত সত্তা, তুমি বিশাল-বিরাট আর আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। হতে পার তুমি সব কিছুই; আমি তো কিছুই না.... কিন্তু তুমি তো

উপেক্ষা করতে পারনা, অস্বীকার করতে পারনা যে তুমি হলে আদি পিতা আর আমি হলুম তোমার সন্তান, তোমার কোলে বসা আমার তো জন্মসিদ্ধ অধিকার। এটা তো তুমি কখনই অস্বীকার করতে পার না।

কাজেই প্রতিটি সত্তার তার দিকে এগিয়ে চলার, তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হবার অধিকার আছে। আর অনুমন যখন তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায় দর্পণটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। প্রতিফলনের কাজটা ৰন্ধ হয়ে যায়। জীবাত্মাও থাকে না। জীবও শিবের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। "পাশৰদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো ভবেচ্ছিবঃ।" জীব হয়ে যায় শিব। এটাই হ'ল মানুষের জীবনে চরম লক্ষ্য, এটাই হ'ল মানুষের নির্গুণাস্থিতি।

(পটনা, ২০ অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭৮

"সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"

নির্গুণ ব্রহ্ম অনন্ত, সগুণ ব্রহ্মও অনন্ত। অনন্ত নির্গুণ থেকে অনন্ত সগুণকে বাদ দিলে যে বিয়োগ ফল থাকে তাও অনন্ত। তাই পরম ব্রহ্মের জন্যে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা নিতান্তই দুরূহ। তথাপি সেই পরম সত্তা এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।”

এখন, আমরা জানি, আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিও এই কথাটা ৰোঝে আর বড় বড় দার্শনিকেরাও যখন এই ধরনের কথা বলেন যে পরমপুরুষ অনন্ত তবু আমরা কেন বলি, পরমপুরুষ এক? আমরা বিলক্ষণ জানি, তিনি অসীম, অনন্ত, অশেষ তবু আমরা বলি, তিনি এক। কেন? কারণ, তাঁকে ছাড়া আমরা আর কোন দ্বিতীয় অনন্ত সত্তা খুঁজে পাচ্ছি না। এই জন্যেই বলি, তিনি এক। যদিও তিনি অসীম অনন্ত তবুও তিনি এক, কারণ তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। তাই তাঁকে 'এক' বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এখন প্রশ্ন হ'ল, সেই 'এক' সত্তাটি থাকেন কোথায়, তাঁর স্বরূপটাই বা কী? আর যেহেতু সেই সত্তা সর্বদা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি বরাবর অপ্রতিদ্বন্দ্বী থেকে যান। এখন প্রশ্ন হ'ল, তিনি কী ধরনের সত্তা? তিনি 'দেব'.... 'দেব' কী? 'দিক্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দের মানে চরম দ্যোতনাত্মক সত্তা,

চরম স্পন্দনাত্মক সত্তা.... যিনি সবাইকে স্পন্দিত-ছন্দিত-দোলায়িত করে দেন। তিনি হলেন যাবতীয় স্পন্দনের প্রতিভূ, স্বভাবগত ভাবেই তিনি সবাইকে, সকল সত্তাকে স্পন্দিত করে দেন। তিনি হলেন চরম ও পরম Motivation, যেখানেই আমরা স্পন্দন দেখতে পাই, বুঝতে হবে সেই এক দেবেরই অভিপ্রকাশ।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি কোন সাধারণ দেব নন। তিনি হলেন যাবতীয় দ্যোতনার সমাহার.... সর্বদ্যোতনাত্মক, তিনি দেবতাদের দেবতা.... মহাদেব। যেহেতু তিনি সকল দেব-দেবতাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন তাই তিনি মহাদেব। দেবী-দেবতা অসংখ্য হতে পারে, কিন্তু মহাদেব এক ও অদ্বিতীয় সত্তা যিনি অন্যান্য দেবতা বা অন্যান্য দ্যোতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। এ জগতে প্রতিটি প্রকাশমান বা ব্যক্ত সত্তার ভেতর তিনি গুহায়িত হয়ে রয়েছেন। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের গ্রহণ সামর্থ্যের মধ্যে সেই সব অভিব্যক্তিগুলো আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এখন বলতে পার, তিনি কি কেবল ব্যক্ত সত্তার মধ্যেই বিরাজ করেন, পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে থাকেন না? উত্তরে বলল, পরমপুরুষ সকল সত্তার ভেতরে ও বাইরে উভয়ত্রই রয়েছেন। তিনি সব কিছুর ভেতরে ও বাইরে রয়েছেন, তাই তাঁকে বলা হয় 'কর্মাধ্যক্ষ'। আবার....তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতান্তরাত্মা। আর যেহেতু তিনি

সর্বব্যাপী তাই তিনি সব কিছুর ভেতরেও রয়েছেন, তেমনি সব কিছুর বাইরেও রয়েছেন।

'সর্বভূতান্তরাত্মা'। অর্থাৎ তিনি সর্বভূতে গুহায়িত আত্মস্বরূপ। তিনি এই পরিদৃশমান জগতের বাইরেও রয়েছেন ঠিক যেমন এই পরিদৃশ্যমান জগতের ভেতরে থেকে কাজ করে চলেছেন। তাই যখন কাউকে তাঁর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে হবে তখন তাকে অবশ্যই এই যাবতীয় জাগতিক অভিব্যক্তি বা দৃশ্যমানতার পরিভূ–র বাইরে যেতে হবে। এই যে প্রকাশমান বিশ্বজগৎ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে মনকে রেখে তাঁর দিকে এগিয়ে চলতে হবে।

(পটনা, ২১শে অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

প্রবচন–৭৯

সর্বত্র তাঁরই প্রতিচ্ছায়া

কাল বলেছিলুম, কেন তাঁকে 'এক' বলা হয়, কেনই বা বলা হয় "দেবানাং দেবঃ", কেনই বা তিনি বিশ্বের সর্বব্যাপী, সকল বস্তুর ভেতরে ও বাইরে তাঁর অবস্থিতি? তিনি সর্বব্যাপী–এটা

বাস্তব সত্য কিন্তু কী ভাবে, অথবা কেন তিনি সর্বব্যাপী? এই সর্ব শব্দটার মানেই বা কী?

আমি এর আগে তোমাদের বলেছিলুম, সর্ব মানে প্রকাশিত সব কিছু। 'সর্ব' শব্দে পাচ্ছি তিনটি বর্ণ–বলতে পারি তিনটি মাতৃকাবর্ণ–স, র, ব। তোমরা ৰোধ হয় জান প্রতিটি স্পন্দনাত্মক অভিব্যক্তির জন্যে আছে এক একটি ৰীজমন্ত্র। এই ৰীজমন্ত্রকে বাদ দিয়ে কোন স্পন্দনাত্মক অভিব্যক্তি থাকতেই পারে না। যেখানেই স্পন্দন, যেখানেই অভিব্যক্তি, সেখানেই ধবনি। সেই ধবনি শোণা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে, কিন্তু আছে। আর যেখানে ধবনি আছে সেখানে বর্ণও আছে। সেই বর্ণ মানুষের চোখে ধরা দিতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু বর্ণ অবশ্যই আছে।

তাই সমগ্র ভূমামানসের অভিব্যক্তির জন্যে ৫০ ধরনের pencils of vibration আছে। ঠিক পঞ্চাশ ধরনের স্পন্দন বলব না, fifty pencils of vibration আছে। যদি আমরা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করি, দেখব আমরা হাজারটা স্পন্দন পেয়ে থাকি। আর এই জন্যেই মানবদেহে এই হাজারো রকম স্পন্দনের নিয়ন্ত্রক চক্র বা নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের নাম সহস্রার চক্র। এই হাজারো স্পন্দন বেরিয়ে আসছে সেই ৫০ রকমের pencils of

vibration থেকে আর সেই পঞ্চাশ ধরনের pencils of vibration-এর পৃথক পৃথক ধ্বনি আছে, বর্ণ আছে।

এই ৫০ ধরনের স্পন্দনের জন্যে সংস্কৃত বর্ণমালা তৈরী করা হয়েছে। প্রথম পেন্সিলটি হ'ল 'অ' আর শেষেরটি হ'ল 'ক্ষ'–মোট ৫০টি–১৬টি স্বরবর্ণ, ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

'অ' থেকে শুরু করে এই যে ৫০টি অক্ষর, যদিও মুখ্যতঃ তারা ধ্বনি, তবু তাদের নিজের নিজের বর্ণও আছে। যেহেতু তারা ধ্বনি ও বর্ণ উভয়ই তাই এই ৫০টি ধ্বনি বা অক্ষর নিয়ে তৈরী হয়েছে বর্ণমালা। সত্যি কথা বলতে গেলে তারা ধ্বনিমালা ও বর্ণমালা দুই–ই। যেহেতু প্রথম অক্ষর 'অ' ও শেষ অক্ষর 'ক্ষ' তাই একে 'অক্ষমালা'ও বলা হয়।

'ক্ষ' (ক্ + ষ) বর্ণটির মধ্যে 'য' ধ্বনিটিও রয়ে গেছে। 'ক ষ' যুগ্ম ধ্বনিটির ঋগ্বেদীয় উচ্চারণ হচ্ছে 'ব্য' (ks'a) আর যজুর্বেদীয় উচ্চারণ হচ্ছে 'খ'। তাই 'অক্ষমালা' শব্দের উচ্চারণ হবে 'অক্ষমালা' অথবা 'অন্খমালা'। দুই–ই সমান শুদ্ধ।

আগেই বলেছি, প্রথম ধ্বনি 'অ', শেষেরটি 'ক্ষ'–তাই সামগ্রিক ভাবে বলা হয় অক্ষমালা। পরমপুরুষের অসীম দেহে এই অক্ষমালারা নেচে চলেছে, পরমা প্রকৃতির সাহায্যে অভিব্যক্ত

হয়ে চলেছে, তাই তাদের সঙ্গতভাবেই নাম রাখা যেতে পারে রুদ্র + অক্ষ। আগেই বলেছি, এই অক্ষরগুলি কেবল ধবনিই নয়, কেবল বর্ণই নয়, তারা এক একটি ৰীজমন্ত্রও।

বর্ণমালার এই যে প্রথম অক্ষর 'অ'–এই 'অ' হ'ল সৃষ্টির (creation) ৰীজমন্ত্র। যখনই কোন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছ–তা মানসিক ভাবেই হোক বা শারীরিক ভাবেই হোক–তোমার এই সর্জনমূলক মনোভাব, তোমাদের এই হস্তনৈপুণ্য, এ সব কিছুর দ্যোতক হ'ল সেই 'অ' ধ্বনিটি। এই 'অ' ধবনিটিই হচ্ছে সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র। আর যেহেতু সৃষ্টির আগে তো আর কিছু নেই–আগে সৃষ্টি, তবে তো অন্য কিছু। সৃষ্টি হ'ল সব কিছুর প্রথম অবস্থা। তাই 'অ' হ'ল বর্ণমালার প্রথম অক্ষর।

অনুরূপ ভাবে ব্যাঞ্জন বর্ণের বেলায় প্রথম ব্যঞ্জন হ'ল 'ক'। এখন প্রশ্ন হ'ল, 'ক' ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় প্রথম ব্যঞ্জন কেন? কারণ 'ক' কার্যব্রহ্মের (Objectivated Brahma) ৰীজমন্ত্র। সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র হ'ল 'অ' আর সেই সৃষ্ট জগতের প্রথম ধ্বনি হ'ল 'ক'। 'অ' হচ্ছে কারণ ব্রহ্মের বীজমন্ত্র, আর 'ক' হ'ল কার্যব্রহ্মের ৰীজমন্ত্র।

সংস্কৃতে 'ক' শব্দের তিনটে মানে। 'ক' শব্দের একট মানে হ'ল কার্যব্রহ্ম। বৌদ্ধ দর্শনে কার্যব্রহ্মকে বলা হয়

"সংবৃত্তিবোধিচিত্তঃ।” এই সংবৃত্তিবোধিচিত্তকে পালন করে যে সে কাপালিক (কং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং পালয়তি যঃ সঃ কাপালিকঃ)। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে যে পালন ক্রিয়ায় রত, এই বিশ্বকে যে বাঁচায়, সেবা করে সে হ'ল কাপালিক।

'ক' শব্দের আর একটি মানে হ'ল ব্যক্ত জগৎ। 'ক' শব্দের তৃতীয় মানে হ'ল জল। এই প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলুম, কেন জলেন তোয়েন ছাদিতং আচ্ছাদিতং ইত্যর্থে কচ্ছ... অর্থাৎ যে ভূখণ্ড চতুর্দিকে জলব্যষ্টিত তার নাম কচ্ছ। তোমরা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত আছ–কলমী শাক। ক অর্থাৎ জলের ওপর যা লম্বালম্বি শায়িত থাকে তা হ'ল কলম্বী (সংস্কৃত), বাংলায় 'কলমী', হিন্দীতে 'কলমী'।

অনুরূপভাবে পঞ্চাশটি বর্ণমালার অন্য বর্ণগুলোর প্রতিটি কোন না কোন অভিব্যক্তির ৰীজমন্ত্র। এগুলোর একটি বর্ণ হ'ল 'স'। এই 'স' ধ্বনিটি হ'ল সত্ত্বগুণের ৰীজমন্ত্র, 'শ' হ'ল রজোগুণের ৰীজমন্ত্র, 'ষ' হ'ল তমোগুণের ৰীজমন্ত্র, 'ব' হ'ল ধর্মের বীজমন্ত্র, 'র' হ'ল এনার্জি বা শক্তির ৰীজমন্ত্র–তা চুম্বকশক্তি, আলোকশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি যাই হোক না কেন। সব রকম এনার্জির বীজমন্ত্র হ'ল 'র'। তাই প্রাচীন কাল থেকে এদেশে রীবাজ আছে নামের আগে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারের। 'শ' হ'ল রজোগুণের দ্যোতক, 'র' হ'ল এনার্জি বা প্রাণশক্তির

দ্যোতক আর তার সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গসূচক 'ঙীষ' প্রত্যয় জুড়ে 'শ্রী' শব্দ নিষ্পন্ন। কারো নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহারের তাৎপর্য হ'ল মানুষটির সঙ্গে রজোগুণসম্পন্ন প্রাণশক্তি যুক্ত হ'ল।

এবার 'স'। পরমপুরুষ নিজেকে সর্বপ্রথম যখন অভিব্যক্ত করেন, যখন তাঁর প্রথম গুণান্বিত অভিপ্রকাশ ঘটে তখন তাঁর সেই গুণান্বিত অভিব্যক্তি 'স' ধবনির দ্বারা সূচিত হয়। কারণ, সে পর্যায়ে প্রকৃতির শুধু সত্ত্বগুণই কাজ করে। সেই স্তরের সত্ত্বগুণী প্রকৃতিকে বলা হয় কৌষিকী শক্তি। অতঃপর সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় আর কী কী ঘটে? সৃষ্টিকার্যে দরকার পড়ে এনার্জি বা শক্তির যার বীজমন্ত্র হচ্ছে 'র'। যখন কিছু সৃষ্টি হয় সেই সৃষ্ট বস্তুতে কিছু বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম (characteristices/ wonts/ properties) এসেই যায়। যেমন জল, জলের বৈশিষ্ট্য ভেজানো। জল যদি তার এই ভেজানো বৈশিষ্ট্যটা হারিয়ে ফেলে তাকে আর জল বলব না। তেমনি আগুন যদি তার বৈশিষ্ট্য দাহিকা শক্তিকে হারিয়ে ফেলে তাহলে তাকে আর আগুন বলা যাবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি বস্তুর একটা বিশেষ গুণ বা ধর্ম থাকবেই। প্রতিটি সত্তা প্রকৃতির সত্ত্ব গুণের দ্বারা উদ্ভূত হয় যার ৰীজমন্ত্র হ'ল 'স' অক্ষরটি। সত্তামাত্রই একটা অন্তর্নিহিত শক্তি বা এনার্জি কাজ করে যার ৰীজমন্ত্র হ'ল 'র' ধ্বনিটি।

আর প্রতিটি সত্তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম থাকবেই যার ৰীজমন্ত্র হ'ল 'ব'। (মানুষের ধর্ম হ'ল ভাগবত ধর্ম। মানুষ মারেই একটা ধর্ম আছে আর সেই ধর্মের নাম ভাগবত ধর্ম। যদি সেই ধর্মটার অভাব ঘটে, যদি মানুষের জীবনচর্যায় সেই ধর্মের অভাব ঘটে তাহলে বলব সেই মানুষটি প্রকৃত মানুষ নয়। বরং বলব সে পশুর চেয়েও অধম।) তাই 'স–র–ব সর্ব উচ্যতে'। স, র, ব–তিনে মিলে হয় 'সর্ব'। সর্ব মানে সব কিছু....যা কিছু অভিব্যক্ত হয়েছে।

পরমপুরুষ 'সর্বব্যাপী' অর্থাৎ তিনি সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। এই 'সর্ব' রয়েছে কোথায়? –না, নির্গুণ সত্তার গুণান্বিত রূপে অভিব্যক্ত হয়ে। এই যে সর্ব–এর একটা চক্রনাভি (Nucleus) রয়েছে। এই সর্বের দ্রষ্টা অংশটুকু হ'ল চক্রনাভি আর দৃষ্ট অংশটুকু হ'ল এই সৃষ্ট জীবজগৎ। ইতোপূর্বে আমি একবার বলেছিলুম যে এই যে অজস্র সৃষ্ট সত্তা এরা সেই বিশ্বের চক্রনাভির চারিধারে ঘুরে চলেছে। সৃষ্টির মধ্যমণির অভিমুখে এই যে অজস্র অনুসত্তার যাত্রা, একেই বলে আধ্যাত্মিক প্রগতি। তাহলে আধ্যাত্মিক উন্নতি বা প্রগতি বলব কাকে? না, বিদ্যুতাণবিক অপূর্ণতা থেকে পারমার্থিক পূর্ণতার দিকে যে অবিরত যাত্রা তা–ই হ'ল প্রগতি (What is spiritual advancement ? It is the march from electronic imperfection to Nuclear perfection.)।

"সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"। 'সর্বভূত' মানে সকল সৃষ্ট সত্তা। 'ভূত' মানে যা হয়েছে বা সৃষ্ট হয়েছে। ভূক্ত প্রত্যয় করে 'ভূত' শব্দ নিষ্পন্ন.... 'ভূত' মানে যা হয়েছে। ভূত কাল মানে অতীত কাল। যদি লিখি 'ভূত', তার মানে ভূত- প্রেত (ghosts)। এই 'ভূত' সংস্কৃত শব্দ নয়। 'Ghost' শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রেত–'ভূত' নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই যে অন্তরাত্মা বা জীবাত্মা, এ কি কেবল জীবিত প্রাণীর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে–অজৈব সত্তায় থাকতে পারে না? সর্বভূত মানে প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, সব কিছু–যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে তা সবই ভূত পর্যায়ে পড়ে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, এচেনা জড় বস্তুতে কি অন্তরাত্মা থাকে না? অবশ্যই থাকে। তবে যেহেতু সেই সব জড় বস্তুতে মন অবিকশিত থাকে তাই সেখানে জীবাত্মা বা অন্তরাত্মার ভূমিকা অপ্রধান–অনেকটা প্রসুপ্ত। তবে জীবাত্মা অবশ্যই বিদ্যমান। মন প্রসুপ্ত থাকায় জীবাত্মার প্রতিফলন স্পষ্ট নয়। বরং বেশ অস্পষ্ট বা প্রসুপ্ত।

কাজেই আব্রহ্মস্তম্ব সর্বভূতেই পরমপুরুষ অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। এখানে 'ব্রহ্মা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে কেন? ব্রহ্মা মানে সৃষ্টিকর্তা। পরমপুরুষ সৃষ্টি করেন, পালন–পোষণ করেন ও অবশেষে সব কিছু সংহারও করেন। যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করেন তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা। যখন তাঁর সৃষ্ট

জীবসমূহকে তিনি পালন করেন তখন তাঁকে বলা হয় বিষ্ণু। আর যখন তিনি সব কিছু সংহার করেন তখন তাঁকে বলা হয় মহেশ্বর। এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর– এঁরা কিন্তু পৃথক পৃথক সত্তা নন। এঁরা মূলতঃ একই সত্তা–কেবল ভূমিকাগত পার্থক্য রয়েছে।

আমি তোমাদের একবার বলেছিলুম যে একই মানুষের ভূমিকার পার্থক্যের দরুণ সম্বোধনের ভাষাতেও পার্থক্য হয়ে থাকে। ধর, কারো নাম রামজীবন। তার বাবা তাকে ডাকেন 'রাম' বলে, কর্মস্থলে সহকর্মীরা ডাকে 'রামু' বলে, বাড়ীতে নিজের ছেলে–মেয়েরা ডাকে 'বাবুজী' বলে; আবার স্কুলের ছাত্র–ছাত্রারা তাঁকে সম্বোধন করে 'মাষ্টারমশায়' বলে। আবার সেই একই মানুষটি যখন মাথায় টুপি পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, টাঙ্গাওয়ালা বলছে–এই টুপি, এই টুপি, অর্থাৎ তখন তাঁর নাম হয়ে গেল 'টুপি'। একই মানুষ কিন্তু ভূমিকার পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হচ্ছে।

অনুরূপ ভাবে এক ব্রহ্মের তিন ভূমিকা, তিন ধরনের কর্মগত অভিব্যক্তি– ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। যখন তিনি সৃষ্টি করেন তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম + অ = ব্রহ্মা ('অ' ধবনিটি হচ্ছে সৃষ্টির ৰীজমন্ত্র)।

"আব্রহ্মস্তম্ব"। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত। সংস্কৃত 'স্তম্ব' মানে তৃণখণ্ড। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের সর্বত্রই সব কিছুতেই পরমপুরুষের প্রতিফলন। তাই এই বিশ্বের কেউই তুচ্ছ নয়, উপেক্ষণীয় নয়। সবাই, সব কিছুই মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ–সবারই কিছু–না কিছু মূল্য অবশ্যই আছে। এখন প্রশ্ন হ'ল প্রত্যেকেই এই মূল্যটা পায় কোত্থেকে? না, যেহেতু প্রত্যেকেই পরমপুরুষের প্রতিফলন, তাই এই মূল্য। পরমপুরুষ হলেন "সর্বভূতান্তারাত্মা"।

আবার পরমপুরুষকে 'কর্মাধ্যক্ষ'ও বলা হয়। "আনন্দসূত্রম্" পুস্তকে বলা হয়েছে–"পুরুষঃ অকর্তা"। পুরুষ অকর্তা মানে পুরুষ এখানে 'কৃ' ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত নয়। পরমপুরুষ নিজে কিছু না করলেও 'কৃ' ধাতুর অনুমতিটা তো তিনিই দেন। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে প্রকৃতি কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তাই পরমপুরুষ যদিও নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে সৃষ্টিলীলার সঙ্গে সংযুক্ত নন, তবুও তিনিই কর্মাধ্যক্ষ........সব কিছুর চরম তত্ত্বাবধায়ক। কোন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ নিজে কোন ক্লাশে পড়াতেও পারেন, আবার নাও পারেন। কিন্তু সমস্ত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দের পঠনপাঠনের দিকটা তিনিই তত্ত্বাবধান করেন। তাই পরমপুরুষ হলেন অধ্যক্ষ। সব কিছুর যথাযথ দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর? কর্মজগতে বা মানস জগতের ভাব–ভাবনার ক্ষেত্রে কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

কেউই তাঁকে লুকিয়ে বা না জানিয়ে কিছুই করতে পারে না। তিনি সব কিছু জানেন। তাই তাঁকে বলা হয় কর্মাধ্যক্ষ। যাঁরা জ্ঞানী ও যথেষ্ট চালাক–চতুর তাঁরা অবশ্যই সেই কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, আন্তরিক ভাবে তাঁকে ভালবাসেন ও ভক্তি করেন কারণ সব কিছুই তো তাঁর কৃপার ওপর নির্ভরশীল। এমনিতে মানুষ খুব দুর্বল, পরমপুরুষের কৃপা না পেলে সে কিছুই করতে পারে না।

(পটনা, ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৮)

সূচীপত্র

সমাপ্ত

***************X***************

অবগতি

ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভূতি সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দদায়ক অনুভূতি। সাধনা'ই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে এই অনুভূতি লাভ করা সম্ভব। গুরুদেব শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজী প্রদত্ত সাধন প্রক্রিয়া

জনে জনে বিনামূল্যে পৌঁছে দেবার জন্য আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। যে কোন সদিচ্ছুক ব্যক্তি এই সাধন প্রকৃয়া শিখতে পারেন।